কঙ্কাবতী

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশকের নিবেদন

'কঙ্কাবতী' ত্রৈলোক্যনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ভাব-কল্পনায় এই লেখকটির বাংলাসাহিত্যে আজও জুড়ি মেলে নাই—আবার কঙ্কাবতী তাঁহারও অদ্বিতীয় কল্পনা। সেদিক দিয়া অনায়াসে কঙ্কাবতীকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বলা যায়। মধ্যে দীর্ঘকাল কঙ্কাবতী বাজারে ছিল না, এক গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাহার দেখা মিলিত। কিছুদিন পূর্বে দুই একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে শুধুই মূল গ্রন্থটি আছে। অতিরিক্ত কিছু নাই। প্রথম সংস্করণ কঙ্কাবতীতে কতকগুলি অননুকরণীয় 'উড কাট' ছবি ছিল। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, পাতায় পাতায় মজাদার Sub-heading. সেগুলি না পাইলে মন অনেকখানি রস হইতে বঞ্চিত থাকে। তাই আমরা সেই প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ হইতে যতদূর সম্ভব হুবহু চিত্র এবং Sub-heading সুদ্ধ বইটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছি। পাঠকগণ পরিতৃপ্ত হইলেই সে প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। ইতি—

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে

এমন কোনো অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকাব স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকেব বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়েব উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধ রাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে "অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" নামক একটি ইংরাজী গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমবা এই সমস্ত ত্রুটী মার্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালকবালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরল গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্পলোকই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা জাতটা কিছু

স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেমানুষি মনে করি; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলা ধুলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষে পলকপাত ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনো প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষি বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার তো কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, লেখারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকল প্রকার কার্যানুষ্ঠানে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ কৌতুক-পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে এবং সে কার্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। চার্লস্ ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত— তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কি? ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? ইহার তাৎপর্য কি, লক্ষ্য কি? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের

আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙে মুল্লুকনিবাসী শ্রীমান্ ঘ্যাঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতিকোটী সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানবহৃদয়জলধির বিচিত্র উত্থান-পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্ধক্যের স্মৃতি-ভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ৃঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

সাধনা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম ভাগ (ফাল্গুন, ১২৯৯) হইতে পুনর্মুদ্রিত

মাছেদের রাণী

কঙ্কাবতী

—•—•—

প্রথম ভাগ

—০:*:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:০:—

প্রাচীন কথা

কঙ্কাবতীকে সকলেই জানেন। ছেলে বেলা কঙ্কাবতীর কথা সকলেই শুনিয়াছেন।

কঙ্কাবতীর ভাই একটী আঁব আনিয়াছিলেন। আঁবটী ঘরে রাখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন,—"আমার আঁবটী যেন কেহ খায় না; যে খাইবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

কঙ্কাবতী সে কথা জানিতেন না। ছেলে মানুষ! অত বুঝিতে পারেন নাই, আঁবটী তিনি খাইয়াছিলেন।

সে জন্য ভাই বলিলেন,—"আমি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।"

পিতা মাতা সকলে বুঝাইলেন,—"ভাই হইয়া কি ভগ্নীকে বিবাহ করিতে আছে?"

কিন্তু কাহারও কথা তিনি শুনিলেন না। তিনি বলিলেন,—"কঙ্কাবতী আমার আঁব খাইল কেন? আমি নিশ্চয় কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।"

কঙ্কাবতীর বড় লজ্জা হইল, মনে বড় ভয় হইল। নিরুপায় হইয়া তিনি একখানি নৌকা গড়িলেন। নৌকা খানিতে বসিয়া খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ভাসিয়া যাইলেন। ভাই আর তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতীর গল্প এইরূপ। এ কথা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। একটী আঁবের জন্য কেহ কি আপনার ভগ্নীকে বিবাহ করিতে চায়? এ কথা সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব, তাহা আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

কুসুমঘাটী

সহর অঞ্চলে নয়, বন্য প্রদেশে, কুসুমঘাটী বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি বড়, অনেক লোকের বাস। গ্রামের নিকটে মাঠ। সেকালে এই মাঠ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিত। সুবিধা পাইলে, নিকটস্থ গ্রাম-সমূহের দুষ্ট লোকেরা পথিকদিগকে মারিয়া ফেলিত ও তাহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু টাকা-কড়ি পাইত, তাহা লইত। মাঠের মাঝখানে যে সব পুষ্করিণী আছে, তাহার ভিতর হইতে, আজ পর্য্যন্তও মড়ার মাথা বাহির হয়। মানুষ মারিয়া দুষ্ট লোকেরা এই পুকুরের ভিতর লুকাইয়া রাখিত।

মৃতদেহ গোপন করিবার আর একটী উপায় ছিল। পথিককে মারিয়া, মড়াটী লইয়া, দুষ্ট লোকেরা এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে ফেলিয়া আসিত। অপর গ্রামে মড়াটী রাখিয়া, এক প্রকার "কূ:" শব্দ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত।

সে গ্রামের চৌকীদার সেই "কূ:" শব্দটী শুনিয়া বুঝিতে পারিত যে, তাহার সীমানায় মড়া পড়িয়াছে। চৌকীদার ভাবিত,—"যদি আমার সীমানায় মড়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, কা'ল প্রাতঃকালে আমাকে লইয়া টানা-টানি হইবে।"

এই কথা ভাবিয়া সেও আপনার বন্ধুবর্গের সহায়তায়, মৃতদেহটী অপর গ্রামে রাখিয়া সেইরূপ "কূ:" শব্দ করিয়া আসিত।

এইরূপে রাতা-রাতি মড়াটী দশ বার ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িত। কোথা হইতে লোকটী আসিতেছিল, কে তাহাকে মারিল, অত দূরে আর তাহার কোনও সন্ধান হইত না।

একে বন্য দেশ, তাতে আবার এইরূপ শতশত অপঘাত মৃত্যু! সে স্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানা প্রকার ভূত আছে, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সন্ধ্যা হইলে, ঘরে বসিয়া, লোকে নানারূপ ভূতের গল্প করে, সেই গল্প শুনিয়া বালক-বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠে।

গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া দেন,—"ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।"

স্থলে, সেখানকার লোকের এইরূপ পদে পদে বিপদের ভয়। জলেও কম নয়। গ্রামের এক পার্শ্বে একটী নদী আছে। পাহাড় হইতে নামিয়া, "কুল কুল" করিয়া নদীটী সাগরের দিকে বহিয়া যাইতেছে। হাঙ্গর কুম্ভীর নাই সত্য, কিন্তু নদীটী অন্য ভয়ে পরিপূর্ণ। শিকল হাতে "জ'টে-বুড়ী" ত আছে-ই, তা ছাড়া নদীর ভিতর জীবন্ত পাথরও অনেক। সুবিধা পাইলে এই পাথর মনুষ্যের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরূপ নানা বিপদের ভয়।

কুসুমঘাটীর অনতিদূরে পর্ব্বতশ্রেণী। পাহাড় বনে আবৃত। বনে বাঘ ভল্লুক আছে। বাঘে সর্ব্বদাই লোকের গরু বাছুর লইয়া যায়। মাঝে মাঝে এক একটী বাঘ মনুষ্য খাইতে শিক্ষা করে, তখন সে বাঘ

মানুষ ভিন্ন আর কিছুই খায় না। লোকে উৎপীড়িত হইয়া নানা কৌশলে সে ব্যাঘ্রটীকে বধ করে।

এক একটী বাঘ কিন্তু এমনি চতুর যে, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। লোকে বলে যে, সে প্রকৃত বাঘ নয়,—সে মনুষ্য। বনে এক প্রকার শিকড় আছে, তাহা মাথায় পরিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের রূপ ধরিতে পারে। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ থাকিলে, লোকে সেই শিকড়টী মাথায় পরিয়া বাঘ হয়, বাঘ হইয়া আপনার শত্রুকে নাশ করে। তাহার পর আবার শিকড় খুলিয়া মানুষ হয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না। সে চিরকালই বাঘ থাকিয়া যায়। এই বাঘে লোকের প্রতি ভয়ানক উপদ্রব করে।

কুসুমঘাটীর লোকের মনে এইরূপ নানা প্রকার বিশ্বাস। কিন্তু আজ কা'ল সকলের মন হইতে এই সব ভয় ক্রমে দূর হইতেছে। এখানকার অনেকে এখন তসরের গুটি ও গালা লইয়া কলিকাতায় আসেন। কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইংরেজিও পড়িয়াছেন। ভূত ডাইনীর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ভূতের কথা পড়িলে, তাঁহারা উপহাস করেন; বলেন,—"পৃথিবীতে ভূত নাই। আর যদিও থাকে, তো আমাদের তাহারা কি করিতে পারে?" তাঁহাদের দেখা-দেখি আজ কা'লের ছেলে মেয়েদের প্রাণেও কিছু কিছু সাহসের সঞ্চার হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:o:—

তনু রায়

শ্রীযুক্ত রামতনু রায় মহাশয়ের বাস কুসুমঘাটী। "রামতনু রায়" বলিয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে না, সকলে তাঁহাকে "তনু রায়" বলে। ইনি ব্রাহ্মণ, বয়স হইয়াছে, ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা ইনি যথাবিধি করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা করেন, পিতা-পিতামহ-আদির শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করেন, দেব-গুরুকে ভক্তি করেন, দলাদলি লইয়া আন্দোলন করেন। এখনকার লোকে ভাল করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করে না বলিয়া, রায় মহাশয়ের মনে বড় রাগ।

তিনি বলেন,—"আজকালের ছেলেরা সব নাস্তিক, ইহাদের হাতে জল খাইতে নাই।"

তিনি নিজে সব মানেন, সব করেন। বিশেষতঃ কুলীন ও বংশজের যে রীতি গুলি, সেই গুলির প্রতি ইহার প্রগাঢ় ভক্তি।

তিনি নিজে বংশজ ব্রাহ্মণ। তাই তিনি বলেন,—"বিধাতা যখন আমাকে বংশজ করিয়াছেন, তখন বংশজের ধর্ম্মটী আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। যদি না করি, তাহা হইলে বিধাতার অপমান করা হইবে, আমার পাপ হইবে, আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যদি বল, বংশজের ধর্ম্মটী কি? বংশজের ধর্ম্ম এই যে, 'কন্যাদান করিয়া পাত্রের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করিবে।' বংশজ হইয়া যিনি এ কার্য্য

না করেন, তাঁহার ধর্ম্মলোপ হয়, তিনি একেবারেই পতিত হন ; শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে।"

শাস্ত্র-অনুসারে সকল কাজ করেন দেখিয়া, তনু রায়ের প্রতি লোকের বড় ভক্তি। স্ত্রীলোকেরা ব্রত উপলক্ষে ইঁহাকেই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সকলে বলেন যে, "রায় মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে অতি বিরল।" বিশেষতঃ শূদ্র মহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি।

তনু রায় অতি উচ্চদরের বংশজ। কেহ কেহ পরিহাস করিয়া বলেন যে,—"ইঁহাদের কোনও পুরুষে বিবাহ হয় না। পিতা-পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কি না, তাও সন্দেহ।"

ফল কথা, ইঁহার নিজের বিবাহের সময় কিছু গোলযোগ হইয়াছিল। "পাঁচ শত টাকা পণ দিব" বলিয়া একটী কন্যা স্থির করিলেন। পৈত্রিক ভূমি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিলেন। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে সেই টাকাগুলি লইয়া বিবাহ করিতে যাইলেন। কন্যার পিতা, টাকাগুলি গণিয়া ও বাজাইয়া লইলেন। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল, কিন্তু তবুও তিনি কন্যা-সম্প্রদান করিতে তৎপর হইলেন না। কেন বিলম্ব করিতেছেন, কেহ বুঝিতে পারে না।

অবশেষে তিনি নিজেই খুলিয়া বলিলেন,—"পাত্রের এত অধিক বয়স হইয়াছে, তাহা আমি বিবেচনা করিতে পারি নাই। সেই জন্য পাঁচ শত টাকায় সম্মত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আর এক শত টাকা না পাইলে, কন্যাদান করিতে পারি না।"

কন্যা-কর্ত্তার এই কথায় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই

গোলযোগে লগ্ন অতীত হইয়া গেল, রাত্রি প্রায় অবসান হইল। যখন প্রভাত হয় হয়, তখন পাঁচজনে মধ্যস্থ হইয়া এই মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, "রায় মহাশয়কে আর পঞ্চাশটী টাকা দিতে হইবে।" "খত" লিখিয়া তনু রায় আর পঞ্চাশ টাকা ধার করিলেন ও কন্যার পিতাকে তাহা দিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন।

বাসর ঘরে গাহিবেন বলিয়া তনু রায় অনেকগুলি গান শিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সব বৃথা হইল। কারণ বাসর হয় নাই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। এ দুঃখ তনু রায়ের মনে চিরকাল ছিল।

এক্ষণে তনু রায়ের তিনটী কন্যা ও একটী পুত্র সন্তান। কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া দুইটী কন্যাকে তিনি সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতারা তনু রায়ের সম্মান রাখিয়াছিলেন। কেহ পাঁচ শত, কেহ হাজার, নগদ গণিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই সুপাত্র বলিতে হইবে।

সম্মান কিছু অধিক পাইবেন বলিয়া, রায় মহাশয় কন্যা দুইটীকে বড় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"অল্প বয়সে বিবাহ দিলে, কন্যা যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে পাপের দায়ী কে হইবে? কন্যা বড় করিয়া বিবাহ দিবে। কুলীন ও বংশজের তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে।"

তাই, যখন ফুলশয্যার আইন পাস হয়, তখন তনু রায় বলিলেন,—"পূর্ব্ব হইতেই আমি আইন মানিয়া আসিতেছি। তবে আবার নূতন আইন কেন?" আইনের তিনি ঘোরতর বিরোধী হইলেন; সভা করিলেন, চাঁদা তুলিলেন, চাঁদার টাকাগুলি সব আপনি লইলেন।

তনু রায়ের জামাতা দুটীর বয়স নিতান্ত কচি ছিল না। ছেলে

মানুষ বরকে তিনি দুটী চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। তাহারা একশত কি দুইশত টাকায় কাজ সারিতে চায়! তাই, একটু বয়স্ক পাত্র দেখিয়া কন্যা দুইটীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এক জনের বয়স হইয়াছিল সত্তর, আর এক জনের পঁচাত্তর।

জামাতাদিগের বয়সের কথায় পাড়ার মেয়েরা কিছু বলিলে, তনু রায় সকলকে বুঝাইতেন,—"ওগো! তোমরা জান না। জামাইয়ের বয়স একটু পাকা হইলে, মেয়ের আদর হয়।"

জামাতাদিগের বয়স কিছু অধিক পাকিয়াছিল। কারণ, বিবাহের পর, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে, দুইটী কন্যাই বিধবা হয়।

তনু রায় জ্ঞানবান্ লোক। জামাতাদিগের শোকে একেবারে অধীর হন নাই। মনকে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন,—"বিধাতার ভবিতব্য! কে খণ্ডাতে পারে? কত লোক যে বার বৎসরের বালকের সহিত পাঁচ বৎসরের বালিকার বিবাহ দেয়। তবে তাদের কন্যা বিধবা হয় কেন? যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে। বিধাতার লেখা কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না।"

তনু রায়ের পুত্রটী ঠিক বাপের মত। এখন তিনি আর নিতান্ত শিশু নন্, পঁচিশ পার হইয়াছেন। লেখা পড়া হয় নাই, তবে পিতার মত শাস্ত্রজ্ঞান আছে! পিতা, কন্যাদান করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেছেন, সে জন্য তিনি আনন্দিত, নিরানন্দ নন্। কারণ, পিতার তিনিই একমাত্র বংশধর। বিধবা কয়টা আর কে বল? তবে বিধবা-দিগের গুণ কীর্ত্তন তিনি সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।

তিনি বলেন,—"আমাদের বিধবারা সাক্ষাৎ সরস্বতী। সদা ধর্ম্মে

রত, পরোপকার ইঁহাদের চিরব্রত। কিসে আমি ভাল খাইব, কিসে বাবা ভাল খাইবেন, ভগ্নী দুইটীর সর্ব্বদাই এই চিন্তা। তিন দিন উপবাস করিয়াও আমাদের জন্য পাঁচ ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। ভগ্নী দুইটী আমার—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। প্রাতঃস্মরণীয়া।”

আজ কাল আর সহমরণ প্রথা নাই বলিয়া, ইনি মাঝে মাঝে খেদ করেন। কারণ, তাহা থাকিলে ভগ্নী দুইটী নিমেষের মধ্যেই স্বর্গে যাইতে পারিতেন। বসিয়া বসিয়া মিছা-মিছি বাবার আর অন্নধ্বংস করিতেন না।

সাহেবেরা স্বর্গের দ্বারে এরূপ আগড় দিয়া দেন কেন?

তনু রায়ের স্ত্রী কিন্তু অন্য প্রকৃতির লোক। এক একটী কন্যার বিবাহ হয়, আর পাত্রের রূপ দেখিয়া তিনি কান্নাহাটি করেন। তনু রায় তখন তাঁহাকে অনেক ভৎর্সনা করেন, আর বলেন,—“মনে করিয়া দেখ দেখি, তোমার বাপ কি করিয়াছিলেন?” এইরূপ নানা প্রকার খোঁটা দিয়া তবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। কন্যাদিগের বিবাহ লইয়া স্ত্রী-পুরুষে চির বিবাদ। বিধবা-কন্যা দুইটীর মুখপানে চাহিয়া সদাই চক্ষের জলে মায়ের বুক ভাসিয়া যায়। মেয়েদের সঙ্গে মাও এক প্রকার একাদশী করেন। একাদশীর দিন কিছুই খান না, তবে স্বামীর অকল্যাণ হইবার ভয়ে, কেবল একটু একটু জল পান করেন।

প্রতিদিন পূজা করিয়া একে একে সকল দেবতাদিগের পায়ে তিনি মাথা খুঁড়েন, আর তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন যে,—“হে মা

কালি! হে মা দুর্গা! হে ঠাকুর! যেন আমার কঙ্কাবতীর বরটী মনের মত হয়।”

কঙ্কাবতী তনু রায়ের ছোট কন্যা। এখনও নিতান্ত শিশু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:•:—

খেতু

তনু রায়ের পাড়ায় একটী দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বাস করেন। লোকে তাঁহাকে "খেতুর মা, খেতুর মা" বলিয়া ডাকে। খেতুর মা আজ দুঃখিনী বটে, কিন্তু এক সময়ে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার স্বামী, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লেখা পড়া জানিতেন, কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন, দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেন।

কিন্তু তিনি অর্থ রাখিতে জানিতেন না। পরদুঃখে তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন ও যথাসাধ্য পরের দুঃখ মোচন করিতেন। অনেক লোককে অন্ন দিতেন ও অনেকগুলি ছেলের তিনি লেখা-পড়ার খরচ দিতেন। এরূপ লোকের হাতে পয়সা থাকে না।

অধিক বয়সে তাঁহার স্ত্রীর একটা পুত্র সন্তান হয়। ছেলেটীর নাম "ক্ষেত্র" রাখেন, সেইজন্য তাঁহার স্ত্রীকে সকলে "খেতুর মা" বলে।

যখন পুত্র হইল, তখন শিবচন্দ্র মনে করিলেন,—"এইবার আমাকে বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। আমার অবর্ত্তমানে স্ত্রী পুত্র যাহাতে অন্নের জন্য লালায়িত না হয়, আমাকে সে বিলি করিতে হইবে।"

মানস হইল বটে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইল না। পৃথিবী অতি দুঃখময়, এ দুঃখ যিনি নিজ দুঃখ বলিয়া ভাবেন, চিরকাল তাঁকে দরিদ্র থাকিতে হয়।

খেতুর যখন চারিবৎসর বয়স, তখন হঠাৎ তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। স্ত্রী ও শিশু সন্তানটীকে একেবারে পথে দাঁড় করাইয়া গেলেন। খেতুর বাপ অনেকের উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন বড়লোক হইয়াছেন। কিন্তু এই বিপদের সময় কেহই একবার উঁকি মারিলেন না। কেহই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, "খেতুর মা! তোমার হবিষ্যের সংস্থান আছে কি না?"

এই দুঃখের সময় কেবল রামহরি মুখোপাধ্যায় ইঁহাদের সহায় হইলেন।

রামহরি ইঁহাদের জ্ঞাতি, কিন্তু দূর সম্পর্ক। খেতুর বাপ, তাঁহার একটী সামান্য চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। দেশে অভিভাবক নাই সে জন্য কলিকাতায় তাঁহাকে পরিবার লইয়া থাকিতে হইয়াছে। যে কয়টী টাকা পান, তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে দিনপাত করেন।

তিনি কোথায় পাইবেন? তবুও যাহা কিছু পারিলেন, বিধবাকে দিলেন, ও চাঁদার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন। খেতুর বাপের খাইয়া যাহারা মানুষ, আজ তাহারা রামহরিকে কতই না ওজর আপত্তি অপমানের কথা বলিয়া দুই এক টাকা চাঁদা দিল। তাহাতেই খেতুর বাপের তিল-কাঞ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। চাঁদার টাকা হইতে যাহা কিছু বাঁচিল, রামহরি তাহা দিয়া খেতুর মা ও খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

দেশে পাঠাইয়া দুঃখিনী বিধবাকে তিনি চাউলের দামটী দিতেন। অধিক আর কিছু দিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণী পৈতা কাটিয়া কোনও

মতে অকুলীন কুলীন করিতেন। দেশে বন্ধু বান্ধব কেহই ছিল না। নিরঞ্জন কবিরত্ন কেবল মাত্র ইঁহাদের দেখিতেন শুনিতেন, বিপদে আপদে তিনিই বুক দিয়া পড়িতেন।

খেতুর মার এইরূপে কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। ছেলেটী শান্ত সুবোধ অথচ সাহসী ও বিক্রমশীল হইতে লাগিল। তাহার রূপ-গুণে, স্নেহ-মমতায়, মা সকল দুঃখ ভুলিলেন। ছেলেটী যখন সাত বৎসরের হইল, তখন রামহরি দেশে আসিলেন।

খেতুর মাকে তিনি বলিলেন,—"খেতুর এখন লেখা-পড়া শিখিবার বয়স হইল, আর ইহাকে এখানে রাখা হইবে না। আমি ইহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। আপনার কি মত?"

খেতুর মা বলিলেন,—"বাপ্‌রে! তা কি কখন হয়? খেতুকে ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব? নিমেষের নিমিত্তও খেতুকে চক্ষুর আড় করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। না বাছা! এ প্রাণ থাকিতে আমি খেতুকে কোথাও পাঠাইতে পারিব না।"

রামহরি বলিলেন,—"দেখুন, এখানে থাকিলে খেতুর লেখা-পড়া হইবে না। মথুর চক্রবর্ত্তীর অবস্থা কি ছিল জানেন তো? গাজনের শিবপূজা করিয়া অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিত। 'গাজুনে বামুন' বলিয়া সকলে তাহাকে ঘৃণা করিত। তাহার ছেলে, ষাঁড়েশ্বর, আপনার বাসায় দিনকতক রাঁধুনী বামুন থাকে। অল্প বয়স্ক বালক দেখিয়া শিবকাকার দয়া হয়, তিনি তাহাকে স্কুলে দেন। এখন সে উকিল হইয়াছে। এখন সে একজন বড়লোক।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—"চুপ কর! কলিকাতায় লেখা-পড়া

শিখিয়া যদি ষাঁড়েশ্বরের মত হয়, তাহা হইলে আমার খেতুর লেখা-পড়া শিখিয়া কাজ নাই।"

রামহরি বলিলেন,—"সত্য বটে, ষাঁড়েশ্বর মদ খায়, আর মুসলমান সহিসের হাতে নানারূপ অখাদ্য মাংসও খায়, আবার এদিকে প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্ত্তন করে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই সেইরূপ হয়? পুরুষ মানুষে লেখা-পড়া না শিখিলে কি চলে? পুরুষ মানুষের যেরূপ বাঁচিয়া থাকার প্রার্থনা, বিদ্যাশিক্ষারও সেইরূপ প্রার্থনা।"

খেতুর মা বলিলেন,—"হাঁ সত্য কথা। পুত্রের যেরূপ বাঁচিবার প্রার্থনা, বিদ্যার প্রার্থনাও তাহার চেয়ে অধিক। যে পিতা-মাতা ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষা না দেন, সে পিতা-মাতা ছেলের পরম শত্রু। তবে বুঝিয়া দেখ, আমার মার প্রাণ, আমি অনাথিনী সহায়-হীনা বিধবা! পৃথিবীতে আমার কেহ নাই, এই এক রত্তি ছেলেটাকে লইয়া সংসারে আছি। খেতুকে আমি নিমেষে হারাই! খেলা করিয়া ঘরে আসিতে খেতুর একটু বিলম্ব হইলে, আমি যে কত কি কু ভাবি, তাহা আর কি বলিব? ভাবি, খেতু বুঝি জলে ডুবিল, খেতু বুঝি আগুনে পুড়িল, খেতু বুঝি গাছ হইতে পড়িয়া গেল, খেতুকে বুঝি পাড়ার ছেলেরা মারিল! খেতু যখন ঘুমায়, রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া আমি খেতুর নাকে হাত দিয়া দেখি,—খেতুর নিশ্বাস পড়িতেছে কি না? ভাবিয়া দেখ দেখি, এ দুধের বাছাকে দূরে পাঠাইতে মার মহাপ্রাণী কি করে? তাই কাঁদি, তাই বলি—'না'।"

পুনরায় খেতুর মা বলিলেন,—"রামহরি! খেতু আমার বড় গুণের ছেলে। কেবল দুই বৎসর পাঠশালায় যাইতেছে, ইহার মধ্যে

তালপাতা শেষ করিয়াছে, কলাপাতা ধরিয়াছে। গুরুমহাশয় বলেন,—'খেতু সকলের চেয়ে ভাল ছেলে।'

"আর দেখ রামহরি! খেতু আমার অতি সুবোধ ছেলে! খেতুকে আমি যা করিতে বলি, খেতু তাই করে। যেটী মানা করি, সেটী আর খেতু করে না। একদিন দাসেদের মেয়ে আসিয়া বলিল,—'ওগো! তোমার খেতুকে পাড়ার ছেলেরা বড় মারিতেছে।' আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। দেখিলাম, ছয় জন ছেলে একা খেতুর উপর পড়িয়াছে। খেতুর মনে ভয় নাই, মুখে কান্না নাই। আমি দৌড়িয়া গিয়া খেতুকে কোলে লইলাম। খেতু তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—'মা! আমি উহাদের সাক্ষাতে কাঁদি নাই, পাছে উহারা মনে করে যে, আমি ভয় পাইয়াছি। একা একা আমার সঙ্গে কেহই পারে না। উহারা ছয় জন, আমি একা, তা আমিও মারিয়াছি। আবার যখন একা একা পাইব, তখন আমিও ছয় জনকে খুব মারিব।' আমি বলিলাম,—'না বাছা! তা করিতে নাই। প্রতি দিন যদি সকলের সঙ্গে মারামারি করিবে, তবে খেলা করিবে কার সঙ্গে?' খেতু আমার কথা শুনিল। কত দিন সে-ছেলেদের খেতু একেলা পাইয়াছিল, মনে করিলে খুব মারিতে পারিত; কিন্তু আমি মানা করিয়াছিলাম বলিয়া কাহাকেও সে আর মারে নাই।

"আর এক দিন আমি খেতুকে বলিলাম—'খেতু! তনু রায়ের আঁব গাছে ঢিল মারিও না। তনু রায় খিট্‌খিটে লোক, সে গালি দিবে।' খেতু বলিল,—'মা! ও গাছের আঁব বড় মিষ্ট গো! একটি আঁব পাকিয়া টুক্ টুক্ করিতেছিল! আমার হাতে একটা ঢিল ছিল। তাই মনে

করিলাম, দেখি পড়ে কি না?' আমি বলিলাম,—'বাছা! ও গাছের আঁব মিষ্ট হইলে কি হইবে, ও গাছটি তো আর আমাদের নয়? পরের গাছে ঢিল মারিলে, যা'দের গাছ, তাহারা রাগ করে। যখন আপনা-আপনি তলায় পড়িবে, তখন কুড়াইয়া খাইও, তাহাতে কেহ কিছু বলিবে না।'

"তাহার পর, আর একদিন খেতু আমাকে আসিয়া বলিল,—'মা। জেলেদের গাব গাছে খুব গাব পাকিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা সকলে গাছে উঠিয়া গাব খাইতেছিল। আমাকে তাহারা বলিল,—খেতু! আয় না ভাই! দূরের গাব যে আমরা পাড়িতে পারি না! তা মা! আমি গাছে উঠি নাই। গাব গাছটী তো, মা! আর আমাদের নয়, যে উঠিব? আমি তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেরা দুটী একটী গাব আমাকে ফেলিয়া দিল। মা! সে গাব কত যে গো মিষ্ট, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! তোমার জন্য একটী গাব আনিয়াছি, তুমি বরং, মা! খাইয়া দেখ! মা! আমাদের যদি একটী গাব গাছ থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত।' আমি বলিলাম, 'খেতু। বুড়ো মানুষে গাব খায় না, ও গাবটী তুমি খাও। আর পরের গাছে পাকা গাব পাড়িতে কোনও দোষ নাই, তার জন্য জেলেরা তোমাকে বকিবে না। কিন্তু গাছের ডগায় গিয়া উঠিও না, সরু ডালে পা দিও না, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে। গাবের আঁটি চুষিয়া চুষিয়া ফেলিয়া দিও, আঁটি গিলিও না, গলায় বাধিয়া যাইবে।' গাব খাইতে অনুমতি পাইয়া বাছার যে কত আনন্দ হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব?

"দেখ, এ গ্রামে একবার একজন কোথা হইতে সন্দেশ বেচিতে আসিয়াছিল। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তা'দের বাপ-মা, যার যেরূপ ক্ষমতা, সন্দেশ কিনিয়া আপনার আপনার ছেলের হাতে দিল। মুখ চূণপানা করিয়া আমার খেতুও সেই খানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাড়া-তাড়ি গিয়া আমি খেতুকে কোলে লইলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইল, চক্ষুর জল রাখিতে পারিলাম না। আঁচলে চক্ষু পুঁছিতে পুঁছিতে ছেলে নিয়া বাটী আসিলাম। খেতু নীরব, খেতুর মুখে কথা নাই। তার শিশুমনে সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখে হাত দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—'মা! তুমি কাঁদ কেন?' আমি বলিলাম—'বাছা! আমার ঘরে একদিন সন্দেশ ছড়া-ছড়ি যাইত, চাকর-বাকরে পর্য্যন্ত খাইয়া আলিয়া যাইত। আজ যে তোমার হাতে এক পয়সার সন্দেশ কিনিয়া দিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কি আর রাখিতে স্থান আছে? এমন অভাগিনী মার পেটেও বাছা তুই জন্মিয়াছিলি!' সাত বৎসরের শিশুর এক বার কথা শুন! খেতু বলিল,—'মা! ও সন্দেশ ভাল নয়। দেখিতে পাও নাই, ও সব পচা? আর মা! তুমি তো জান? সন্দেশ খাইলে আমার অসুখ করে। সেই যে মা চৌধুরীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেখানে সন্দেশ খাইয়াছিলাম, তার পরদিন আমার কত অসুখ করিয়াছিল। সন্দেশ খাইতে নাই, মুড়ি খাইতে আছে! ঘরে যদি মা! মুড়ি থাকে, তো দাও আমি খাই'।"

খেতুর মার মুখে খেতুর কথা আর ফুরায় না! রামহরির নিকট কত যে কি পরিচয় দিলেন, তাহা আর কি বলিব!

অবশেষে রামহরি বলিলেন,—"খুড়ী মা! ভয় করিওনা। আমার নিজের ছেলের চেয়েও আমি খেতুর যত্ন করিব। শিব-কাকার আমি অনেক খাইয়াছি। তাঁহার অনুগ্রহে আজ পরিবারবর্গকে এক মুঠা অন্ন দিতেছি। আজ তাঁহার ছেলে যে মূর্খ হইয়া থাকিবে, তাহা প্রাণে সহ্য হইবে না। খেতু কেমন আছে, কেমন লেখা-পড়া করিতেছে, সে বিষয়ে আমি সর্ব্বদা আপনাকে পত্র লিখিব। আবার খেতু যখন চিঠি লিখিতে শিখিবে, তখন সে নিজে আপনাকে চিঠি লিখিবে। পূজার সময় ও গ্রীষ্মের ছুটীর সময় খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিব। বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস সে আপনার নিকট থাকিবে। আজ আমি এখন যাই। আজ শুক্রবার। বুধবার ভাল দিন। সেই দিন খেতুকে লইয়া কলিকাতায় যাইব!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:o:—

নিরঞ্জন

তনু রায়ের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্নের ভাব নাই। নিরঞ্জন তনু রায়ের প্রতিবাসী।

নিরঞ্জন বলেন,—"রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে ঘোর পাপ হয়।"

তনু রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘৃণা করেন। যে দিন তনু রায়ের কন্যার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেই দিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপব গ্রামে গমন করেন। তিনি বলেন, "কন্যা-বিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি সে কথা কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।"

নিরঞ্জন অতি পণ্ডিত লোক। নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিদ্যা-শিক্ষার শেষ নাই, তাই রাত্রি-দিন তিনি পুঁথি-পুস্তক লইয়া থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পবিচয় দিতে ইনি ভাল বাসেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইঁহার নাম হয় নাই। পূর্ব্বে অনেকগুলি ছাত্র ইহাঁর নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিত। দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া, ইনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। আহার পরিচ্ছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া বিদায়ের

জন্য ইনি মারামারি করিতেন না। কারণ ইঁহার অবস্থা ভাল ছিল। পৈত্রিক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

গ্রামের জমিদার, জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন দুই প্রহরের সময় জমিদার এক জন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে,—"ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইব। তুমি এক্ষণে যাও।"

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এই ক্ষণেই আমার সহিত যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, ঠাঁই হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত দুইটী মুখে দিয়া, চল, যাইতেছি। কারণ, আমি আহার না করিলে, গৃহিণী আহার করিবেন না, ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিবেন।"

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এই ক্ষণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"এই ক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে? আচ্ছা, তবে চল যাই।"

পেয়াদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"কখন্ আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না!"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়! আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে।"

জমিদার বলিলেন,—"বামুনমারির মাঠে আপনার যে পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে, জরিপে তাহা পঞ্চান্ন বিঘা হইয়াছে। আপনার দলিল-পত্র ভাল আছে, সে জন্য সব টুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাসনা করি না, তবে মাপে যে টুকু অধিক হইয়াছে, সে টুকু আমার প্রাপ্য।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়! দলিল-পত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি; এই কাগজ খানি কি না?"

জনার্দ্দন চৌধুরী কাগজ খানি হাতে লইয়া বলিলেন,—হাঁ, এই কাগজ খানি বটে, ইহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখন আর দেখিবার আবশ্যক নাই।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজ খানি ফিরাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন কাগজ খানি তামাক খাইবার আগুনের মালসায় ফেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজ খানি জ্বলিয়া গেল।

জমিদার বলিলেন,—"হাঁ হাঁ! করেন কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কেবল পাঁচ বিঘা কেন? আজ হইতে আমার সমুদায় ব্রহ্মোত্তর ভূমি আপনার। যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।"

পাছে ব্রহ্মশাপে পড়েন, সে জন্য জনার্দ্দন চৌধুরীর ভয় হইল।

তিনি বলিলেন,—"দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"না মহাশয়! জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি দিবেন। সেই দীনবন্ধুকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। বিষয়-বৈভব-চিন্তায় যদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে, চিত্ত যদি বিকলিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ দুই প্রহরের সময় আপনার যবন পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন আমাকে শুনিতে হইল? সুতরাং সে ভূমিতে আর আমার কাজ নাই। স্পৃহাশূন্য ব্যক্তির নিকট রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সবাই সমান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও, আপনি সংসার-বন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধ। মরীচিকা মায়া-জালের অনুসরণ আপনাকে করিতেই হইবে। আতপ-তাপিত তৃষিত মরু প্রান্তর হইতে আপনি মুক্ত হইতে পারিবেন না। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কখনও কাহারও নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত নিজের জন্য আমাকে প্রার্থী না হইতে হয়।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জনের সেই দিন হইতে অবস্থা মন্দ হইল। অতি কষ্টে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্দ্ধন শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে যাইল।

গোবৰ্দ্ধন শিরোমণি জনার্দ্দন চৌধুরীর সভা-পণ্ডিত। অনেক গুলি ছাত্রকে তিনি অন্নদান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সকাল সন্ধ্যা উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা ব্যতীত অধ্যাপকের নিমন্ত্রণে সৰ্ব্বদা তাঁহাকে নানা স্থানে গমনাগমন করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রগণ আপনা-আপনি বিদ্যা শিক্ষা করে।

সেজন্য কিন্তু কেহ দুঃখিত নয়। গোবৰ্দ্ধন শিরোমণির উপর রাগ হয় না, অভিমানও হয় না। কারণ তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্য-সুধা দান করিয়া সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান লোক পাইলে শ্রাবণের বৃষ্টি-ধারায় তিনি বাক্যসুধা বর্ষণ করিতে থাকেন; তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহারা সেই সুধা পান করেন।

একদিন জনার্দ্দন চৌধুরীর বাটীতে বসিয়া তনু রায় শাস্ত্র-বিচার করিতেছিলেন। নিরঞ্জন গোবৰ্দ্ধন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তনু রায় বলিলেন,—"কন্যাদান করিয়া বংশজ কিঞ্চিৎ সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ শাস্ত্রে আছে? এরূপ শুল্ক গ্রহণ করা তো ধৰ্ম্মশাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ।"

গোবৰ্দ্ধন চুপি চুপি বলিলেন,—"বল না? মহাভারতে আছে।"

তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলি-লেন,—"দাতা-কর্ণে আছে।"

এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তনু রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ। পাপ করিতে ইচ্ছা হয়, করুন; কিন্তু শাস্ত্রের দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।"

তনু রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—"আমি শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল? কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি, তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?

নিরঞ্জনকে এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে. পরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:০:—

বিদায়

যে দিন রামহরির সহিত কথাবার্ত্তা হইল, সেই দিন রাত্রিতে মা, খেতুর গায়ে স্নেহের সহিত হাত রাখিয়া বলিলেন,—"খেতু! বাবা! তোমাকে একটী কথা বলি।"

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মা?"

মা উত্তর করিলেন,—"বাছা! তোমার রামহরি দাদার সহিত তোমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় মা?"

মা বলিলেন,—"তোমার মনে পড়ে না? সেই যে, যেখানে গাড়ি ঘোড়া আছে?

খেতু বলিলেন,—"সেই খানে? তুমি সঙ্গে যাবে তো মা?"

মা উত্তর করিলেন,—"না বাছা! আমি যাইব না, আমি এই খানেই থাকিব।"

খেতু বলিলেন,—"তবে মা! আমিও যাইব না।"

মা বলিলেন,—"না গেলে বাছা চলিবে না। আমি মেয়ে মানুষ, আমাকে যাইতে নাই। রামহরি দাদার সঙ্গে যাইবে, তা'তে আর ভয় কি?"

খেতু বলিলেন,—"ভয়! ভয় মা! আমি কিছুতে করি না। তবে

তোমার জন্য আমার মন কেমন করিবে, তাই মা! বলিতেছি যে, যাব না।"

মা বলিলেন,—"খেতু! সাধ করিয়া কি তোমাকে আমি কোথাও পাঠাই? কি করি, বাছা? না পাঠাইলে নয়, তাই পাঠাইতে চাই। তুমি এখন বড় হইয়াছ, এইবার তোমাকে স্কুলে পড়িতে হইবে। না পড়িলে শুনিলে মূর্খ হয়, মূর্খকে কেহ ভাল বাসে না, কেহ আদর করে না। তুমি যদি স্কুলে যাও আর মন দিয়া লেখা পড়া কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে। আর খেতু! তোমার এই দুঃখিনী মার দুঃখ ঘুচিবে। এই দেখ, আমি আর সরু পৈতা কাটিতে পারি না, চক্ষে আর দেখিতে পাই না। আর কিছু দিন পরে হয় তো মোটা পৈতাও কাটিতে পারিব না। তখন বল, পয়সা কোথায় পাইব? লেখা-পড়া শিখিয়া তুমি টাকা আনিতে পারিলে, আমাকে আর পৈতা কাটিতে হইবে না। আমি তখন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব, পূজা-আচ্চা করিব, আর ঠাকুরদের কাছে বলিব,—খেতু আমার বড় সু ছেলে, খেতুকে তোমরা বাঁচাইয়া রাখ।"

খেতু বলিলেন,—"মা! আমি যদি যাই, তুমি কাঁদিবে না?"

মা উত্তর করিলেন,—"না বাছা, কাঁদিব না।"

খেতু বলিলেন,—"ঐ যে মা! কাঁদিতেছ!"

মা উত্তর করিলেন,—"এখন কান্না পাইতেছে, ইহার পর আর কাঁদিব না। আর খেতু! সেখানে তোমাকে বারমাস থাকিতে হইবে না, ছুটী পাইলে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিবে। আমি পথপানে

চাহিয়া থাকিব, আগে থাকিতে দত্তদের পুকুর ধারে গিয়া বসিয়া থাকিব, সেই খান হইতে তোমাকে কোলে করিয়া আনিব। মন দিয়া লেখা পড়া করিলে, তুমি আবার আমাকে চিঠি লিখিতে শিখিবে। তুমি আমাকে কত চিঠি লিখিবে, আমি সে চিঠি গুলি তুলিয়া রাখিব, কাহাকেও খুলিতে দিব না, কাহাকেও পড়িতে দিব না। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, তখন সেই চিঠি গুলি খুলিয়া আমাকে পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবে।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! সেখানে মালা পাওয়া যায় গা?"

মা বলিলেন,—"মালা কি?"

খেতু বলিলেন,—"সেই যে মা? তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, রাত্রিতে ঘুম হয় না, যদি একছড়া মালা পাই, তো বসিয়া বসিয়া জপ করি।"

মা উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা! মালা সেখানে অনেক পাওয়া যায়।"

খেতু বলিলেন,—"আমি তোমার জন্য, মা! ভাল মালা কিনিয়া আনিব।"

মা উত্তর করিলেন,—"তাই ভাল! আমার জন্য মালা আনিও।"

মাতা পুত্রে এইরূপ কথার পর, কলিকাতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে খেতু নিদ্রিত হইলেন।

তাহার পরদিন, সকালে উঠিয়া খেতু বলিলেন,—"মা! এই কয় দিন আমি পাঠশালায় যাইব না, খেলা করিতেও যাইব না, সমস্ত দিন তোমার কাছে থাকিব।"

মা উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, তাই ভাল, তবে তোমার নিরঞ্জন কাকাকে একবার নমস্কার করিতে যাইও।"

খেতু বলিলেন,—"তা যাব। মা! আমি আর একটী কথা বলি। তোমার খাওয়া হইলে, এ কয় দিন আমি তোমার পাতে ভাত খাইব। পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, কেন তা জান মা? যাহা তোমার মুখে ভাল লাগে, নিজে না খাইয়া তুমি আমার জন্য রাখ। তাই আমি বলি,—'দুপুর বেলা, মা! আমার ক্ষুধা পায় না, আমার জন্য পাতে ভাত রাখিও না।' ক্ষুধা, কিন্তু মা! খুব পায়। লোকের গাছতলায় কত কুল, কত বেল পড়িয়া থাকে, আমি স্বচ্ছন্দে কুড়াইয়া খাই। কিন্তু তোমার ক্ষুধা পাইলে তুমি তো মা! তা খাওনা? তাই পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, পাছে মা! তোমার পেট না ভরে!"

ব্রাহ্মণী খেতুকে কোলে লইলেন, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,—"বাবা! এ দুঃখের কান্না নয়। তোমা হেন চাঁদ ছেলে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তার আবার দুঃখ কিসের? তোমার সুধামাখা কথা শুনিলে ভয় হয়,—এ হত-ভাগিনীর কপালে তুমি কি বাঁচিবে?"

সেই দিন আহারাদির পর, খেতুর ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় গুলি মা সেলাই করিতে বসিলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! আমি ছেঁড়ার দুই ধার এক করিয়া ধরি, তুমি ওদিক হইতে সেলাই কর, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র হইবে। আর, মা! যখন সূচে সূতা না থাকিবে, তখন আমি

পরাইয়া দিব, তুমি ছিদ্রটী দেখিতে পাও না, সূতা পরাইতে তোমাব অনেক বিলম্ব হয়।”

এইরূপে মাতা পুত্রে কথা কহিতে কহিতে কাপড়-সেলাই হইতে লাগিল। তাহার পর মা সেই গুলিকে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। খেতু কলিকাতায় যাইবেন, তাহার আয়োজন এইরূপে হইতে লাগিল।

বৈকালবেলা খেতু নিরঞ্জনের বাটী যাইলেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া, কলিকাতায় যাইবাব কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। রামহরির নিকট নিরঞ্জন পূর্ব্বেই সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন।

এক্ষণে খেতুকে নানারূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া, নানারূপ উপদেশ দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন,—“খেতু! সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কখনও ব'লিও না। সুখ-দুঃখেব সকল কথা তোমার রামহবি দাদাকে বলিবে, কোনও কথা তাহার নিকট গোপন করিবে না। অনেক বালকের সহিত তোমাকে পডিতে হইবে, তাহার মধ্যে কেহ দুষ্ট, কেহ শিষ্ট। সুতরাং বালকে বালকে বিবাদ হইবে। অন্যায় করিয়া কাহাকেও মারিও না। দুর্ব্বলকে মারিও না, পাঁচ-জনে পড়িয়া একজনকে মারিও না। দুর্ব্বলকে কেহ মারিতে আসিলে তাহার পক্ষ হইও। দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া যদি মার খাইতেও হয়, সেও ভাল। প্রতিদিন রাত্রিতে শুইবার সময় মনে করিয়া দেখিবে যে, সে দিন কি সুকার্য্য, কি কুকার্য্য করিয়াছ। যদি কোনও প্রকার কুকার্য্য করিয়া থাক, তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিবে যে, ‘আর এমন কাজ কখনও করিব না’।”

এইরূপে খেতু নিরঞ্জন কাকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রিতে মাতা-পুত্রের নিদ্রা হইল না। দুইজনে কেবল কথা কহিতে লাগিলেন, কথা আর ফুরায় না।

কতবার মা বলিলেন,—"খেতু! ঘুমাও, না ঘুমাইলে অসুখ করিবে।"

খেতু বলিলেন,—"না মা! আজ রাত্রিতে ঘুম হইবে না। আর মা! কা'ল রাত্রিতে তো আর তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পাব না? কা'ল কতদূর চলিয়া যাব। সে কথা যখন মা! মনে করি, তখন আমার কান্না পায়।"

মা বলিলেন,—"পূজার ছুটীর আর অধিক দিন নাই, দেখিতে দেখিতে এ কয়মাস কাটিয়া যাইবে। তখন তুমি আবার বাড়ী আসিবে।"

প্রাতঃকালে রামহরি আসিলেন। খেতুর মা, খেতুর কপালে দধির ফোঁটা করিয়া দিলেন, চাদরের খুঁটে বিল্বপত্র বাঁধিয়া দিলেন। নীরবে নিঃশব্দে রামহরির হাতের উপর খেতুর হাতটী রাখিলেন। চক্ষু ফুটিয়া জল আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিলেন।

অবশেষে ধীরে ধীরে কেবল এই কথাটী বলিলেন,—"দুঃখিনীর ধন তোমাকে দিলাম।"

রামহরি বলিলেন,—"খেতু! মাকে নমস্কার কর।"

খেতু প্রণাম করিলেন, রামহরি নিজে প্রণাম করিলেন, করিয়া দুইজনে বিদায় হইলেন।

যতক্ষণ দেখা যাইল, ততক্ষণ খেতুর মা অনিমিষ নয়নে সেই পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। খেতুও মাঝে মাঝে পশ্চাৎদিকে চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা গেল না তখন খেতুর মা পথের ধূলায় শুইয়া পড়িলেন। ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া অবিরল ধারায় চক্ষের জলে সেই ধূলা ভিজাইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:০:—

কঙ্কাবতী

পথে পড়িয়া খেতুর মা কাঁদিতেছেন, এমন সময় তনু রায়ের স্ত্রী সেই খানে আসিলেন।

তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—"দিদি! চুপ কর। চক্ষের জল ফেলিতে নাই, চক্ষের জল ফেলিলে ছেলের অমঙ্গল হয়।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—"সব জানি বোন! কিন্তু কি করি? চক্ষের জল যে রাখিতে পারি না, আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমি যে আজ পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি! কি করিয়া ঘরে যাই? আজ যে আমার আর কোনও কাজ নাই! আজ তো আর খেতু পাঠশালা হইতে কালি-ঝুলি মাখিয়া ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া আসিবে না? এতক্ষণ খেতু কত দূর চলিয়া গেল! আহা! বাছার কত না মন কেমন করিতেছে!"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"চল দিদি। ঘরে চল। সেই খানে বসিয়া, চল, খেতুর গল্প করি। আহা! খেতু কি গুণের ছেলে! দেশে এমন ছেলে নাই। তোমার কপালে এখন বাঁচিয়া থাকে—তবেই; তা না হইলে সব বৃথা।"

এই বলিয়া তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর-মার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেক ক্ষণ ধরিয়া দুইজনে খেতুর গল্প করিলেন।

খেতু খাইয়া গিয়াছিল, তনু রায়ের স্ত্রী সেই বাসন গুলি মাজিলেন, ও ঘব দ্বার সব পরিষ্কাব করিয়া দিলেন। বেলা হইলে, খেতুর মা রাঁধিয়া খাইবেন, সে নিমিত্ত তবকারি গুলি কুটিয়া দিলেন, বাটনাটুকু বাটিয়া দিলেন।

খেতুব মা বলিলেন,—“থাক্ বোন! থাক্! আজ আব আমাব খাওয়া দাওয়া! আজ আব আমি কিছু খাইব না।”

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—“না দিদি! উপবাসী কি থাকিতে আছে? খেতুর অকল্যাণ হইবে।”

“খেতুর অকল্যাণ হইবে” এই কথাটী বলিলেই খেতুব মা চুপ। যা’ করিলে খেতুর অকল্যাণ হয়, তা’ কি তিনি করিতে পারেন?

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—“এই সব ঠিক করিয়া দিলাম। বেলা হইলে রান্না চড়াইয়া দিও। কাজ-কর্ম্ম সাবা হইলে আমি আবার ওবেলা আসিব।”

অপবাহ্নে তনু রায়ের স্ত্রী পুনবায় আসিলেন। কোলের মেয়েটীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

খেতুব মা বলিলেন,—“আহা! কি সুন্দর মেয়েটী বোন! যেমন মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।”

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—“হাঁ! সকলেই বলে, এ মেয়েটী তোমাব গর্ভের সুন্দর। তা দিদি! এ পোড়া পেটে কেন যে

এরা আসে? মেয়ে হইলে ঘরের মানুষটী আহ্লাদে আটখানা হন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, আঁতুড় ঘরেই মুখে নুন দিয়া মারি। গ্রীষ্মকালে একাদশীর দিন, মেয়ে দুইটীর যখন মুখ শুকাইয়া যায়, যখন একটু জলের জন্য বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি, দিদি! মার প্রাণ তখন কিরূপ হয়? পোড়া নিয়ম! যে এ নিয়ম করিয়াছে, তাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝাঁটা-পেটা করি! মুখ-পোড়া যদি একটু জল খাবারও বিধান দিত, তাহা হইলে কিছু বলিতাম না।"

খেতুর মা বলিলেন,—"আর বোন্! আর জন্মে যে যেমন করিয়াছে, এ জন্মে সে তার ফল পাইয়াছে; আবার এ জন্মে যে যেরূপ করিবে, ফিরে জন্মে সে তার ফল পাইবে।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তা বটে! কিন্তু মার প্রাণ কি সে কথায় প্রবোধ মানে গা?"

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—"এক এক বার মনে হয় যে, যদি বিদ্যাসাগরী মতটা চলে, তো ঠাকুরদের সিন্নি দিই।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—"চুপ কর বোন্! ছি ছি! ও কথা মুখে আনিও না! বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া সাহেবেরা যদি বলেন যে, দেশে আর বিধবা থাকিতে পাবে না, সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে, ছি ছি! ও মা! কি ঘৃণার কথা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা হইলে যাব কোথা? কাজেই তখন গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে।"

তনু রায়ের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"দিদি! এত দিন তুমি

কলিকাতায় ছিলে, কিন্তু তুমি কিছুই জান না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুড়ো-হাবড়া সকলকেই ধরিয়া বিবাহ দিতে চান নাই। অতি অল্প বয়সে যাহারা বিধবা হয়, কেবল সেই বালিকাদিগের বিবাহের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তা-ও যাহার ইচ্ছা হবে, সে দিবে ; যাহার ইচ্ছা না হবে, সে না দিবে।”

খেতুর মা বলিলেন,—“কি জানি ভাই! আমি অত শত জানি না।”

তনু রায়ের স্ত্রীর দুইটি বিধবা মেয়ে, তাহাদের দুঃখে তিনি সদাই কাতর। সে জন্য বিধবা-বিবাহের কথা পড়িলে তিনি কান দিয়া শুনিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া খেতুর মা যাহা না জানেন, তাহা ইনি জানেন।

তনু রায় পণ্ডিত লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতটী যেই বাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন,—“বিধবা-বিবাহের বিধি যদি শাস্ত্রে আছে, তবে তোমরা মানিবে না কেন? শাস্ত্র অমান্য করা ঘোর পাপের কথা। দুইবার কেন? বিধবাদিগের দশ বার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বরং পুণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগা দেশ ঘোর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এ দেশের আর মঙ্গল নাই।”

তনু রায়ের মত নিষ্ঠাবান্ লোকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া প্রথম প্রথম সকলে কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তার পর সকলে ভাবিল,—“আহা! বাপের প্রাণ! ঘরে দুটী বিধবা মেয়ে, মনের খেদে উনি এইরূপ কথা বলিতেছেন!”

কেবল নিরঞ্জন বলিলেন,—"হাঁ! বিধবা-বিবাহটী প্রচলিত হইলে তনু রায়ের ব্যবসাটী চলে ভাল।"

এই কথা শুনিয়া সকলে নিরঞ্জনকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—"নিরঞ্জনের মনটী হিংসায় পরিপূর্ণ। তা না হইলেই বা ওঁর এমন দশা হইবে কেন? যার দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি, আজ সে পথের ভিখারী; কোনও দিন অন্ন হয়, কোনও দিন অন্ন হয় না।"

খেতুর মাতে আর তনু রায়ের স্ত্রীতে নানারূপ কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল।

খেতুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এ মেয়েটী বুঝি এক বৎসরের হইল?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"হাঁ! এই এক বৎসর পার হইয়া দুই বৎসরে পড়িবে।"

খেতুর মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটীর নাম রাখিয়াছ কি?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"ইহার নাম হইয়াছে, 'কঙ্কাবতী'।"

খেতুর মা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! দিব্য নামটী তো? মেয়েটীও যেরূপ নরম নরম দেখিতে, নামটীও সেইরূপ নরম নরম শুনিতে।"

এইরূপে খেতুর মাতে আর তনু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে বড়ই সদ্ভাব হইল। অবসর পাইলেই তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর মার

কাছে আসেন, আর খেতুর মাও তনু রায়ের বাটীতে যান। মাঝে মাঝে তনু রায়ের স্ত্রী কঙ্কাবতীকে খেতুর মার কাছে ছাড়িয়া যান।

মেয়েটী এখনও হাঁটিতে শিখে নাই। হামাগুড়ি দিয়া চারিদিকে বেড়ায়, কখনও বা বসিয়া খেলা করে, কখনও বা কিছু ধরিয়া দাঁড়ায়। খেতুর মা আপনার কাজ করেন, ও তাহার সহিত দুটী একটী কথা কন। কথা কহিলে মেয়েটী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে, মুখে হাসি ধরে না। মেয়েটী বড় শান্ত, কাঁদিতে একেবারে জানে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:•:—

বালক বালিকা

কলিকাতায় গিয়া খেতু ভালরূপে লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। শান্ত, শিষ্ট, সুবুদ্ধি; খেতুর নানা গুণ দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

রামহরির এক্ষণে কেবল একটী শিশু পুত্র, তাহার নাম নরহরি। তিন বৎসর পরে একটী কন্যা হয়, তাহার নাম হইল সীতা।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী, খেতুকে আপনাদিগের ছেলের চেয়ে অধিক স্নেহ করিতেন। খেতুর প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া স্কুলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। খেতু সকল কথা বুঝিতে পারেন, সকল কথা মনে করিয়া রাখিতে পারেন। যখন যে শ্রেণীতে পড়েন, তখন সেই শ্রেণীর সর্ব্বোত্তম বালক,—খেতু; খেতুর উপর কেহ উঠিতে পারে না। যখন যে কয় খানি পুস্তক পড়েন, তাহার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া খেতুকে ঠকানো ভার। এইরূপে খেতু এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন।

জল খাইবার নিমিত্ত রামহরি খেতুকে একটী করিয়া পয়সা দিতেন; খেতু কোনও দিন খাইতেন, কোনও দিন খাইতেন না। কি করিয়া রামহরি এই কথা জানিতে পারিলেন।

খেতুকে তিনি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খেতু, তুমি জল খাও না কেন? পয়সা লইয়া কি কর?"

খেতু কিছু অপ্রতিভ হইলেন, একটু খানি চুপ করিয়া উত্তর করিলেন,—"দাদা মহাশয়! যে দিন বড় ক্ষুধা পায়, যে দিন আর থাকিতে পারি না, সেই দিন জল খাই; যে দিন না খাইয়া থাকিতে পারি, সে দিন আর খাই না। যা' পয়সা বাঁচিয়াছে, তাহা আমার কাছে আছে। যখন মার নিকট হইতে আসি, তখন মাকে বলিয়াছিলাম যে, 'মা! তোমার জন্য আমি এক ছড়া মালা কিনিয়া আনিব'; সেই জন্য এ পয়সা রাখিতেছি।"

যখন এই কথা হইতেছিল, তখন রামহরির নিকট খেতু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রামহরি খেতুর মাথায় হাত দিয়া সম্মুখের চুল গুলি পশ্চাৎ দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। খেতু বুঝিলেন, দাদা রাগ করেন নাই, আদর করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামহরি বলিলেন,—"খেতু! যখন মালা কিনিবে, আমাকে বলিও, আমি ভাল মালা কিনিয়া দিব।"

পূজার ছুটী নিকট হইল। তখন খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! কৈ এই বার মালা কিনিয়া দিন?"

রামহরি বলিলেন,—"তোমার কত গুলি পয়সা হইয়াছে, নিয়ে এস, দেখি?"

খেতু পয়সা গুলি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন। রামহরি গণিয়া দেখিলেন যে, এক টাকারও অধিক পয়সা হইয়াছে।

আট আনা দিয়া রামহরি এক ছড়া ভাল রুদ্রাক্ষের মালা কিনিয়া, বাকি পয়সাগুলি খেতুকে ফিরাইয়া দিলেন!

খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! আমি এ পয়সা লইয়া আর কি করিব? এ পয়সা আপনি নিন্!"

রামহরি উত্তর করিলেন,—"না খেতু! এ পয়সা আমার নয়, এ পয়সা তোমার, বাড়ী গিয়া মাকে দিও, তোমার মা কত আহ্লাদ করিবেন।"

বাড়ী যাইবার দিন নিকট হইল। এখানে খেতুর মনে, আর সেখানে মার মনে আনন্দ আর ধরে না! তসর ও গালার ব্যবসায়ীরা সকলে এখন দেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত রামহরি খেতুকে পাঠাইয়া দিলেন, আর কবে কোন্ সময়ে দেশে পৌঁছিবেন, সে সমাচার আগে থাকিতে খেতুর মাকে লিখিলেন।

দত্তদের পুকুরধারে কেন? খেতুর মা আরও অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূর হইতে খেতু মাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। খেতুর মা, ছেলেকে বুকে করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিলেন।

খেতু বলিলেন,—"ঐ যা! মা! আমি তোমাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।"

মা উত্তর করিলেন,—"থাক্ আর প্রণামে কাজ নাই। অমনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও, তোমার সোনার দোয়াত-কলম হউক।"

খেতু বলিলেন,—"মা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি দত্তদের পুকুর ধারে থাকিবে, এত দূরে আসিবে, তা' জানিতাম না।"

মা বলিলেন,—'বাছা! যদি উপায় থাকিত, তো আমি কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতাম। খেতু! তুমি রোগা হইয়া গিয়াছ।"

খেতু উত্তর করিলেন,—"না মা! রোগা হই নাই, পথে একটু কষ্ট হইয়াছে, তাই রোগা-রোগা দেখাইতেছে। মা! এখন আমি হাঁটিয়া যাই, এত দূর তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পরিবে না।"

মা বলিলেন,—"না না, আমি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইব।"

কোলে যাইতে যাইতে খেতু পয়সাগুলি চুপি চুপি মা'র আঁচলে বাঁধিয়া দিলেন। বাড়ী যাইয়া যখন খেতু মা'র কোল হইতে নামিলেন, তখন মা'র আঁচল ভারি ঠেকিল।

মা বলিলেন,—"এ আবার কি? খেতু! তুমি বুঝি আমার আঁচলে পয়সা বাঁধিয়া দিলে?"

খেতু হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন,—"মা! রও তোমাকে আবার একটা তামাসা দেখাই।"

এই বলিয়া খেতু মালা-ছড়াটী মা'র গলায় দিয়া দিলেন, আর বলিলেন,—"কেমন মা! মনে আছে তো?"

মা খেতুর গালে ঈষৎ ঠোনা মারিয়া বলিলেন,—"ভারি দুষ্ট ছেলে!" খেতু হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিলেন।

পর দিন খেতু দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাটীতে কোথা হইতে একটী ছোট মেয়ে আসিয়াছে।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! ও মেয়েটী কাদের গা?"

মা বলিলেন,—"জান না? ও যে তোমার তনু কাকার ছোট মেয়ে! ওর নাম কঙ্কাবতী। তনু রায়ের স্ত্রী এখন সর্ব্বদাই আমার নিকট আসেন। আমি পৈতা কাটি, আর দুই জনে বসিয়া গল্প গাছা করি। মেয়েটীকে তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যান। মেয়েটী আপনার মনে খেলা করে, কোনও রূপ উপদ্রব করে না। আমার কাছে থাকিতে ভাল বাসে।"

তনু রায়ের সহিত খেতুর কোন সম্পর্ক নাই, কেবল পাড়া-প্রতিবাসী সুবাদে কাকা কাকা, বলিয়া ডাকেন।

কঙ্কাবতীকে খেতু বলিলেন,—"এস, এই দিকে এস।"

কঙ্কাবতী সেই দিকে যাইতে লাগিল। খেতু বলিলেন,—"দেখ দেখ, মা! কেমন এ টল্ টল্ করিয়া চলে!"

খেতুর মা বলিলেন, "পা এখনও শক্ত হয় নাই।"

একটী পাতা দেখাইয়া খেতু বলিলেন,—"এই নাও।"

পাতাটী লইবার নিমিত্ত কঙ্কাবতী হাত বাড়াইল ও হাসিল।

খেতু বলিলেন,—"মা! কেমন হাসে দেখ?"

মা উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা! মেয়েটি খুব হাসে, কাঁদিতে একেবারে জানে না, অতি শান্ত।"

খেতু বলিলেন,—"মা! আগে যদি জানিতাম, তো ইহার জন্য একটী পুতুল কিনিয়া আনিতাম।"

মা বলিলেন,—"এইবার যখন আসিবে, তখন আনিও।"

নবম পরিচ্ছেদ

—:০:—

মেনী

পূজার ছুটী ফুরাইলে, খেতু কলিকাতায় যাইলেন; সেখানে অতি মনোযোগের সহিত লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন। বৎসরের মধ্যে দুই বার ছুটী হইলে তিনি বাটী আসেন। সেই সময় মা'র জন্য কোনও না কোনও দ্রব্য, আর কঙ্কাবতীর জন্য পুতুলটী খেলনাটী লইয়া আসেন। খেতুর মা'র নিকট কঙ্কাবতী সর্ব্বদাই থাকে, কঙ্কাবতীকে তিনি বড় ভাল বাসেন।

খেতুর যখন বার বৎসর বয়স, তখন তিনি একটী বড় মানুষের ছেলেকে পড়াইতে লাগিলেন। বালকের পিতা খেতুকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেন।

প্রথম মাসের টাকা কয়টী খেতু, রামহরির হাতে দিয়া বলিলেন, —"দাদা মহাশয়! এ মাস হইতে মা'র চাউলের দাম আর আপনি দিবেন না, এই টাকা মাকে দিবেন। আমি শুনিয়াছি, আপনার ধার হইয়াছে, তাই যত্ন করিয়া আমি এই টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি।"

রামহরি বলিলেন,—"খেতু! তুমি উত্তম করিয়াছ। উদ্যম, উৎসাহ, পৌরুষ মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এ টাকা আমি তোমার মা'র নিকট পাঠাইয়া দিব। তাঁহাকে লিখিব যে, তুমি

নিজে এ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছ। আর আমি সকলকে বলিব যে, দ্বাদশ বৎসরের শিশু, আমাদের খেতু, তাহার মাকে প্রতিপালন করিতেছে।”

এইবার যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন মা'র জন্য এক খানি নামাবলী, আর কঙ্কাবতীর জন্য এক খানি রাঙা কাপড় আনিলেন। রাঙা কাপড় খানি পাইয়া কঙ্কাবতীর আর আহ্লাদ ধরে না। ছুটিয়া তাহা মাকে দেখাইতে যাইলেন।

খেতু বলিলেন,—“মা! কঙ্কাবতীকে লেখা-পড়া শিখাইলে হয় না?”

মা বলিলেন,—“কি জানি, বাছা! তনু রায় এক প্রকারের লোক। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।”

খেতু বলিলেন,—“তাতে আর দোষ কি মা? কলিকাতায় কত মেয়ে স্কুলে যায়।”

মা বলিলেন,—“কঙ্কাবতীর মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।”

সেই দিন তনু রায়ের স্ত্রী আসিলে, খেতুর মা কথায় কথায় বলিলেন,—“খেতু বলিতেছে,—‘এবার যখন বাটী আসিব, তখন কঙ্কাবতীর জন্য এক খানি বই আনিব, কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব।’ আমি বলিলাম,—‘না বাছা! তাতে আর কাজ নাই, তোমার তনু কাকা হয় তো রাগ করিবেন’!”

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—“তাতে আবার রাগ কি? আজ কা'ল তো ঐ সব হইয়াছে। জামা গায়ে দেওয়া, লেখা-

পড়া করা আজ কা'ল তো সকল মেয়েই করে! তবে, আমাদের পাড়া গাঁ, তাই এখানে ওসব নাই।"

বাটী গিয়া কঙ্কাবতীর মা স্বামীকে বলিলেন,—"খেতু বাড়ী আসিয়াছে, কঙ্কাবতীর জন্য কেমন এক খানি রাঙ্গা কাপড় আনিয়াছে!"

তনু রায় বলিলেন,—"খেতু ছেলেটী ভাল লেখা-পড়ায় মন আছে, দু পয়সা আনিয়া খাইতে পারিবে, তবে বাপের মত ডোক্লা না হয়।"

স্ত্রী বলিলেন,—"খেতু বলিতেছিল যে, 'এই বার যখন বাটী আসিব, তখন এক খানি বই আনিয়া কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব'।"

তনু রায় বলিলেন,—"স্ত্রীলোকের আবার লেখা পড়া কেন? লেখাপড়া শিখিয়া আর কাজ নাই।"

না বুঝিয়া তনু রায় এই কথাটি বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন তিনি স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, লেখ-পড়ার অনেক গুণ আছে।

আজ কা'লের বরেরা শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে ভাল বাসে। এরূপ কন্যার আদর হয়, মূল্যও অধিক হয়।

তবে কথা এই, কাজটী শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না? শাস্ত্রসম্মত না হইলে, তনু রায় কখনই মেয়েকে লেখা-পড়া শিখাইতে দিবেন না। মনে মনে তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন।

বিচার করিয়া দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা শাস্ত্রে

নিষিদ্ধ বটে, তবে এ নিষেধটি সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের নিমিত্ত, কলিকালের জন্য নয়। পূর্ব্ব কালে যাহা করিতেছিল, এখন তাহা করিতে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, নরমেধ যজ্ঞ। এখন 'মানুষ বলি' দিলে ফাঁসি যাইতে হয়। আর এক দৃষ্টান্ত—সমুদ্র-যাত্রা। এখন করিলে জাতি যায়।

তাই, তনু রায়ের মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি এক বার সাগর যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তনু রায় কিছুতেই পাঠান নাই।

মা'কে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন,—"মা! সাগর যাইতে নাই। সমুদ্র-যাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের সঙ্গে আর সমুদ্রের সঙ্গে ঘোরতর আড়ি। সমুদ্র দেখিলে পাপ, সমুদ্র ছুঁইলে পাপ। কেন মা! পয়সা খরচ করিয়া পাপের ভার কিনিয়া আনিবে? কেন মা! জাতি কুল বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে?"

এক্ষণে তনু রায় বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা করিতে নাই। সুতরাং পূর্ব্বকালে যাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা লোকে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষা করা পূর্ব্বে মানা ছিল, তাই এখন তাহাতে কোনও রূপ দোষ হইতে পারে না।

শাস্ত্রকে তনু রায় এইরূপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িলেন। শাস্ত্রটী যখন মনের মত গড়া হইল, তখন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,—"আচ্ছা! খেতু যদি কঙ্কাবতীকে একটু আধটু পড়িতে শিখায়, তাহাতে আমার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই।"

তনু রায়ের স্ত্রী সেই কথা খেতুর মাকে বলিলেন। খেতুর মা সেই কথা খেতুকে বলিলেন।

এবার যখন খেতু বাড়ী আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর জন্য এক খানি প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় আনিলেন। "লেখা-পড়া শিখিব" এই কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম কঙ্কাবতীর খুব আহ্লাদ হইল।

কিন্তু দুই চারি দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, লেখা পড়া শিক্ষা করা নিতান্ত আমোদের কথা নহে। কঙ্কাবতীর চক্ষে অক্ষরগুলি সব এক প্রকার দেখায়। কঙ্কাবতী এটী বলিতে সেটা বলিয়া ফেলেন।

খেতুর রাগ হইল। খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তোমার লেখা-পড়া হইবে না। চিরকাল তুমি মূর্খ হইয়া থাকিবে।"

কঙ্কাবতী অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি কি করিব, আমার যে মনে থাকে না?"

খেতুর মা বলিলেন,—"ছেলে মানুষকে কি বকিতে আছে? মিষ্ট কথা বলিয়া শিখাইতে হয়! এস, মা! তুমি আমার কাছে এস! তোমার আর লেখা-পড়া শিখিতে হইবে না।"

খেতু বলিলেন,—"মা! কঙ্কাবতী রাত্রি দিন মেনীকে লইয়া থাকে। তা'তে কি আর লেখা পড়া হয়?"

মেনী কঙ্কাবতীর বিড়াল। অতি আদরের ধন মেনী।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"জেঠাই মা! আমি মেনীকে ক খ শিখাই; তা আমিও যেমনি বোকা, মেনীও তেমনি বোকা। কেমন মেনী, না? মেনীও পড়িতে পারে না, আমিও পড়িতে

বালিকা কঙ্কাবতী

না, মেনী ?

পারি না। আমিও ছেলে মানুষ, মেনীও ছেলে মানুষ। আমিও বড় হইলে পড়িতে শিখিব, মেনীও বড় হইলে পড়িতে শিখিবে। না মেনী ?"

খেতু হাসিয়া উঠিলেন। খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতি ! তুমি পাগল না কি ?"

যাহা হউক ক্রমে কঙ্কাবতীর প্রথম ভাগ বর্ণ-পরিচয় সায় হইল।

খেতু বলিলেন,—"আমি শীঘ্র কলিকাতায় যাইব। তাড়াতাড়ি করিয়া প্রথম ভাগ খানি শেষ করিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া হইল না। এই কয় মাসে পুস্তক খানি একেবারে মুখস্থ করিয়া রাখিবে। এবার আমি দ্বিতীয় ভাগ লইয়া আসিব।"

পুনরায় যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল। কঙ্কাবতীকে আর পড়াইতে হইল না, কঙ্কাবতী এখন আপনা-আপনি সব পড়িতে শিখিলেন। খেতু, কঙ্কাবতীকে এক খানি পাটীগণিত দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কঙ্কাবতী অঙ্ক শিখিলেন। মাঝে মাঝে খেতু কেবল একটু আধটু বলিয়া দিতেন।

কঙ্কাবতী পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। কলিকাতা হইতে খেতু তাঁহাকে নানারূপ পুস্তক ও সংবাদ-পত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন গুলি পর্য্যন্ত কঙ্কাবতী পড়িতেন।

দশম পরিচ্ছেদ

—:o:—

বৌ-দিদি

তের বৎসর বয়সে খেতু ইংরেজীতে প্রথম পাসটী দিলেন। পাস দিয়া তিনি জলপানি পাইলেন। জলপানি পাইয়া মা'র নিকট তিনি একটী ঝি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মা বৃদ্ধা হইতেছেন, মা'র যেন কোনও কষ্ট না হয়। এটী সেটী আনিয়া, কাপড খানি চোপড় খানি কিনিয়া, রামহরির সংসারেও তিনি সহায়তা করিতে লাগিলেন।

পনর বৎসর বয়সে খেতু আর একটী পাস দিলেন। জলপানি বাড়িল। সতর বৎসর বয়সে আর একটী পাস দিলেন। জলপানি আরও বাড়িল।

খেতু টাকা পাইতে লাগিলেন, সেই টাকা দিয়া মা'র দুঃখ সম্পূর্ণ-রূপে ঘুচাইলেন। মা যখন যাহা চান, তৎক্ষণাৎ তাহা পান। তাঁহার আর কিছুমাত্র অভাব রহিল না।

শিবপূজা করিবেন বলিয়া খেতুর মা একদিন ফুল পান নাই। তাহা শুনিয়া খেতু বাড়ীর নিকট একটী চমৎকার ফুলের বাগান করিলেন। কলিকাতা হইতে কত গাছ লইয়া সেই বাগানে পুঁতিলেন। নানা রঙের ফুলে বাগানটী বার মাস আলো করা থাকিত।

রামহরির কন্যা সীতাও এখন বেশ বড় হইয়াছে। মা একেলা

ফুল-সাজ

থাকেন, সেই জন্য দাদাকে বলিয়া, খেতু সীতাকে মা'র নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সীতাকে পাইয়া খেতুর মা'র আর আনন্দের অবধি নাই।

কঙ্কাবতীও সীতাকে খুব ভাল বাসিতেন। বৈকাল বেলা দুই জনে গিয়া বাগানে বসিতেন। কঙ্কাবতী এখন খেতুর সম্মুখে বড় বাহির হন না। খেতুকে দেখিলে কঙ্কাবতীর এখন লজ্জা করে।

তবে খেতুর গল্প করিতে, খেতুর গল্প শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন। অন্য লোকের সহিত খেতুর গল্প করিতে, কিংবা অন্য লোকের মুখে খেতুর কথা শুনিতে, তাঁর লজ্জা করিত। এ সব কথা সীতার সহিত হইত। বৈকাল বেলা দুইজনে ফুলের বাগানে যাইতেন। নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া কঙ্কাবতী সীতাকে সাজাইতেন। ফুল দিয়া নানারূপ গহনা গড়িতেন। গলায়, হাতে, মাথায়, যেখানে যাহা ধরিত কঙ্কাবতী সীতাকে ফুলের গহনা পরাইতেন। তাহার পর সীতার মুখ হইতে বসিয়া বসিয়া খেতুর কথা শুনিতেন।

নিরঞ্জন কাকাকে খেতু ভুলিয়া যান নাই। যখন খেতু বাটী আসেন, তখন নিরঞ্জন কাকার জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী তাঁহাকে বিধিমতে আশীর্ব্বাদ করেন।

কঙ্কাবতী বড় হইলে, খেতু তাঁহাকে পুস্তক ও সংবাদপত্র ব্যতীত আরও নানা দ্রব্য দিতেন। আজ কা'ল বালিকাদিগের নিমিত্ত যেরূপ শেমিজ প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে, কঙ্কাবতীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে খেতু তাহা লইয়া যাইতেন।

রামহরির সংসারে খেতু সহায়তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু

রামহরি এ কথায় সহজে স্বীকার হন নাই। একবার খেতু নরহরির জন্য একজোড়া কাপড় কিনিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রামহরি খেতুকে বকিয়াছিলেন। খেতুর তাহাতে অতিশয় অভিমান হইয়াছিল। দাদাকে কিছু না বলিয়া, তিনি রামহরির স্ত্রীব নিকট গিয়া নানারূপ দুঃখ করিতে লাগিলেন। রামহরির স্ত্রীকে খেতু বৌ-দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

খেতুব অভিমান দেখিয়া বৌ-দিদি বলিলেন,—"তোমাব দাদাকে কিছু বলিতে না পারিয়া, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঝগডা কবিতে আসিয়াছ?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"বৌ-দিদি! তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ। তোমাদের পুত্র, নবহরি যেরূপ, আমাকেও সেইরূপ দেখা উচিত। পুত্রের মত আমাকে যখন না দেখিলে, তখন আমি 'পর'। আমি যখন পর, তখন আবাব তোমাদেব সঙ্গে আমার ঝগড়া কি? দাদা মহাশয় আমাকে পর মনে কবিয়াছেন, এখন তুমিও তাই কর, তাহা হইলে সকল কথাই ফুরাইয়া যায়।"

বৌ-দিদি বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হয় খেতু?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"কি হয়? হয় আর কি? তাহা হইলে আমি আর অর্থোপার্জ্জন করিতে যত্ন করি না। তোমাদের সহিত আর কথা কই না। তোমাদের বাড়ীতে আর থাকি না। মনে করি, আমার মাকে ভিখারিণী দেখিয়া ইঁহারা ভিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার এই শরীর, আমার এই অস্থি, মাংস, সমুদায় ভিক্ষায়

গঠিত। ভদ্র-সমাজে আর যাই না, ভদ্র-সমাজে আর মুখ তুলিয়া কথা কহি না। দুঃখিনী ভিখারিণীর ছেলে, ভিক্ষায় যাহার দেহ গঠিত, কোন্ মুখে সে আবার ভদ্র-সমাজে দাঁড়াইবে ?”

বৌ-দিদি বলিলেন,—“ছি খেতু! অমন কথা বলিতে নাই। সম্পর্কে তুমি দেবর বটে, কিন্তু পুত্রের চেয়ে তোমাকে অধিক স্নেহ করি। তুমি উপযুক্ত সন্তান, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে; তাহার আবার অভিমান কি ?”

খেতু বলিলেন,—“বৌ-দিদি! মাকে সুখে রাখিব, তোমাদিগকে সুখে রাখিব, চিরকাল আমার এই কামনা। এক্ষণে আমার ক্ষমতা হইয়াছে, এখন যদি তোমরা আমাকে সে কামনা পূর্ণ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমার মনে বড় দুঃখ হইবে।”

বৌ-দিদি উত্তর করিলেন,—“সার্থক তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন। এখন আশীর্ব্বাদ করি, খেতু! শীঘ্রই তোমার একটী রাঙা বৌ হউক।”

সেই দিন রামহরির স্ত্রী, রামহরিকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন,—“দেখ! আমাদের সংসারের কষ্ট দেখিয়া খেতু বড় কাতর হইয়াছে। খেতু এখন দু পয়সা আনিতেছে। সে বলে,—‘যখন ইঁহারা আমাকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়াছেন, তখন আমিও পুত্রের মত কার্য্য করিব।’ সংসার খরচে খেতু যদি কোনও রূপ সহায়তা করে, তাহা হইলে খেতুকে কিছু বলিও না। এ বিষয়ে খেতুকে কিছু বলিলে, তাহার মনে বড় দুঃখ হয়।”

স্ত্রীর কাছে সকল কথা শুনিয়া, রামহরি খেতুকে ডাকিলেন।

খেতু আসিলে, রামহরি তাঁহাকে বলিলেন,—"রাগ করিয়াছ, দাদা? পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান। আমার মত যখন বয়স হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, টাকা টাকা করিয়া পৃথিবীর লোক কিরূপ পাগল। সেই জন্য, খেতু, তোমাকে আমার সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমাদের দুঃখ চিরকাল। আমাদের কখনও 'নাই নাই' ঘুচিবে না। সে দুঃখের ভাগী তোমাকে আমি কেন করিব? অনেক দিন হইতে আমি জল খাবার খাই না। জ্বর হইলে উপবাস দিয়া ভাল করি। তুমি দুধের ছেলে, তোমাকে কেন এ দুঃখে পড়িতে দিব? এই মনে করিয়া তোমাকে এ সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমি তখন ভাবি নাই, তুমি কিরূপ পিতার পুত্র। খেতু। অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পৃথিবীতে তিনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, ভাই! যেন তুমি সেই দেবতাতুল্য হও।"

রামহরির চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। রামহরির স্ত্রীও চক্ষু পুঁছিতে লাগিলেন। খেতুরও চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

খেতু তিনটা পাস দিলেন, আর কন্যাভার-গ্রস্ত লোকেরা রামহরির নিকট আনা-গোনা করিতে লাগিলেন। সকলের ইচ্ছা, খেতুর সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইনি বলেন,—"আমি এত সোনা দিব, এত টাকা দিব।" তিনি বলেন,—"আমি এত দিব, তত দিব।" এইরূপে সকলে নিলাম ডাকা-ডাকি করিতে লাগিলেন।

রামহরি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যত দিন না খেতুর লেখা-পড়া সমাপ্ত হয়, যত দিন না খেতু দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তত দিন তিনি খেতুর বিবাহ দিবেন না।

কিন্তু কন্যাভার-গ্রস্ত লোকেরা সে কথা শুনিবেন কেন? রামহরির নিকট তাঁহারা নানারূপ বিনতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামহরি মনে করিলেন,—"দূর হউক! এক স্থানে কথা দিয়া রাখি। তাহা হইলে সকলে আর আমাকে এরূপ ব্যস্ত করিবে না।"

এই মনে করিয়া তিনি অনেকগুলি কন্যা দেখিলেন। শেষে জন্মেজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে তিনি মনোনীত করিলেন। জন্মেজয় বাবু সঙ্গতিপন্ন লোক ও সদ্বংশজাত। রামহরি কিন্তু তাঁহাকে সঠিক কথা দিতে পারিলেন না। খেতুর মা'র মত না লইয়া কি করিয়া তিনি কথা স্থির করেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

সম্বন্ধ

কঙ্কাবতীর যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপ বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর রূপে দশদিক আলো, কঙ্কাবতীর পানে চাওয়া যায় না। রংটী উজ্জ্বল ধব্‌ধবে, ভিতর হইতে যেন জ্যোতি বাহির হইতেছে; জল খাইলে যেন জল দেখা যায়। শরীরটী স্থূলও নয়, কৃশও নয়, যেন পুতুলটী কি ছবি খানি। মুখখানি যেন বিধাতা কুঁদে কাটিয়াছেন। নাকটী টিকোলো-টিকোলো, চক্ষু দুটী টানা, চক্ষুর পাতা দীর্ঘ, ঘন ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু কিঞ্চিৎ নীচে করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অদ্ভুত শোভার আবির্ভাব হয়। এইরূপ চক্ষু দুইটীর উপর যেরূপ সরু সরু, কাল কাল, ঘন ভুরুতে মানায়, কঙ্কাবতীর তাহাই ছিল। গাল দুটী নিতান্ত পূর্ণ নহে, কিন্তু হাসিলে টোল পড়ে। তখন সেই হাসিমাখা, টোল-খাওয়া মুখখানি দেখিলে শত্রুর মনও মুগ্ধ হয়। ঠোঁট দুটী পাতলা। পান খাইতে হয় না, আপনা-আপনি সদাই টুক্‌ টুক্‌ করে। কথা কহিবার সময়, এই ঠোঁটের ভিতর দিয়া, সাদা দুধের মত দুই চারিটী দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন দাঁতগুলি যেন ঝক্‌ ঝক্‌ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীর খুব চুল, ঘোর কাল, ছাড়িয়া দিলে, কোঁকডা কোঁকড়া হইয়া পিঠের উপর গিয়া পড়ে। সম্মুখের

সিঁথিটী কে যেন তূলি দিয়া ঈষৎ সাদা রেখা টানিয়া দিয়াছে। স্থূল কথা, কঙ্কাবতী একটী প্রকৃত সুন্দরী, পথের লোককে চাহিয়া দেখিতে হয়, বার বার দেখিয়াও আশা মিটে না। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কঙ্কাবতী যখন দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করেন, তখন যথার্থই যেন বিজলী খেলিয়া বেড়ায়।

এখন কঙ্কাবতীর বয়স হইয়াছে। এখন কঙ্কাবতী সেরূপ আর দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়ান না। তবে কি জন্য একদিন একটু ছুটিয়া বাটী আসিয়াছিলেন। শ্রমে মুখ ঈষৎ রক্ত বর্ণ হইয়াছে, গাল দিয়া সেই রক্তিমার আভা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সমস্ত মুখ টল্ টল্ করিতেছে, জগতে কঙ্কাবতীর রূপ তখন আর ধরে না।

মা, তাহা দেখিয়া, তনু রায়কে বলিলেন,—"তোমার মেয়ের পানে একবার চাহিয়া দেখ! এ সোনার প্রতিমাকে তুমি জলাঞ্জলি দিও না। কঙ্কাবতী স্বয়ং লক্ষ্মী। এমন সুলক্ষণা মেয়ে জনমে কি কখনও দেখিয়াছ? মা যদি এই অভাগা কুটীরে আসিয়াছেন, তো মাকে অনাস্থা করিও না। মা যেরূপ লক্ষ্মী সেইরূপ নারায়ণ দেখিয়া মা'র বিবাহ দিও। এবার আমার কথা শুনিও।"

তনু রায় কঙ্কাবতীর পানে একটু চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া চকিত হইলেন। তনু রায়ের মন কখনও এরূপ চকিত হয় নাই। তনু রায় ভাবিলেন,—"এ কি? একেই বুঝি লোকে অপত্যস্নেহ বলে?"

স্ত্রীর কথার তনু রায় কোনও উত্তর করিলেন না।

আর একদিন তনু রায়ের স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ, কঙ্কাবতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। আমার একটী কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। ভাল, মনুষ্য-জীবনে তো আমার একটী সাধও পূর্ণ কর!"

তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কি তোমার সাধ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আমার সাধ এই যে, ঝি-জামাই লইয়া আমোদ আহ্লাদ করি। দুই মেয়ের তুমি বিবাহ দিলে, আমার সাধ পূর্ণ হইল না, দিবারাত্রি ঘোর দুঃখের কারণ হইল। যা হউক সে যা হইবার তা হইয়াছে; এখন কঙ্কাবতীকে একটী ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দাও। মেয়ে দুইটী বলে যে, 'আমাদের কপালে যা ছিল, তা হইয়াছে, এখন ছোট বোনটীকে সুখী দেখিলে আমরা সুখী হই'।"

স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, টাকার চেয়ে তনু রায়ের কেহই প্রিয় নয়। তথাপি, কঙ্কাবতীর কথা পড়িলে তাঁহার মন কিরূপ করে। সে কি মমতা, না আতঙ্ক? দেবীরূপী কঙ্কাবতীকে সহসা বিসর্জ্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে দুরন্ত অর্থ লোভও অজেয়। ত্রিভুবন-মোহিনী কন্যাকে বেচিয়া তিনি বিপুল অর্থ লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আজ সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া ফেলেন? তনু রায়ের মনে আজ দুই ভাব। এরূপ সঙ্কটে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তনু রায় বলিলেন,—"আচ্ছা! আমি না হয়, কঙ্কাবতীর বিবাহ দিয়া টাকা না লইলাম! কিন্তু বব

হইতে টাকা তো আর দিতে পারিব না? আজ কা'ল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, টাকা না দিলে সুপাত্র মিলে না। তার কি করিব?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা! আমি যদি বিনা টাকায় সুপাত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারি, তুমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে কি না, তা আমাকে বল?"

তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায়? কে?"

স্ত্রী বলিলেন,—"বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর দোষ হয়, বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ হয়। চক্ষুর উপর দেখিয়াও দেখিতে পাও না?"

তনু রায় বলিলেন,—"কে বলনা শুনি?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"কেন, খেতু?"

তনু রায় বলিলেন,—"তা কি কখনও হয়? বিষয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই; এরূপ পাত্রে আমি কঙ্কাবতীকে কি করিয়া দিই। ভাল, আমি না হয় কিছু না লইলাম, মেয়েটী যাহাতে সুখে থাকে, দুখানা গহনা-গাঁটি পরিতে পায়, তা তো আমাকে করিতে হইবে?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তা, খেতুর কি কখনও ভাল হইবে না? তুমি নিজেই না বল? যে, 'খেতু ছেলেটী ভাল, খেতু দু পয়সা আনিতে পারিবে।' যদি কপালে থাকে, তো খেতু হইতেই কঙ্কাবতী কত গহনা পরিবে। কিন্তু, গহনা হউক আর নাই হউক, ছেলেটী ভাল হয় এই আমার মনের বাসনা। খেতুর মত ছেলে পৃথিবী খুঁজিয়া কোথায় পাইবে, বল দেখি? গা

কঙ্কাবতী আমার যেমন লক্ষ্মী, খেতু তেমনি দুর্লভ সুপাত্র। এক বোঁটায় দুটী ফুল সাধ করিয়া বিধাতা যেন গড়িয়াছেন!"

তনু রায় বলিলেন,—"ভাল, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে এখন তাড়া-তাড়ি কিছু নাই।"

আরও কিছু দিন গত হইল। কলিকাতা হইতে খেতুর মা'র নিকট এক খানি চিঠি আসিল। সেই চিঠি খানি তিনি তনু রায়কে দিয়া পড়াইলেন। পত্র খানি রামহরি লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—

"খেতুর বিবাহের জন্য অনেক লোক আমার নিকট আসিতেছেন। আমাকে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যে, লেখা-পড়া সমাপ্ত হইলে, তাহার পর খেতুর বিবাহ দিই। কিন্তু কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ সে কথা শুনিবেন কেন? তাঁহারা বলেন, 'কথা স্থির হইয়া থাকুক, বিবাহ না হয় পরে হইবে।' আমি অনেকগুলি কন্যা দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে জন্মেজয় বাবুর কন্যা আমার মনোনীত হইয়াছে। কন্যাটী সুন্দরী, ধীর ও শান্ত। বংশ সৎ, কোনও দোষ নাই। পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী বর্ত্তমান। কন্যার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। কন্যাকে নানা অলঙ্কার ও জামাতাকে নানা ধন দিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিবেন। এক্ষণে আপনার কি মত জানিতে পারিলে, কন্যার পিতাকে আমি সঠিক কথা দিব।"

পত্র খানি পড়িয়া তনু রায় অবাক্। দুঃখী বলিয়া যে খেতুকে তিনি কন্যা দিতে অস্বীকার, আজ নানা ধন দিয়া সেই খেতুকে জামাতা করিবার নিমিত্ত লোকে আরাধনা করিতেছে!

খেতুর মা রামহরিকে উত্তর লিখিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তবে আমার মনে একটী বাসনা ছিল; যখন দেখিতেছি সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তখন সে কথায় আর আবশ্যক নাই।"

এই পত্র পাইয়া, রামহরি খেতুকে সকল কথা বলিলেন, আর এ বিষয়ে খেতুর কি মত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! মা'র মনের বাসনা কি তাহা আমি বুঝিয়াছি। যত দিন মা'র মনের সাধ পূর্ণ হইবার কিছু মাত্রও আশা থাকিবে, তত দিন কোনও স্থানে আপনি কথা দিবেন না।"

রামহরি বলিলেন,—"হাঁ তাহাই উচিত। তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি এক্ষণে কোনও স্থানে কথা দিব না।"

'খেতুর অন্য স্থানে বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিয়া কঙ্কাবতীর মা একবারে শরীর ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর নিকট রাত্রি দিন কান্না-কাটা করিতে লাগিলেন।

এদিকে তনু রায়ও কিছু চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, —"আমি বৃদ্ধ হইতেছি। দুইটী বিধবা গলায়, পুত্রটী মূর্খ। এখন একটী অভিভাবকের প্রয়োজন। খেতু য়েরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, খেতু যেরূপ সুবোধ, তাহাতে পরে তাহার নিশ্চয় ভাল হইবে। আমাকে সে একেবারে এখন কিছু না দিতে পারে, না পারুক; পরে, মাসে মাসে আমি তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু লইব।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি যদি খেতুর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি খরচ পত্র কিছু করিতে পারিব না।"

এইরূপ অনুমতি পাইয়া তনু রায়ের স্ত্রী, তৎক্ষণাৎ খেতুর মা র নিকট দৌড়িয়া যাইলেন, আর খেতুর মা'র পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

খেতুর মা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী আমার বৌ হইবে, চিরকাল আমার এই সাধ। কিন্তু বোন্! দুই দিন আগে যদি বলিতে? অন্য স্থানে কথা স্থির করিতে আমি রামহরিকে চিঠি লিখিয়াছি। রামহরি যদি কোনও স্থানে কথা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কথা আর নড়িবার নয়। তাই আমার মনে বড় ভয় হইতেছে।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"দিদি! যখন তোমার মত আছে, তখন নিশ্চয় কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হইবে। তুমি এক খানি চিঠি লিখাইয়া রাখ। চিঠি খানি লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

তাহার পর দিন খেতুর-মা ও কঙ্কাবতীর-মা, দুই জনে মিলিয়া কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন। খেতুর মা রামহরিকে এক খানি পত্র লিখিলেন।

খেতুর মা লিখিলেন যে,—"কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হয়, এই আমার মনের বাসনা। এক্ষণে তনু রায় ও তাঁহার স্ত্রী, সেই জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। অন্য কোনও স্থানে যদি খেতুর বিবাহের কথা স্থির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কঙ্কাবতীর সহিত স্থির করিয়া তনু রায়কে পত্র লিখিবে।"

এই চিঠি পাইয়া রামহরি, তাঁহার স্ত্রী ও খেতু, সকলেই আনন্দিত হইলেন।

খেতুর হাতে পত্রখানি দিয়া রামহরি বলিলেন,—"তোমার মা'র আজ্ঞা, ইহার উপর আর কথা নাই।"

খেতু বলিলেন,—"মা'র যেরূপ অনুমতি, সেইরূপ হইবে। তবে তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। তনু কাকা তো মেয়ে গুলিকে বড় করিয়া বিবাহ দেন! আর দুই তিন বৎসর তিনি অনায়াসেই রাখিতে পারিবেন। তত দিনে আমার সব পাস গুলিও হইয়া যাইবে। তত দিনে আমি দু পয়সা আনিতেও শিখিব। আপনি এই মর্ম্মে তনু কাকাকে পত্র লিখুন।"

রামহরি তনু রায়কে সেইরূপ পত্র লিখিলেন। তনু রায় সে কথা স্বীকার করিলেন। বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার কিছু মাত্র দুঃখ হইল না, বরং তিনি আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি মনে করিলেন,—"স্ত্রীর কান্না-কাটিতে আপাততঃ এ কথা স্বীকার করিলাম। দেখিনা, খেতুর চেয়ে ভাল পাত্র পাই কি না? যদি পাই—। আচ্ছা, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে।"

খেতুর মা, নিরঞ্জনকে সকল কথা বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মনে করিলেন,—"বৃদ্ধ হইয়া তনু রায়ের ধর্ম্মে মতি হইতেছে।"

কঙ্কাবতী আজ কয় দিন বিরস-বদনে ছিলেন। সকলে আজ কঙ্কাবতীর হাসি-হাসি মুখ দেখিল। সেই দিন তিনি মেনীকে কোলে লইয়া বিরলে বসিয়া কত যে তাহাকে মনের কথা বলিলেন, তাহা আর কি বলিব! মেনী এখন আর শিশু নহে, বড় একটী

বিড়াল। সুতরাং কঙ্কাবতী যে তাহাকে মনের কথা বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

ষাঁড়েশ্বর

একবার পূজার ছুটির কিছু পূর্ব্বে, কলিকাতার পথে, খেতুর সহিত ষাঁড়েশ্বরের সাক্ষাৎ হইল।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"খেতু! বাড়ী যাইবে কবে? আমি গাড়ী ঠিক করিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর তো আমার গাড়ীতে তুমি যাইতে পার।"

খেতু উত্তর করিলেন,—"আমার এখনও স্কুলের ছুটী হয় নাই। কবে যাইব, তাহার এখনও ঠিক নাই।"

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খেতু! তোমার হাতে ও কি?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"এ একটী সিংহাসন। মা প্রতিদিন মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করেন, তাই, মা'র জন্য একটী পাথরের শিব কিনিয়াছি। সেই শিবের জন্য এই সিংহাসন।"

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিবটী তোমার কাছে আছে? কৈ দেখি?"

খেতু শিবটী পকেট হইতে বাহির করিয়া ষাঁড়েশ্বরের হাতে দিলেন।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"শিবটী পকেটে রাখিয়াছিলে? খুব ভক্তি তো তোমার?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"শিবের তো এখনও পূজা হয় নাই! তাতে আর দোষ কি?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"তাই বলিতেছি!"

এই কথা বলিয়া ষাঁড়েশ্বর শিবটী পুনরায় খেতুর হাতে দিলেন।

এ কথায় সে-কথায় যাইতে যাইতে, ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"এই যে, পাদ্‌রি সাহেবের বাড়ী! পাদ্‌রি সাহেবের সঙ্গে তোমার তো আলাপ আছে! এস না? একবার দেখা করিয়া যাই।"

ষাঁড়েশ্বর ও খেতু, দুইজনে পাদ্‌রি সাহেবের নিকট যাইলেন।

পাদ্‌রি সাহেবের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"আর শুনিয়াছেন, মহাশয়? মা পূজা করিবেন বলিয়া, খেতু একটী পাথরের শিব কিনিয়াছেন। সেই শিবটী খেতুর পকেটে রহিয়াছে।"

পাদ্‌রি সাহেব বলিলেন,—"অ্যাঁ! সে কি কথা! ছি ছি, খেতু! তুমি এমন কাজ করিবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমাদের জন্য যে আমরা এত স্কুল করিলাম, সে সব বৃথা হইল! এই বাঙ্গালীজাতি মিথ্যাবাদী, ফেরেবী, জালিয়াত, বদমায়েস, পাষণ্ড, নরাধম, দাস, দাসের বেটা দাস, দাসের নাতি দাস।"

খেতু বলিলেন,—"আহা! কি মধুর ধর্ম্মের কথা আজ শুনিলাম! সর্ব্ব শরীর শীতল হইয়া গেল। ইচ্ছা করে, এখনি খৃষ্টান হই। যদি ঘরে জল থাকে তো নিয়ে আসুন, আর বিলম্ব করেন কেন? আমার মাথায় দিন, দিয়া আমাকে খৃষ্টান

করুন। বাঙ্গালিদের উপর চারি দিক্ হইতে যেরূপ আপনারা সকলে মিলিয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন, তাতে বাঙ্গালিদের মন খৃষ্টীয় ধর্ম্মামৃত রসে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখেন কি আর? এই সব পট্ পট্ করিয়া খৃষ্টান হয় আর কি! আবার, আমেরিকায় কালা-খৃষ্টানদের উপর আপনাদের যেরূপ ভ্রাতৃভাব, তা যখন লোকে শুনিবে; আর, আফ্রিকার নিরস্ত্র কালা-আদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরূপ দয়া-মায়া, তা যখন লোকে জানিবে, তখন এ দেশের জনপ্রাণীও আর বাকি থাকিবে না, সব খৃষ্টান হইয়া যাইবে। এখন সেলাম!"

এই কথা বলিয়া খেতু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ষাঁড়েশ্বরও হাসিতে হাসিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

পথে খেতু ষাঁড়েশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুনিতে পাই; আপনি প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন। তবে পাদ্রি সাহেবের নিকট আমাকে ওরূপ উপহাস করিলেন কেন?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"উপহাস আর তোমাকে কি করিলাম? সে যাহা হউক, সন্ধ্যা হইয়াছে, আমার হরি-সঙ্কীর্ত্তনের সময় হইল। এস না, একটু দেখিবে? দেখিলেও পুণ্য আছে।"

ষাঁড়েশ্বরের বাসা নিকট ছিল। খেতু ও ষাঁড়েশ্বর, দুইজনে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খেতু দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের দালানে হরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু, ষাঁড়েশ্বর সেখানে না যাইয়া, বরাবর উপরের বৈঠক-খানায় যাইলেন। খেতুকে সেইখানে বসিতে বলিয়া ষাঁড়েশ্বর বাটীর ভিতর গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ষাঁড়েশ্বর ফিরিয়া আসিলেন ও খেতুকে বলিলেন,—"খেতু! চল, অন্য ঘরে যাই।"

খেতু অন্য ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের আর দুইটী বন্ধু সেখানে বসিয়া আছেন। সেখানে খানা খাইবার সব আয়োজন হইতেছে।

নীচে হরি-সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে। ষাঁড়েশ্বর হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু-সমাজের একজন চাঁই।

অল্পক্ষণ পরে খানা খাওয়া আরম্ভ হইল। দুইজন মুসলমান পরিবেষণ করিতে লাগিল।

খেতু বলিলেন,—"আপনারা তবে আহারাদি করুন, আমি এখন যাই।"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"না না, একটু থাক না, দেখ না, দেখিলেও পুণ্য আছে। এখন যা আমরা খাইতেছি, ইহা মাংসের ঝোল, ইহার নাম স্থপ্, একটু স্থপ্ খাইবে?"

খেতু বলিলেন,—"এ সব দ্রব্য আমি কখনও খাই নাই, আমার প্রবৃত্তি হয় না। আপনারা আহার করুন।"

আবার কিছু ক্ষণ পরে ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"খেতু! এখন যা খাইতেছি, ইহা ভেটকি মাছ। মাছ খাইতে দোষ কি? একটু খাও না?"

খেতু বলিলেন,—"মহাশয়! আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আপনারা আহার করুন। আমি বসিয়া থাকি।"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"তবে না হয়, এই একটু খাও। ইহা

অতি উত্তম ব্র্যাণ্ডি। পাদরি সাহেবের কথায় মনে তোমার ক্লেশ হইয়া থাকিবে, একটু খাইলেই এখনি সব ভাল হইয়া যাইবে।”

খেতু বলিলেন,—“মহাশয়! যোড়হাত করিয়া বলি, আমাকে অনুরোধ করিবেন না। অনুমতি করুন, আমি বাড়ী যাই।”

ষাঁড়েশ্বরের একটী বন্ধু বলিলেন,—“তবে না হয় একটু হ্যাম আর মুরগী খাও। এ হ্যাম—বিলাতি শূকরের মাংস। ইহা বিলাত হইতে আসিয়াছে। অভক্ষ্য গ্রাম্য শূকর। বিলাতি শূকর খাইতে কোনও দোষ নাই। আর এ মুরগীও মহা-কুক্কুট, রামপাকি বিশেষ। হগ্ সাহেবের বাজার হইতে কেনা, যে সে মুরগী নয়।”

ষাঁড়েশ্বরের অপর বন্ধু বলিলেন,—“এইবার ভি—র কটলেট আসিয়াছে। খেতু বাবু নিশ্চয় এইবার একটু খাইবেন।”

খানসামা এবার কি দ্রব্য আনিয়াছিল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। নীচে হরিসঙ্কীর্ত্তনের ধুম। তাহাই শ্রবণ করিয়া সকলে প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিন বন্ধুতে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তখন এক বন্ধু উঠিয়া গিয়া খেতুকে ধরিলেন, অপর জন খেতুর মুখে ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। ষাঁড়েশ্বর বসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খেতুর শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। এক এক ধাক্কায় দুই জনকেই ভূতলশায়ী করিলেন। তাহার পর মেজটী উলটিয়া ফেলিলেন। কাচের বাসন, কাচের গেলাস, সম্মুখে যাহা কিছু পাইলেন,

আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দক্ষযজ্ঞ করিয়া সেখান হইতে খেতু প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

বিড়ম্বনা

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর এক্ষণে কুড়ি বৎসর বয়স। স্কুলের যা কিছু পাস ছিল, খেতু সব পাসগুলি দিলেন। বাহিরেরও দুই একটী পাস দিলেন। শীঘ্র একটী উচ্চপদ পাইবেন, খেতু এরূপ আশা পাইলেন।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী ভাবিলেন যে, এক্ষণে খেতুর বিবাহ দিতে হইবে। দিনস্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহারা খেতুর মাকে পত্র লিখিলেন।

পত্রের প্রত্যুত্তরে খেতুর মা অন্যান্য কথা বলিয়া অবশেষে লিখিলেন,—"তনু রায়কে বিবাহের কথা কিছু বলিতে পারি নাই। আজ কাল সে বড়ই ব্যস্ত, তাহার দেখা পাওয়া ভার। জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইবে, এই কার্য্যে তনু রায় একজন কর্ত্তা হইয়াছেন। জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রীর ধন্য কপাল! পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে জাজ্জল্যমান রাখিয়া, অশীতিপর স্বামীর কোলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের পুণ্যবল আর কি হইতে পারে? যখন তাঁহাকে ঘাটে লইয়া যায়, তখন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলে এক মাথা সিঁদুর দিয়া দিয়াছে, আর ভাল একখানি কস্তাপেড়ে

শাড়ী পরাইয়া দিয়াছে। আহা! তখন কি শোভা হইয়াছিল! যাহা হউক, তনু রায়ের একটু অবসর হইলে, আমি তাহাকে বিবাহের কথা বলিব।”

কিছু দিন পরে খেতুর মা, রামহরিকে আর একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

“বড় ভয়ানক কথা শুনিতেছি। তনু রায়ের কথার ঠিক নাই। তাহার দয়া-মায়া নাই, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। শুনিতেছি, সে না-কি জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে। কি ভয়ানক কথা! আর জনার্দ্দন চৌধুরীও পাগল হইয়াছে না কি? পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে বর্ত্তমান! বয়সের গাছ পাথর নাই। চলিতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে। ঘাটের মড়া! তার আবার এ কুবুদ্ধি কেন? বিষয় থাকিলে, টাকা থাকিলে, এইরূপ করিতে হয় না-কি? তিনি বড়মানুষ, জমিদার, না হয় রাজা! তা বলিয়া কি একেবারে বিবেচনাশূন্য হইতে হয়? বৃদ্ধ কি মনে ভাবে না যে, মৃত্যু সন্নিকট? যেরূপ তাহার অবস্থা, তাহাতে আর কয় দিন? লাঠি না ধরিয়া একটী পা চলিতে পারে না। কি ভয়ানক কথা! আর তনু রায় কি নিকষা! দুধের বাছা কঙ্কাবতীকে কি করিয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিবে? কঙ্কাবতীর কপালে কি শেষে এই ছিল? কঙ্কাবতীর সেই মধুমাখা মুখখানি মনে করিলে, বুক ফাটিয়া যায়। শুনিতে পাই, কঙ্কাবতীর মা না কি রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন। আমি ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আসেন নাই। বলিয়া

পাঠাইলেন যে—'দিদির কাছে আর মুখ দেখাইব না, এ কালা মুখ লোকের কাছে আর বাহির করিব না।' এই বিবাহের কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আহা! তাঁহার মা'র প্রাণ! কতই না তিনি কাতর হইয়া থাকিবেন?"

এই চিঠিখানি পাইয়া রামহরি খেতুকে দেখাইলেন।

খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! আমি এই ক্ষণে দেশে যাইব।"

রামহরি বলিলেন,—"জনার্দ্দন চৌধুরী বড়লোক, তুমি সহায়হীন বালক, তুমি দেশে গিয়া কি করিবে?"

খেতু বলিলেন,—"আমি কিছু করিতে পারিব না সত্য। তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কঙ্কাবতীকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। কৃতকার্য্য না হই, কি করিব?"

খেতু দেশে আসিলেন। মা'র নিকট ও পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট সকল কথা শুনিলেন। শুনিলেন যে, জনার্দ্দন চৌধুরী প্রথমে কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। কেবল তাঁহার সভাপণ্ডিত গোবর্দ্ধন শিরোমণি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সম্মত করিয়াছেন।

বৃদ্ধ হইলে কি হয়? জনার্দ্দন চৌধুরীর শ্রী-ছাঁদ আছে, প্রাণে সখও আছে। দুর্ল ভ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মাল্য দ্বারা গলদেশ তাঁহার সর্ব্বদাই সুশোভিত থকে। কফের ধাতু বলিয়া শৈত্য-নিবারণের জন্য চুড়াদার টুপি তাঁহার মস্তকে দিন রাত্রি বিরাজ করে। এইরূপ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিভৃতে বসিয়া যখন

তিনি গোবৰ্দ্ধন শিরোমণির সহিত বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ করেন, তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণকেও লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়।

খেতু শুনিলেন যে, জনার্দ্দন চৌধুরী বিবাহ করিবার জন্য এখন একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। আর বিলম্ব সহে না। এই বৈশাখ মাসের ২৪শে তারিখে বিবাহ হইবে। জনার্দ্দন চৌধুবী এক্ষণে দিন গণিতেছেন। তাঁহার পুত্র কন্যা সকলের ইচ্ছা, যাহাতে এ বিবাহ না হয়। কিন্তু, কেহ কিছু বলিতে সাহস কবেন না। তাঁহার বড় কন্যা, এক দিন মুখ ফুটিয়া মানা করিয়াছিলেন। সেই অবধি, বড় কন্যার সহিত তাঁহার আর কথা-বার্ত্তা নাই।

জনার্দ্দন চৌধুরীকে কন্যা দিতে তনু রায়ও প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন, যে, "আমাব নববিবাহিতা স্ত্রীকে আমি দশ হাজাব টাকার কোম্পানির কাগজ দিব, একখানি তালুক দিব, স্ত্রীর গা সোনা দিয়া মুড়িব, আব কন্যার পিতাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিব।" তখন তনু রায আর লোভ সংবরণ কবিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতীর মুখ পানে চাহিয়া তবুও তনু রায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র, টাকার কথা শুনিয়া, একেবাবে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। বকিয়া ঝকিয়া পিতাকে তিনি সম্মত করিলেন। টাকার লোভে এক্ষণে পিতা পুত্র দুই জনেই উন্মত্ত হইয়াছেন।

তবুও তনু রায় স্ত্রীর নিকট নিজে এ কথা বলিতে সাহস

জনার্দ্দন ও গোবর্দ্ধন

অধিক বয়স হয় নাই

করেন নাই। তাঁহার পুত্র বলিলেন,—"তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি গিয়া মাকে বলিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পুত্র মা'র নিকট যাইলেন। মাকে বলিলেন,—"মা! জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। বাবা সব স্থির করিয়া আসিয়াছেন।"

মা'র মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল! মা বলিলেন,—"সে কি রে? ওরে সে কি কথা! ওরে জনার্দ্দন চৌধুরী যে তেকেলে বুড়ো! তার যে বয়সের গাছ পাথর নাই! তার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হবে কি-রে?"

পুত্র উত্তর করিলেন,—"বুড়ো নয় তো কি যুবো? না সে খোকা? জনার্দ্দন চৌধুরী তুলো করিয়া দুধ খায় না-কি? না ঝুমঝুমি নিয়া খেলা করে? মা যেন ঠিক পাগল! মা'র বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে নাই। কঙ্কাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গায়ে যেখানে যা ধরে গহনা দিবে, তালুক মুলুক দিবে, বাবাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিবে, আবার চাই কি? বুড়ো মরিয়া যাইলে কঙ্কাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে। থুড়-থুড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আহ্লাদের কথা। শক্তি সামর্থ্য থাকিলে এখন কত দিন বাঁচিত তার ঠিক কি? মা! তোমার কিছু মাত্র বিবেচনা নাই।"

এ কথার উপর আর কথা নাই। মা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। অবিরল ধারায় তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন যে, "হে পৃথিবি! তুমি দুই ফাঁক হও যে, তোমার ভিতর আমি প্রবেশ করি।" মেয়ে দুইটীও অনেক কাঁদিলেন; কিন্তু

কিছুতেই কিছু হইল না। কঙ্কাবতী নীরব। প্রাণ যাহার ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে, চক্ষে তাহার জল কোথা হইতে আসিবে?

মা ও প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে, খেতু এই সকল কথা শুনিলেন।

খেতু প্রথম তনু রায়ের নিকট যাইলেন। তনু রায়কে অনেক বুঝাইলেন। খেতু বলিলেন,—"মহাশয়! এরূপ অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন না। আমার সহিত বিবাহ না হয় না দিবেন, কিন্তু একটী সুপাত্রের হাতে দিন। মহাশয় যদি সুপাত্রের অনুসন্ধান কবিতে না পারেন, আমি করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া তনু রায় ও তনু রায়ের পুত্র, খেতুর উপর অতিশয় বাগান্বিত হইলেন। নানারূপ ভৎর্সনা করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া, খেতু তাহার পর জনার্দ্দন চৌধুরীর নিকট গমন করিলেন। হাত যোড় করিয়া, অতি বিনীতভাবে, জনার্দ্দন চৌধুরীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমতঃ জনার্দ্দন চৌধুরী সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর খেতু যখন তাঁহাকে দুই একবার বৃদ্ধ বলিলেন, তখন রাগে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শ্লেষ্মার ধাতু, রাগে এমনি তাঁহার ভয়ানক কাসি আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সকলে বোধ করিল দম আটকাইয়া তিনি বা মরিয়া যান!

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—"গলাধাক্কা দিয়া এ ছোঁড়াকে আমার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও।"

অনুমতি পাইয়া পারিষদগণ খেতুর গলাধাক্কা দিতে আসিল।

খেতু, জনার্দ্দন চৌধুরীর লাঠি গাছটী তুলিয়া লইলেন। পারিষদবর্গকে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—"তোমরা কেহ আমার গায়ে হাত দিও না। যদি আমার গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব।"

খেতুর তখন সেই রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সকলেই আকুল হইল। গলাধাক্কা দিতে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

নিরঞ্জন উঠিয়া, উভয় পক্ষকে সান্ত্বনা করিয়া, খেতুকে সেখান হইতে বিদায় করিলেন।

খেতু চলিয়া গেলেন। তবুও জনার্দ্দন চৌধুরীর রাগও থামে না, কাসিও থামে না। রাগে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, খক্ খক্ করিয়া ঘন ঘন কাসি আসিতে লাগিল।

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—"ছোঁড়ার কি আস্পর্দ্ধা! আমাকে কি না বুড়ো বলে!"

গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"না না! আপনি বৃদ্ধ কেন হইবেন? আপনাকে যে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।"

ষাঁড়েশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"হয় তো ছোকরা মদ খাইয়া আসিয়াছিল! চক্ষু দুইটা যেন ঠিক জবা ফুলের মত, দেখিতে পান নাই?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"ও কথা বলিও না! যারা মদ খায়, তারা খায়। কে মদ-মুরগী খায়, তা সকলেই জানে। পরের নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না।"

ষাঁড়েশ্বর উত্তর করিলেন,—"সকলে শুনিয়া থাকুন, ইনি বলিলেন,—যে, 'আমি মদ-মুর্‌গী খাই।' আমি ইহাঁর নামে মানহানির মকদ্দমা করিব। এঁর হাড় কয়খানা জেলে পচাইব।"

গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"ক্ষেত্রচন্দ্র মদ খান, কি না খান, তাহা আমি জানিনা। তবে তিনি যে যবনের জল খান, তাহা জানি! সেই যারে বলে 'বরখ', সাহেবেরা কলে যাহা প্রস্তুত করেন, ক্ষেত্রচন্দ্র সেই বরখ খান। গদাধর ঘোষ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।"

জনার্দ্দন চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি? কি বলিলে?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ! বরফ খায়? গোরক্ত দিয়া সাহেবেরা যাহা প্রস্তুত করেন? এবার দেখিতেছি, সকলের ধর্ম্মটী একেবারে লোপ হইল। হায় হায়! পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লোপ হইল।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"ষাঁড়েশ্বর বাবু! একবার মনে করিয়া দেখ, খেতুর বাপ তোমার কত উপকার করিয়াছেন। খেতুর অপকার করিতে চেষ্টা করিও না।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"ও সব বাজে কথা এখন তোমরা রাখ। গদাধর ঘোষকে ডাকিতে পাঠাও।"

গদাধর ঘোষকে ডাকিতে লোক দৌড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

গদাধর-সংবাদ

গদাধর ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশয়কে কৃতাঞ্জলি-পুটে নমস্কার করিয়া অতি দূরে সে মাটীতে বসিল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"কেমন হে গদাধর! এ কি কথা শুনিতে পাই? শিবচন্দ্রের ছেলেটা, ঐ খেতা, কি খাইয়াছিল? তুমি কি দেখিয়াছিলে? কি শুনিয়াছিলে? তাহার সহিত তোমার কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল? সমুদয় বল, কোনও বিষয় গোপন করিও না।"

গদাধর বলিল,—"মহাশয়! আমি মূর্খ মানুষ। অত শত জানি না। যাহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি।"

গদাধর বলিল,—"আর বৎসর আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কোথায় থাকি? তাই রামহরির বাসায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় এক মিন্‌সে হাঁড়ি মাথায় করিয়া পথ দিয়া কি শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া রামহরি বাবুর ছেলেটী বাটীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, আর খেতুকে বলিল,—'কাকা, কাকা! কুলকী যাইতেছে, আমাকে কিনিয়া দাও।' খেতু তাহাকে দুই পয়সার কিনিয়া দিলেন। তাহার পর খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'গদাধর! তুমি একটা কুলকী খাইবে।' আমি বলিলাম, 'না দাদাঠাকুর! আমি কুলকী খাই না।' রামহরি বাবুর ছেলে খেতুকে বলিল,—'কাকা! তুমি খাইবে না?' খেতু বলিল 'না, আমার পিপাসা পাইয়াছে, ইহাতে পিপাসা ভাঙ্গে না, আমি কাঁচা বরপ খাইব।' এই কথা বলিয়া খেতু বাহিরে যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী সাদা ধব্‌ধবে কাঁচের মত ঢিল গামছায় বাঁধিয়া বাটী আনিলেন। সেই ঢিলটী ভাঙ্গিয়া জলে দিলেন, সেই জল খাইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দাদাঠাকুর! ও কি?' খেতু বলিলেন,—'ইহার নাম বরখ। এই গ্রীষ্ম কালের দিনে যখন বড় পিপাসা হয়, তখন ইহা জলে দিলে জল শীতল হয়।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাদাঠাকুর! সকল কাঁচ কি জলে দিলে, জল শীতল হয়?' খেতু উত্তর করিলেন,—'এ কাঁচ নয় এ বরখ। জল জমিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জল। নদীতে যে জল দেখিতে পাও, ইহাও তাই, জমিয়া গিয়াছে এই মাত্র। আকাশ হইতে যে শিল পড়ে, বরখ তাহাই; সাহেবেরা বরখ কলে প্রস্তুত করেন। একটু হাতে করিয়া দেখ দেখি?' এই বলিয়া আমার হাতে একটু খানি দিলেন। হাতে রাখিতে না রাখিতে আমার হাত যেন করাত দিয়া কাটিতে লাগিল। আমি হাতে রাখিতে পারিলাম না, আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর খেতু বলিলেন,—'গদাধর! একটু খাইয়া দেখ না? ইহাতে কোনও দোষ নাই।' আমি বলিলাম,—'না দাদা ঠাকুর! তোমরা ইংরেজি পড়িয়াছ, তোমাদের সব খাইতে আছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না।

আমি ইংরেজি পড়ি নাই। সাহেবেরা যে দ্রব্য কলে প্রস্তুত করেন সে দ্রব্য খাইলে আমাদের অধর্ম্ম হয়, আমাদের জাতি যায়।"

চৌধুরী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিলাম। তার পর খেতু আমাকে অনেক সেকালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক সেকালের কথা-বার্ত্তা হইল, সে বিষয় এখানে আর বলিবার আবশ্যক নাই।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, কি কথা হইয়াছিল, তুমি সমুদয় বল। কোনও কথা গোপন করিবে না।"

গোবর্দ্ধন শিরোমণিকে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল,—"শিরোমণি মহাশয়! সেই গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"সে বাজে কথা। সে কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, খেতার সহিত তোমার কি কথা হইয়াছিল, আমি সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা আমি অল্প অল্প শুনিয়াছিলাম, গ্রামের সকলেই সে কথা জানে। তবে খেতা তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, আর তুমি কি বলিলে, সে কথা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

গদাধর বলিতেছে,—"তাহার পর খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! আমাদের মাঠে সে কালে না-কি মানুষ মারা

হইত? আর তুমি না-কি সেই কাজের একজন সর্দ্দার ছিলে?' আমি উত্তর করিলাম,—'দাদাঠাকুর! উচক্কা বয়সে কোথায় কি করিয়াছি, কি না-করিয়াছি, সে কথায় এখন আর কাজ কি? এখন তো আর সে সব নাই? এখন কোম্পানির কড়া হুকুম।' খেতু বলিলেন,—'তা বটে! তবে সে কালের ঠেঙাড়েদের কথা আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়। তুমি নিজে হাতে এসব করিয়াছ, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমরা দুই চারি জন যা বৃদ্ধ আছ, মরিয়া গেলে, আর এসব কথা শুনিতে পাইব না। আর দেখ, গ্রামের সকলেই তো জানে? যে, তুমি এ কাজের এক জন সর্দ্দার ছিলে!' আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর! আপনারা থাকিতে আমরা কি কোনও কাজের সর্দ্দার হইতে পারি? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমাদের দেবতা! সকল কাজের সর্দ্দার আপনারা।' তাহার পর খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে তোমাদের দলের সর্দ্দার কে ছিলেন? আমি বলিলাম,—'আজ্ঞা! আমাদের দলের সর্দ্দার ছিলেন কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এক সঙ্গে কাজ করিতাম বলিয়া তাঁহাকে আমরা কমল, কমল, বলিয়া ডাকিতাম। তিনি এক্ষণে মরিয়া গিয়াছেন।' খেতু তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! তোমরা কখনও ব্রাহ্মণ মারিয়াছ?' আমি বলিলাম,—'আজ্ঞা! মাঠের মাঝ খানে যারে পাইতাম, তাহাকেই মারিতাম। তাহাতে কোনও দোষ নাই। পরিচয় লইয়া মাথায় লাঠি মারিতে গেলে আর কাজ চলে না। পথিকের কাছে কি আছে না আছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও

মারিতে গেলে চলে না। প্রথমেই মারিয়া ফেলিতে হইত। তাহার পর গলায় পৈতা থাকিলে জানিতে পারিতাম যে, সে লোকটী ব্রাহ্মণ, না থাকিলে বুঝিতাম যে, সে শূদ্র। আর প্রাপ্তির বিষয়, যে দিন যেরূপ অদৃষ্টে থাকিত সেই দিন সেইরূপ হইত। কত হতভাগা পথিককে মারিয়া শেষে একটী পয়সাও পাই নাই। ট্যাকে, কাচায়, কোঁচায় খুঁজিয়া একটী পয়সাও বাহির হয় নাই। সে বেটারা জুয়াচোর, দুষ্ট, বজ্জাত! পথ চলিবে বাপু, টাকা কড়ি সঙ্গে নিয়া চল। তা না শুধু হাতে! বেটাদের কি অন্যায় বলুন দেখি, দাদাঠাকুর? একটী মানুষ মারিতে কি কম পরিশ্রম হয়? খালি হাতে রাস্তা চলিয়া আমাদের সব পরিশ্রম বেটারা নষ্ট করিত।' খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁ, গদাধর! মানুষের প্রাণ কি সহজে বাহির হয় না?' আমি বলিলাম,—'সকলের প্রাণ সমান নয়। কেহ বা লাঠি খাইতে না খাইতে উদ্দেশে মরিয়া যায়। কেহ বা ঠুশ করিয়া এক ঘা খাইয়াই মরিয়া যায়। আর কাহাকেও বা তিন চারি জনে পড়িয়া পঞ্চাশ ঘা লাঠিতেও মারিতে পারা যায় না। একবার একজন ব্রাহ্মণকে মারিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।' খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছিল'?"

এবার গোবর্দ্ধন শিরোমণির পানে চাহিয়া গদাধর বলিল,—"শিরোমণি মহাশয়! সেই কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়! আপনার আর ও সব পাপ কথা শুনিয়া কাজ নাই। এক্ষণে ক্ষেত্রচন্দ্রকে লইয়া কি করা

যায়, আসুন, তাহার বিচার করি। সাহেবের জল পান করিয়া অবশ্যই তিনি সাহেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই!”

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—“না না! খেতার সহিত গদাধরের কি কি কথা হইয়াছিল, আমি সমস্ত শুনিতে চাই। ছোঁড়া যে গদাধরকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অবশ্যই কোনও না কোনও দুরভিসন্ধি থাকিবে। গদাধর! তাহার পর কি হইল, বল।”

গদাধর পুনরায় বলিতেছে,—“খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, ‘ব্রাহ্মণ মারিতে কষ্ট হইয়াছিল কেন?’ আমি বলিলাম,—‘দাদা ঠাকুর! কোথা হইতে একবার তিন জন ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামে গরদের কাপড় বেচিতে আসেন। গ্রামে তাঁহারা থাকিবাব স্থান পাইতেছিলেন না। বাসার অন্বেষণে পথে পথে ফিরিতে ছিলেন। আমার সঙ্গে পথে দেখা হইল। একটী পাতা হাতে করিয়া আমি তখন ব্রাহ্মণের পদধূলি আনিতে যাইতে ছিলাম। প্রত্যহ ব্রাহ্মণের পদধূলি না খাইয়া আমি কখনও জলগ্রহণ কবি না। ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমি সেই পাতায় তাঁহাদের পদধূলি লইলাম, আর বলিলাম,—‘আসুন, আমার বাড়ীতে আপনাদিগকে বাসা দিব।’ তাঁহারা আমার বাড়ীতে বাসা লইলেন। আমাদের গ্রামে তিন দিন রহিলেন, অনেক গুলি কাপড় বেচিলেন, অনেক টাকা পাইলেন। আমি সেই সন্ধান কমলেকে দিলাম। কমলতে আমাতে পরামর্শ করিলাম যে, ‘তিনটীকে সাবাড় করিতে হইবে।’ দলস্থ অন্য কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ তাহা হইলে ভাগ

দিতে হইবে। কমলকে বলিলাম,—'তুমি আগে গিয়া মাঠের মাঝ খানে লুকাইয়া থাকে! অতি প্রত্যূষে ইঁহাদিগকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। দুই জনেই সেই খানে কার্য্য সমাধা করিব।' তাহার পর দিন প্রত্যূষে আমি সেই তিন জন ব্রাহ্মণকে পথ দেখাইবার জন্য লইয়া চলিলাম। ভগবানের এমনি কৃপা যে, সে দিন ঘোর কোয়াসা হইয়াছিল, কোলের মানুষ দেখা যায় না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র কমল বাহির হইয়া এক জনের মাথায় লাঠি মারিলেন, আমিও সেই সময় আর এক জনের মাথায় লাঠি মারিলাম। তাঁরা, দুই জনেই পড়িয়া গেলেন। আমরা সেই দুই জনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটী পলাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন আমিও আমার কাজটী সমাধা করিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ, গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে গিয়া,—'ব্রহ্মহত্যা হয়! ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করুন,—' এই বলিয়া আশ্রয় লইলেন। অতি স্নেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন,—'জীবন ক্ষণভঙ্গুর। পদ্ম-পত্রের উপর জলের ন্যায়। সে জীবনের জন্য এত কাতর কেন বাপু?' এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া, বাটীর বাহিরে দিয়া, শিরোমণি মহাশয় ঝমাৎ করিয়া বাটীর দ্বারটী বন্ধ করিয়া দিলেন! কমল পুনরায় ব্রাহ্মণকে মাঠের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন যে, আর রক্ষা নাই, কমল তাঁহাকে ধর্ ধর

হইয়াছেন, তখন তিনি হঠাৎ ফিরিয়া কমলকে ধরিলেন। কিছু ক্ষণের নিমিত্ত দুই জনে হুটা-হুটি হইল। কমলের শরীরে হাতীব মত বল, কমলকে তিনি পারিবেন কেন? কমল তাঁহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার বুকের উপব চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার নাভি কুণ্ডলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বসাইয়া তাঁহাকে মাবিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ-দেবতাব এমনি কঠিন প্রাণ যে, তিনি অজ্ঞানও হন না, মরেনও না। ক্রমাগত কেবল এই বলিয়া চীৎকাব করিতে লাগিলেন,—'হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর। হে মধুসূদন! আমাকে বক্ষা কর। বাপ সকল! ব্রহ্মহত্যা হয়! কে কোথা আছ, আসিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।' আমি পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। কোন দিকে ব্রাহ্মণ পলাইয়াছেন, আর কমল বা কোন্ দিকে গিয়াছেন, কোয়াসার জন্য তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। এখন ব্রাহ্মণেব চীৎকার শুনিয়া আমি সেই দিকে দৌড়িলাম। গিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন, কমল তাঁহার বুকের উপরে, কমল আপনার দুই হাত দিয়া ব্রাহ্মণের দুটী হাত ধরিয়া মাটীতে চাপিয়া রাখিয়াছেন, কমলের বাম পা মাটীতে রহিয়াছে, দক্ষিণ পা ব্রাহ্মণের উদরে, এই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ঘোরতর বলেব সহিত ব্রাহ্মণের নাভির ভিতর প্রবেশ করাইতেছেন। পড়িয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতেছেন। কমল আমাকে বলিলেন,— 'এ বামুন বেটা কি বজ্জাত! বেটা যে মরে না হে! গদাধর! শীঘ্র একটা যা হয় কর। তা না হইলে বেটার চীৎকারে লোক

আসিয়া পড়িবে।' আমার হাতে তখন লাঠি ছিল না। নিকটে এক খান পাথর পড়িয়া ছিল। সেই পাথর খানি লইয়া আমি ব্রাহ্মণের মাথাটী ছেঁচিয়া দিলাম। তবে ব্রাহ্মণের প্রাণ বাহির হইল। যাহা হউক, এই ব্রাহ্মণকে মারিতে পরিশ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেবার লাভও বিলক্ষণ হইয়াছিল। অনেক গুলি টাকা আর অনেক গরদের কাপড় আমরা পাইয়াছিলাম। কি করিয়া নশিরাম সর্দ্দার এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। নশিরাম ভাগ চাহিলেন। আমরা বলিলাম,—'এ কাজে তোমাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন?' কথায় কথায় কমলের সহিত নশিরামের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, ক্রমে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পৈতা ছিঁড়িয়া নশিরামকে শাপ দিলেন। কমল, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ! সাক্ষাৎ অগ্নি স্বরূপ! শিষ্য যজমান আছে। সেরূপ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া, নশিরাম মরিয়া গেল। যাহা হউক, সেই সব কাপড় হইতে এক জোড়া ভাল গরদের কাপড় আমরা শিরোমণি মহাশয়কে দিয়াছিলাম। যখন সেই গরদের কাপড় খানি পরিয়া, দোবজাটী কাঁধে ফেলিয়া, ফোঁটাটী কাটিয়া, শিরোমণি মহাশয় পথে যাইতেন, তখন সকলে বলিত,—'আহা! যেন কন্দর্প পুরুষ বাহির হইয়াছেন!' বয়সকালে শিরোমণি মহাশয়ের রূপ দেখে কে? না, শিরোমণি মহাশয়?"

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"গদাধর! তোমার এরূপ বাক্য

বলা উচিত নয়। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার আমি কিছুই জানি না। পীড়া-পীড়ায় তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। আমি তোমার জন্য নারায়ণকে তুলসী দিব। তাহা হইলে তোমার পাপক্ষয় হইবে।"

নিরঞ্জন এই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন,—"হা মধুসূদন! হা দীনবন্ধু।"

জনার্দ্দন চৌধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন —"তাহার পর কি হইল, গদাধর?"

গদাধর উত্তর করিলেন,—"তাহার পর আর কিছু হয় নাই। খেতু, অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একটু বরখ খাবে গদাধর?' আমি বলিলাম, —'না দাদাঠাকুর। আমি বরখ খাইব না, বরখ খাইলে আমার অধর্ম্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে'।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"তবে তুমি নিশ্চয় বলিতেছ যে, খেতু বরফ খাইয়াছে?"

গদাধর উত্তর করিল,—"আজ্ঞা হাঁ, ধর্ম্মাবতার! আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ! আপনার পায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিতে পারি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

বিকার

গদাধরের মুখে সকল কথা শুনিয়া, জনার্দ্দন চৌধুরী তখন তনু রায় প্রভৃতি গ্রামের ভদ্র লোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"আজ আমি ঘোর সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম। জাতি-কুল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সব লোপ হইতে বসিল। পিতা পিতামহদিগকে যে এক গণ্ডুষ জল দিব, তাহারও উপায় রহিল না। ঘোর কলি উপস্থিত।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে, মহাশয়?"

জনার্দ্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন,—"শিবচন্দ্রের পুত্র ঐ যে খেতা, যে কলিকাতায় রামহরির বাসায় থাকিয়া ইংরেজি পড়ে, সে বরফ খায়। বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল। শিরোমণি মহাশয় বিধান দিয়াছেন যে, বরফ খাইলে সাহেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সাহেবত্ব-প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলে সেও সাহেব হইয়া যায়। তাই, এই খেতার সহিত সংস্রব রাখিয়া সকলেই আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া দেশ শুদ্ধ লোক একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ! বরফ খায়? যাঃ, এইবার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গেল!

সর্ব্বের চেয়ে কিন্তু ভাবনা হইল ষাঁড়েশ্বরের। ডাক ছাড়িয়া তিনি কাঁদেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মগত প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। কত যে তিনি "হায়, হায়!" করিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব!

যাহা হউক, সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া খেতুকে 'একঘোরে' করা স্থির হইল।

নিরঞ্জন কেবল ঐ কথায় সায় দিলেন না। নিরঞ্জন বলিলেন,—"আমি থাকিতে খেতুকে কেহ একঘোরে করিতে পারিবে না। আমরা না হয় দু'ঘোরে হইয়া থাকিব।"

নিরঞ্জন আরও বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়! আজ প্রাতঃকাল হইতে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতেছি যে, ঘোর কলি উপস্থিত। নিদারুণ নর-হত্যা ব্রহ্ম-হত্যার কথা শুনিলাম। চৌধুরী মহাশয়! আপনি প্রাচীন, বিজ্ঞ, লক্ষ্মীর বরপুত্র; বিধাতা আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন। এ কুচক্র আপনাকে শোভা পায় না! লোককে জাতিচ্যুত করায় কিছু মাত্র পৌরুষ নাই, পতিতকে উদ্ধার করাই মনুষ্যের কার্য্য। বিষ্ণু ভগবান্ পতিতকে উদ্ধার করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'পতিত-পাবন' হইয়াছে। পৃথিবীতে সজ্জনকুল সেই পতিত-পাবনের প্রতিরূপ। এই ষাঁড়েশ্বরের মত সুরাপানে আর অভক্ষ্য-ভক্ষণে যাহারা উন্মত্ত, এই তনু রায়ের মত যাহাদিগের অপত্য-বিক্রয়-জনিত শুল্ক গ্রহণে মানস কলুষিত, এই গোবর্দ্ধনের মত যাহারা ব্রহ্মহত্যা-মহাপাতকে পতিত, সেই গলিত নরক-কীটেরা ধর্ম্মের মর্ম্ম কি জানিবে?"

এই বলিয়া নিরঞ্জন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জন চলিয়া যাইলে গোবৰ্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে ইনি গালি দিলেন। ষাঁড়েশ্বর বাবাজী বীর পুরুষ। ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে অপমান করিয়া এ গ্রামে আবার কে বাস করিতে পারে?"

খেতু যে একঘোরে হইয়াছেন,—নিয়মিতরূপে লোককে সেইটী দেখাইবার নিমিত্ত, স্ত্রীর মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জনার্দ্দন চৌধুরী সপ্তগ্রাম সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, কুসুমঘাটী নিবাসী শিবচন্দ্রের পুত্র, ক্ষেত্র, "বরপ" খাইয়া কৃস্তান হইয়াছে।

সেই দিন রাত্রিতে ষাঁড়েশ্বর চারি বোতল মহুয়ার মদ আনিলেন। তারীফ শেখের বাড়ী হইতে চুপি চুপি মুরগী রাঁধাইয়া আনিলেন। পাঁচ ইয়ার জুটিয়া পরম সুখে পান ভোজন হইল। একবার কেবল এই সুখে ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। খাইতে খাইতে ষাঁড়েশ্বরের মনে উদয় হইল যে, তারীফ শেখ হয়-তো মুরগীর সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়াছে! তাই তিনি হাত তুলিয়া লইলেন, আর বলিলেন,—"আমার খাওয়া হইল না। বরফ মিশ্রিত মুরগী খাইয়া শেষে কি জাতিটী হারাইব?" সকলে অনেক বুঝাইলেন যে, মুরগী বরফ দিয়া রান্না হয় নাই। তবে তিনি পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পান ভোজনের পর নিরঞ্জনের বাটীতে সকলে গিয়া ঢিল ও গোহাড় ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে নিরঞ্জনের বাটীতে ঢিল

ও গোহাড় পড়িতে লাগিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া, নিরঞ্জন ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পৈত্রিক বাস্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।

খেতু বলিলেন,—"কাকা মহাশয়! আপনি চলুন। আমিও এ গ্রাম হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইব।"

খেতুর মা'র নিকট যে ঝি ছিল, সে ঝিটী ছাড়িয়া গেল। সে বলিল,—"মা ঠাকুরাণী! আমি আর তোমার কাছে কি করিয়া থাকি? পাঁচজনে তাহা হইলে আমার হাতে জল খাইবে না।"

আরও নানা বিষয়ে খেতুর মা উৎপীড়িত হইলেন। খেতুর মা ঘাটে স্নান করিতে যাইলে, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দূরে দূরে থাকেন, পাছে খেতুর মা তাঁহাদিগকে ছুঁইয়া ফেলেন।

যে কমল ভট্টাচার্য্যের কথা গদাধর ঘোষ বলিয়াছিলেন, এক দিন সেই কমলের বিধবা স্ত্রী মুখ ফুটিয়া খেতুর মাকে বলিলেন,—"বাছা! নিজে সাবধান হইতে জানিলে, কেহ আর কিছু বলে না। বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না। তোমার ছেলে বরখ খাইয়াছে, তোমাদের এখন জাতিটী গিয়াছে। তা বলিয়া আমাদের সকলের জাতিটী মার কেন? আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ কর কেন? তা তোমার, বাছা, দেখিতেছি, এ ঘাটটী না হইলে আর চলে না। সেদিন, মেটে কলসীটী যেই কাঁকে করিয়া উঠিয়াছি, আর তোমার গায়ের জলের ছিটা আমার গায়ে লাগিল, তিন পয়সার কলসীটী আমাকে ফেলিয়া দিতে হইল। আমাকে পুনরায়

স্নান করিতে হইল। আমরা তোমার, বাছা, কি করিয়াছি? যে, তুমি আমাদের সঙ্গে এত লাগিয়াছ?"

খেতুর মা কোনও উত্তর দিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! কাঁদিও না। এখানে আর আমরা অধিক দিন থাকিব না। এ গ্রাম হইতে আমরা উঠিয়া যাইব।"

খেতুর মা বলিলেন,—"বাছা! অভাগীরা যাহা কিছু বলে, তাহাতে আমি দুঃখ করি না। কিন্তু তোমার মুখপানে চাহিয়া রাত্রি দিন আমার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। তোমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। একদণ্ড তুমি সুস্থির নও। শরীর তোমার শীর্ণ, মুখ তোমার মলিন। খেতু! আমার মুখপানে চাহিয়া একটু সুস্থির হও, বাছা!"

খেতু বলিলেন,—"মা! আর সাত দিন! আজ মাসের হইল ১৭ তারিখ। ২৪ শে তারিখে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। সেই দিন আশাটী আমার সমূলে নির্ম্মূল হইবে। সেই দিন আমরা জন্মের মত এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব।"

খেতুর মা বলিলেন,—"দাসেদের মেয়ের কাছে শুনিলাম যে, কঙ্কাবতীকে আর চেনা যায় না। সে রূপ নাই, সে রং নাই সে হাসি নাই। আহা! তবুও বাছা মা'র দুঃখে কাতর। আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়া, বাছা আমার মা'র দুঃখে দুঃখী। কঙ্কাবতীর মা রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন, আর কঙ্কাবতী মাকে বুঝাইতেছেন।

"শুনিলাম, সে দিন কঙ্কাবতী মাকে বলিয়াছেন যে, "মা! তুমি কাঁদিও না। আমার এই কয় খানা হাড় বেচিয়া বাবা যদি টাকা পান, তাতে দুঃখ কি, মা? এরূপ কত হাড় শশ্মান ঘাটে পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য কেহ একটী পয়সাও দেয় না। আমার এই হাড ক-খানার যদি এত মূল্য হয়, বাপ ভাই সেই টাকা পাইয়া যদি সুখী হন, তার জন্য আর আমরা দুঃখ কেন করি, মা? তবে মা! আমি বড় দুর্ব্বল হইয়াছি, শরীরে আমার সুখ নাই। পাছে এই কয় দিনের মধ্যে আমি মরিয়া যাই, সেই ভয় হয়। টাকা না পাইতে পাইতে মরিয়া গেলে, বাবা আমার উপর বড বাগ করিবেন। আমি তো ছাই হইয়া যাইব, কিন্তু আমাকে তিনি যখনি মনে করিবেন, আর তখনি কত গাল দিবেন'।"

খেতুর মা পুনরায় বলিলেন,—"খেতু! কঙ্কাবতীর কথা যা আমি শুনি, তা তোমাকে বলি না, পাছে তুমি অধৈর্য্য হইয়া পড়। কঙ্কাবতীর যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, কঙ্কাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।"

খেতু বলিলেন,—"মা! আমি তনু রায়কে বলিলাম যে, 'রায় মহাশয়! আপনাকে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিতে হইবে না, একটি সুপাত্রের সহিত দিন। রামহরি দাদা ও আমি, ধনাঢ্য সুপাত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিব।" কিন্তু মা! তনু রায় আমার কথা শুনিলেন না, অনেক গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমাদের কি মা? আমরা অন্য গ্রামে গিয়া

বাস করিব। কিন্তু কঙ্কাবতী যে এখানে চিরদুঃখিনী হইয়া রহিল, সেই মা দুঃখ। আমি এমন কাপুরুষ যে, তাহার কোনও উপায় করিতে পারিলাম না, সেই মা দুঃখ। আর, মা, যদি কঙ্কাবতীর বিষয়ে কোনও কথা শুনিতে পাও, তো আমাকে বলিও। আমার নিকট কোনও কথা গোপন করিও না। আহা! সীতাকে এ সময়ে কলিকাতায় কেন পাঠাইয়া দিলাম! সীতা যদি এখানে থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিনের সঠিক সংবাদ পাইতাম।"

খেতুর মা, তার পর দিন খেতুকে বলিলেন,—"আজ শুনিলাম, কঙ্কাবতীর বড় জ্বর হইয়াছে। আহা! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছার যে জ্বর হইবে, সে আর বিচিত্র কথা কি ? বাছার এখন প্রাণ রক্ষা হইলে হয়। জনার্দ্দন চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইয়াছেন, আর বলিয়া দিয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, চারি দিনের মধ্যে কঙ্কাবতীকে ভাল করিতে হইবে।"

খেতু বলিলেন,—"তাই-তো মা! এখন কঙ্কাবতীর প্রাণ-টা রক্ষা হইলে হয়। মা! কঙ্কাবতীর বিড়াল আসিলে এ কয় দিন তাহাকে ভাল করিয়া দুধ মাছ খাইতে দিবে। হাঁ মা! আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইলে, কঙ্কাবতীর বিড়াল কি আমাদের বাড়ীতে আর আসিবে ? না, বড়মানুষের বাড়ীতে গিয়া আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে ?"

খেতুর মা কোনও উত্তর দিলেন না, আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

তাহার পর দিন খেতুর মা জানিয়া আসিলেন যে, কঙ্কাবতীর জ্বর কিছু মাত্র কমে নাই। কঙ্কাবতী অজ্ঞান অভিভূত।

এইরূপে দিন দিন কঙ্কাবতীর পীড়া বাড়িতে লাগিল, কিছুই কমিল না। সাত দিন হইল। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল।

সে দিন কঙ্কাবতীর গায়ের বড় জ্বালা, কঙ্কাবতীর বড় পিপাসা। কঙ্কাবতী একেবারে শয্যা-ধরা। কঙ্কাবতীর সমূহ রোগ। কঙ্কাবতীর ঘোর বিকার। কঙ্কাবতীর জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই। কঙ্কাবতী লোক চিনিতে পারেন না। কঙ্কাবতী এখন যান, তখন যান্।

* * *

* * *

* * *

দ্বিতীয় ভাগ

—০:৺:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:০:—
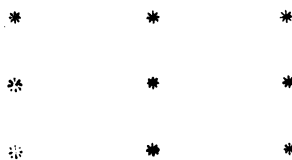
নৌকা

বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা!

কঙ্কাবতী মনে মনে করিলেন ;—

"যাই, নদীর ঘাটে যাই, সেই খানে বসিয়া এক পেট জল খাই, আর গায়ে জল মাখি, তাহা হইলে শান্তি পাইব।"

নদীর ঘাটে বসিয়া কঙ্কাবতী জল মাখিতেছেন, এমন সময় কে বলিল,—"কে ও, কঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই। কে এ কথা বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দূরে

কেবল একটী কাতলা মাছ ভাসিতেছে, আর ডুবিতেছে, তাহাই দেখিতে পাইলেন।

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে ও, কঙ্কাবতী ?"

কঙ্কাবতী এইবার উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো আমি কঙ্কাবতী।"

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি বড় গায়ের জ্বালা, তোমার কি বড় পিপাসা ?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো, আমার বড় গায়ের জ্বালা, আমার বড় পিপাসা।"

কে আবার বলিল,—"তবে তুমি এক কাজ কর না কেন ? নদীর মাঝখানে চল না কেন ? নদীর ভিতর অতি সুশীতল ঘর আছে, সেখানে যাইলে তোমার পিপাসার শান্তি হইবে, তোমার শরীর জুড়াইবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"নদীর মাঝখান যে গা অনেক দূর। সেখানে আমি কি করিয়া যাইব ?"

সে বলিল,—"কেন ? ঐ যে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে ? ঐ নৌকার উপর বসিয়া কেন এস না ?"

জেলেদের এক খানি নৌকার উপর গিয়া কঙ্কাবতী বসিলেন।

এমন সময় বাটীতে কঙ্কাবতীর অনুসন্ধান হইল। "কঙ্কাবতী কোথায় গেল, কঙ্কাবতী কোথায় গেল ?" এই বলিয়া একটী গোল পড়িল। কে বলিল,—"ও গো ! তোমাদের কঙ্কাবতী ঐ ঘাটের দিকে গিয়াছে।"

কঙ্কাবতীর বাড়ীর সকলে মনে করিলেন যে, জনার্দ্দন চৌধুরীর

সহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কঙ্কাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, কঙ্কাবতী এক খানি নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইতেছেন।

কঙ্কাবতীর ভগ্নী বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী বোন আমার, ঘরে ফিরে এস না ?
বড় দিদি হই আমি, ভাল কি আর বাস না ?
তিন ভগ্নী আছি দিদি, দুইটী বিধবা তার।
কঙ্কাবতী তুমি ছোট, বড় আদরের মা'র।"

নৌকায় বসিয়া বসিয়া কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"শুনিয়াছি আছে না-কি জলের ভিতর।
শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর।
সেই খানে যাই দিদি পূজি তোমার পা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন, ভাই আসিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না কালি।
রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার কথা ?
ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি।
জ্বলিছে আগুন দেহে নিবাইতে নারি।
যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন কঙ্কাবতীর মা আসিয়া বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী লক্ষ্মী আমার, ঘরে ফিরে এস না?
কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর কোরো না।
ভাত হ'ল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার, সাত দিন উপবাসী।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে।
তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে।
এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।
কঙ্কাবতীর নৌকাখানি এই হুথু যা।"

এই বলিতে কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন বাপ আসিয়া বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, হইবে তোমার বিয়া।
কত যে হোতেছে ঘটা, দেখ তুমি ঘরে গিয়া।

গহনা পরিবে কত, আর সাটিনের জামা।
কত যে পাইবে টাকা, নাহিক তাহার সীমা।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
এ দারুণ যাতনা পিতা আর সহে না।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা!"

এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি নদীর জলে টুপ্ করিয়া ডুবিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

জলে

নৌকার সহিত কঙ্কাবতীও ডুবিয়া গেলেন। কঙ্কাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তখন নদীর যত মাছ সব একত্র হইল। নদীর ভিতর মহা কোলাহল পড়িয়া গেল যে, 'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' রুই বলে,—'কঙ্কাবতী আসিতেছেন', পুঁটি বলে,—'কঙ্কাবতী আসিতেছেন', সবাই বলে,—'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' পথ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচর জীব জন্তু সব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, ক্রমে কঙ্কাবতী আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কঙ্কাবতীর আদর করিল। সকলেই বলিল,—"এস, এস, কঙ্কাবতী এস!"

মাছেদের ছেলেমেয়েরা বলিল,—"আমরা কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করিব।"

বৃদ্ধা কাতলা মাছ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন,—"কঙ্কা-বতীর এ খেলা করিবার সময় নয়। বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখিয়া আমি কঙ্কাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিলাম। আহা! কত পথ আসিতে হইয়াছে! বাছার আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! এস, মা! তুমি আমার কাছে এস।

একটু বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা যাইবে।”

কঙ্কাবতী আস্তে আস্তে কাতলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন।

এদিকে কঙ্কাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জলচর জীব-জন্তুগণ মহাসমারোহে একটী সভা করিলেন। তপস্বী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিলেন। ‘কঙ্কাবতীকে লইয়া কি করা যায়’, সভায় এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল।

অনেক বক্তৃতার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন,—“এস ভাই! কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করি।”

এই কথাটী সকলের মনোনীত হইল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল! জলের ভিতর পথে ঘাটে ঢ্যাঁট্‌রা পড়িল যে, ‘কঙ্কাবতী মাছেদের রাণী হইবেন।’

মাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে,—“ভাই! কঙ্কাবতী আমাদের রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়শী দিয়া আমা-দিগের কেহ গাঁথিলে, হাত দিয়া কঙ্কাবতী সূতাটী ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে, ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী জালটী কাটিয়া দিবেন। কঙ্কাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভয় থাকিবে না। এস, এখন সকলে কঙ্কাবতীর কাছে যাই, আর কঙ্কাবতীকে গিয়া বলি যে, ‘কঙ্কাবতী! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।”

এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীর কাছে যাইল, আর সকলে বলিল,—"কঙ্কাবতী! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার শরীরে সুখ নাই, আমার মনেও বড় অসুখ। তাই, এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাতলানী মৎস্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোমরা সভা তো করিলে, বক্তৃতা তো অনেক করিলে, বিধিমত কঙ্কাবতীকে 'ভোট' দিয়াছ?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"না, কৈ কঙ্কাবতীকে বিধিমত ভোট দেওয়া হয় নাই। সেটী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।"

কাতলানী বলিলেন,—"তবে? ভোট না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে কেন?"

তখন মাছেরা সব বলিল,—"ও হো! বুঝেছি বুঝেছি! ভোট না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। এস, আমরা সকলে কঙ্কাবতীকে ভোট দিই।"

এই বলিয়া যত মাছ কঙ্কাবতীকে ভোট দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা ভোটের হাঁড়িটী কঙ্কাবতীর সম্মুখে লইয়া গেল। হাঁড়ির মুখে যে ন্যাকড়াখানি বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া বলিল,—"দেখ, দেখ, কঙ্কাবতী! কত ভোট পাইয়াছ! এখন আর বলিতে পারিবে না যে, তোমাদের রাণী হইব না।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"না গো না! ভোটের জন্য নয়।

আমি এখন তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার যা হইয়াছে, তা আমিই জানি।"

তখন কাতলানী পুনরায় বলিলেন,—"তোমরা রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়াছ? রাজ-পোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী তোমাদের রাণী হইবে কেন?"

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল,—"ও হো! বুঝেছি বুঝেছি! রাজ-পোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেঘের মত পোষাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রাণী হইবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"না গো না! রাঙা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আর আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।"

তখন কাতলানী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা রাজার ঠিক করিয়াছ? রাজা না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী কি করিয়া হয়? তাই একেলা বসিয়া কঙ্কাবতীর কাঁদিতে সাধ হইয়াছে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"তা নয় গো, তা নয়! আমার রাজায় কাজ নাই। আমি দুঃখিনী কঙ্কাবতী। প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে তোমাদের এই জলের ভিতর আসিয়াছি।"

কাতলানী তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"রাজা চাই না বটে? আর যদি খেতুকে রাজা করি?

চমকিত হইয়া কঙ্কাবতী কাতলানীর মুখ পানে চাহিলেন। তিনি ভাবিলেন,—"এই নদীর মাঝখানে, এত গভীর জলের ভিতরেও এ সংবাদটী আসিয়াছে!"

কাতলানী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, আর বলিলেন,—"তোমরা মনে কর, মাছেরা কিছু জানে না, মাছেদের কেবল ধরিয়া খাইতে হয়। শুধু তা নয়, কঙ্কাবতী! শুধু তা নয়। আমরাও কিছু কিছু সংবাদ রাখিয়া থাকি। ঘাটে যখন চরিতে যাই, যখন তোমাদের মেয়েতে মেয়েতে কথা হয়, তখন আমরাও এক-আধটা কথা কান পাতিয়া শুনি। যাও মা! এখন উঠ, গিয়া পোষাক পর, রাণী হও, কাঁদিও না।"

বৃদ্ধা কাতলা মাছের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া কঙ্কাবতীর মন অনেকটা সুস্থ হইল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল! না হয় আমি তোমাদের রাণী হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"করিতে হইবে কি? কেন? দরজীব বাড়ী যাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোষাক পরিতে হইবে!"

সকলে তখন কাঁকড়াকে বলিলেন,—"কাঁকড়া মহাশয়! আপনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন। আপনি বুদ্ধিমান লোক। চক্ষু দুটী যখন আপনি পিট্ পিট্ করেন, বুদ্ধির আভা তখন তাহাব ভিতর চিক্ চিক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দরজীর বাড়ী গমন করুন। ঠিক করিয়া কঙ্কাবতীর গায়ের মাপটি দিবেন, দামী কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কচ্ছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা মোহর লইয়া যান। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া, কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"অবশ্যই আমি যাইব। কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কার না আহ্লাদ? আমাদের রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদেরই অখ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোষাকী কাপড় পরিয়া আসি, আর মাথার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল করিয়া ফিরাইয়া আসি।"

কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশয় ভাল কাপড় পরিয়া, মাথা আঁচড়াইয়া, ফিট-ফাট হইয়া, আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

রাজ বেশ

কঙ্কাবতী করেন কি? সকলের অনুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিন জনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দূর জলপথে যাইলেন, তাহার পর অনেকদূব স্থল-পথে যাইলেন। পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুড়ো দরজী চশমা নাকে দিয়া, কাঁচি হাতে করিয়া, কাপড সেলাই করিতেছিলেন। দূরে পাহাড় পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, তিন জন কাহারা আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,—"ও কাবা আসে?" নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলেন।

তখন বুড়ো দরজী বলিলেন,—"কে ও কাঁকড়া ভায়া?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ দাদা! কেমন, ভাল আছ তো?"

দরজী বলিলেন,—"আব ভাই! আমাদের আর ভাল থাকা না থাকা! এখন গেলেই হয়। তোমরা সৌখীন পুরুষ, তোমাদেব কথা স্বতন্ত্র। এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি?"

বুড়ো দরজী

ও কারা আসে ?
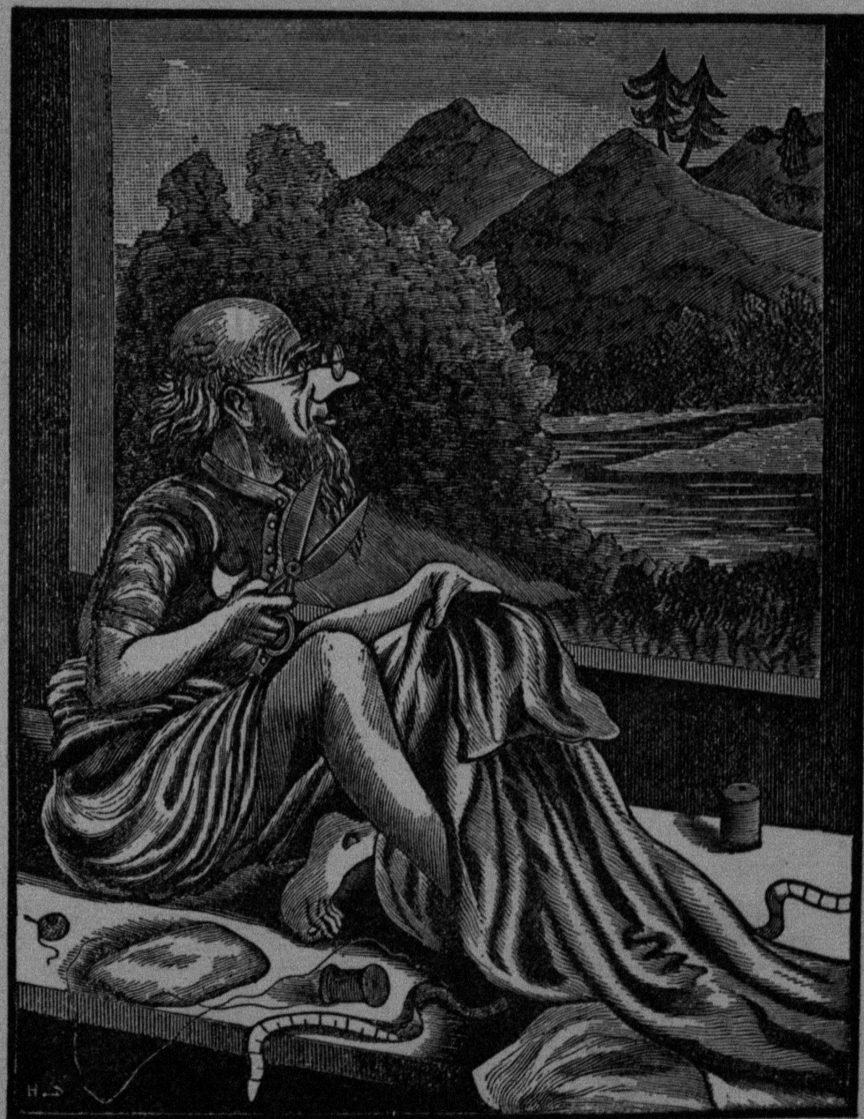
কাঁকড়া উত্তর করিলেন,—"এই কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। কঙ্কাবতীর জন্য ভাল জামা চাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি।"

দরজী বলিলেন,—"বটে! তা আমার নিকট উত্তম উত্তম জামা আছে। ভাল পাটনাই খেরোর জামা আছে। টক্-টকে লাল খেরো, রং উঠিতে জানে না, ছিঁড়িতে জানে না, আগা-গোড়া আমি ব'খেই দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী, কঙ্কাবতী, যদি শিমুল তুলা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জন্য আটক খাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি? কঙ্কাবতী শিমুল তুলা কি না?"

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"কৈ না! সেরূপ নরম তো নয়!"

দরজী বলিলেন,—"তাই তো! আচ্ছা ফুঁ দিয়া দেখ দেখি?"

কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গায়ে ফুঁ দিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—"কৈ না! উড়িয়া তো গেল না?"

দরজী বলিলেন—"তাই তো। আচ্ছা! দেখ দেখি, যদি ছোবড়া হয়? ছোবড়া হইলেও কাজ চলিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"খেরোর খোল পরাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ করিবে না কি? এই, সকলে মিলিয়া আমাকে রাণী করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন?"

দরজী উত্তর করিলেন,—"ঈশ্! মেয়ের যে আব্বা ভারি! বালিশ হবে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও না কি?"

দরজীর এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে কঙ্কাবতীর মনে বড় দুঃখ হইল। কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বলিলেন,—"তুমি ছেলে মানুষ! আমাদের কথায় কথা কও কেন বল দেখি? যা তোমার পক্ষে ভাল, তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর! ছি, কাঁদিতে নাই।"

এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া, কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাড়া দিয়া কঙ্কাবতীর চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কঙ্কাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

কঙ্কাবতীর কান্না থামিলে, পুনরায় কাঁকড়া মহাশয় ভাল করিয়া কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন; দেখিয়া দরজীকে বলিলেন,—"না! এ ছোবড়াও নয়।"

বুড়ো দরজী বলিলেন,—"তাই তো। তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জানি না, সেলাই করিতেও জানি না। যদি তুমি শিমুল তুলা হইতে, কি অভাব পক্ষে ছোবড়াও হইতে, তাহা হইলে কেমন জামা পরাইয়া দিতাম! তা তোমার কপালে নাই, আমি কি করিব?

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই?"

বুড়ো দরজী বলিলেন,—"তুমি এক কাজ কর, তুমি খলীফা

সাহেবের কাছে যাও। খলীফা সাহেব ভাল কারিগর, খলীফা সাহেবের মত কারিগর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানাবিধ কাপড় আছে, সে কাপড় পরিলে থাঁদারও নাক হয়।”

এই কথায় কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—“তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ না কি? তোমার না হয় নাকটী একটু বড়, আমার না হয় নাকটী ছোট, তাতে আবার অত ঠাট্টা কিসের?”

বুড়ো দরজী উত্তর করিলেন,—“না না! তা কি কখনও হয়? তোমাকে আমি কি ঠাট্টা করিতে পারি? কেন? তোমার নাকটী মন্দ কি? কেবল দেখতে পাওয়া যায় না, এই দুঃখের বিষয়।”

বুড়ো দরজীর এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—“তা বটে! তা বটে! আমার নাকটী ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, ‘আহা! কাঁকড়ার কি নাক! যেন বাঁশির মত।’ আর যারা ছড়া বাঁধে, তারা লিখিত,—‘তিলফুল জিনি নাশা!’ কিম্বা ‘শুকচঞ্চু মত নাশা’। যা বল, আর যা কও, আমার অতি সুন্দর নাক।”

কঙ্কাবতী ভাবিলেন, “ব্যাপার খানা কি? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটী তো বদ্ধ পাগল।

এরে পাগলা গারদে রাখা উচিত।” মুখ ফুটিয়া কিন্তু কঙ্কাবতী কিছু বলিলেন না।

সকলে পুনর্বায় সেখান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তাহার পর কঙ্কাবতী, শেষে কচ্ছপ। এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে, অনেক দূর গিয়া অবশেষে খলীফা সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন। খলীফা তখন অন্দরমহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—“খলীফা সাহেব! খলীফা সাহেব!”

ভিতর হইতে খলীফা উত্তর দিলেন,—“কে হে! কে ডাকাডাকি করে?”

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—“আমি কাঁকড়াচন্দ্র! একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ কাজ আছে।”

খলীফা বাহিরে আসিলেন। কাঁকড়াচন্দ্রকে দেখিয়া অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

খলীফা বলিলেন,—“আসুন আসুন, কাঁকড়া বাবু আসুন! আর এই যে কচ্ছপ বাবুকেও দেখিতেছি! কচ্ছপ বাবু! আপনি ঐ টুলটীতে বসুন, আর কাঁকড়া বাবু! আপনি ঐ চেয়ারখানি নিন্। এ মেয়েটীকে বসিতে দিই কোথায়? দিব্য মেয়েটী! কাঁকড়া বাবু! এ কন্যাটী কি আপনার?”

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিলেন,—“না, এ কন্যাটী আমার নয়। আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্যই এখানে আসিয়াছি। ওঁরে আমরা

আমাদের রাণী করিয়াছি। এক্ষণে রাজ-পরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। এঁর জন্য অতি উত্তম রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

খলীফা উত্তর করিলেন,—"রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, সাটিন আছে, আর বারাণসী কিংখাব পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু রাজ-পোষাক তো আর অমনি হয় না? তাতে হীরা বসাইতে হইবে, মতি বসাইতে হইবে, জরি লেস্ প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা খরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো?"

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"আমাদের টাকার অভাব কি? যত নৌকা জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে, সে সব কোথায় যায়? সে সকল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপনার কত টাকা চাই, তা বলুন?"

খলীফা উত্তর করিলেন,—"যদি দুই তোড়া টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে উত্তম রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

কাঁকড়া তৎক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া দুই তোড়া মোহর খলীফার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। খলীফা—অনেক রাজার পোষাক, অনেক বাবুর পোষাক, অনেক বরের পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু একবারে দুই তোড়া মোহর কেহ কখনও তাঁহাকে দেয় নাই।

মোহর দেখিয়া কঙ্কাবতী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—"ও গো! তোমরা এ টাকাগুলি আমাকে দাও না গা? আমি বাড়ী লইয়া

যাই। আমার বাবা বড় টাকা ভালবাসেন, এত টাকা পাইলে বাবা কত আহ্লাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকাগুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।"

কাঁকড়া কঙ্কাবতীকে বকিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন,—"তুমি তো বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি! একবার তোমাকে মানা করিয়াছি যে, তুমি ছেলেমানুষ, আমাদের কথায় কথা কহিও না। চুপ করিয়া দেখ, আমরা কি করি।"

কি করিবেন? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া খলীফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন,— "টাকাগুলি বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসি, আর ভাল ভাল কাপড বাহির করিয়া আনি। এইক্ষণেই তোমাদের রাণীর রাজবস্ত্র করিয়া দিব।"

বাটীর ভিতর খলীফা দুই তোড়া মোহর লইয়া যাইলেন। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, দন্তপাঁতি বাহির করিয়া, এক গাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

স্ত্রী অবাক! কি আশ্চর্য্য! "আজ সকাল বেলা আমরা কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম?" খলীফানী এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশ্যে খলীফানী বলিলেন,—"এবার কিন্তু আমাকে ডায়মন কাটা তাবিজ গড়াইয়া দিতে হইবে?"

তাহার পর খলীফা কঙ্কাবতীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন।

কি আশ্চর্য্য ! কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি ?

স্ত্রীকে বলিলেন,—"ইনি রাণী। এঁর নাম কঙ্কাবতী। এঁর জন্ত রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে তুমি ইহার গায়ের মাপ লও।"

খলীফানী কঙ্কাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া অতি সত্বর খলীফা রাজ-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। খলীফা-রমণী যত্নে সেই পোষাক কঙ্কাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কঙ্কাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

খলীফা-রমণী বলিলেন,—"আহা! মরি কি রূপ!"

খলীফা বলিলেন,—"মরি, কি রূপ!"

সকলেই বলিলেন,—"মরি, কি রূপ!"

রাজ-পরিচ্ছদ পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ, কঙ্কাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিলেন। অনেক স্থল অনেক জল অতিক্রম করিয়া তিন জনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে, কঙ্কাবতীর মনোহর রূপ, মনোহর পরিচ্ছদ দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল। সকলেই বলিল,—"আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কঙ্কাবতী হেন রাণী পাইলাম!"

এক্ষণে একটী মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায়? যে সে রাণী নয়, কঙ্কাবতী রাণী! যেরূপ জগৎ-সুশোভিনী মনোমোহিনী কঙ্কাবতী রাণী, সেইরূপ সুসজ্জিত, অলঙ্কৃত, মনো-

মোহিত অট্টালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে, রাণী কঙ্কাবতীর নিমিত্ত মতিমহলই উপযুক্ত স্থান। যাহারে মতি বলে, তাহারেই মুক্তা বলে। মুক্তার যথায় উৎপত্তি, মুক্তার যথায় স্থিতি, সেই স্থানকে 'মতিমহল' বলে।

রুই প্রভৃতি মৎস্যগণ জোড়হাত করিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন, —"রাণী ধিরাণী মহারাণী! মতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান, আপনি ঐ মতিমহলে গিয়া বাস করুন।"

এইরূপে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীকে একটী ঝিনুক দেখাইয়া দিল। ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয় বলিয়া, ঝিনুকের নাম মতিমহল। কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিনুকের ভিতর বাস করিয়া কঙ্কাবতী মাছেদের রাণীগিরি করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:•:—

গোয়ালিনী

এইরূপে কিছু দিন যায়। এখন, এক দিন এক গোয়ালিনী নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছিল। স্নান করিতে করিতে তাহার পায়ে সেই ঝিনুকটী ঠেকিল। ডুব দিয়া সে সেই ঝিনুকটী তুলিল। দেখিল যে, চমৎকার ঝিনুক! ঝিনুকটী সে বাড়ী লইয়া গেল; আব আপনার চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

বাহিরের দ্বারে কুলুপ দিয়া, গোয়ালিনী প্রতিদিন লোকের বাড়ী দুধ দিতে যায়। কঙ্কাবতী সেই সময় ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হন। প্রথম দিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যেমন তিনি মাটীতে পা দিলেন, আর তাঁহার রাজবেশ গিয়া একেবারে পূর্ব্ববৎ বেশ হইল। কঙ্কাবতী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। প্রতিদিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, কঙ্কাবতী, গোয়ালিনীর সমুদয় কাজ-কর্ম্ম সারিয়া রাখেন। ঘব দ্বার পরিষ্কার করেন, বাসন-কোশন মাজেন, ভাত ব্যঞ্জন রাঁধেন, আপনি খান আর গোয়ালিনীর জন্য ভাত বাড়িয়া রাখেন।

বাড়ী আসিয়া, সেই সব দেখিয়া, গোয়ালিনী বড়ই আশ্চর্য্য হয়। গোয়ালিনী মনে করে,—"এমন করিয়া আমার সমুদয় কাজকর্ম্ম কে করে? দ্বারে যেরূপ চাবি দিয়া যাই, সেইরূপ চাবি দেওয়াই থাকে।

বাহির হইতে বাড়ীর ভিতর কেহ আসে নাই? তবে এ সব কাজ-কর্ম্ম করে কে?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোয়ালিনী কিছুই স্থির করিতে পারে না। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল।

অবশেষে গোয়ালিনী ভাবিল,—"আমাকে ধরিতে হইবে। প্রতি-দিন যে আমার কাজ কর্ম্ম সারিয়া রাখে, তারে ধরিতে হইবে!"

এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, গোয়ালিনী তার পর দিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে দ্বারটী খুলিয়া দেখে যে, বাটীর ভিতর এক পরমা সুন্দরী বালিকা বসিয়া বাসন মাজিতেছে!

গোয়ালিনীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী যেই ঝিনুকের ভিতর গিয়া লুকাইবেন, আর সে গিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরিয়া দেখে না, কঙ্কাবতী!

আশ্চর্য্য হইয়া গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"কঙ্কাবতী! তুমি এখানে? তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে? তুমি না নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ মাসি! আমি কঙ্কাবতী। আমি নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। নদীতে আমি ঐ ঝিনুকটীর ভিতর ছিলাম। ঝিনুকটী আনিয়া তুমি চালের বাতায় রাখিয়াছ। তাই, মাসি! আমি, তোমার বাড়ী আসিয়াছি।"

গোয়ালিনী এখন সকল কথা বুঝিল। আশ্চর্য্য হইবার আর কোনও কারণ রহিল না।

কঙ্কাবতী পুনরায় বলিলেন,—"মাসি! আমি যে এখানে আছি, সে কথা এখন তুমি আমার বাড়ীতে বলিও না। শুধু-হাতে বাড়ী যাইলে বাবা হয় তো বকিবেন। জলের ভিতর আমি অনেক টাকা দেখিয়াছি। তাহারা দরজীকে দিল, কিন্তু আমাকে দিল না। আমি কত কাঁদিলাম কাটিলাম, তবুও তাহারা আমাকে দিল না। দেখি, যদি তাহারা আমাকে কিছু দেয়, তাহা হইলে বাবাকে নিয়া দিব, বাবা তাহা হইলে বকিবেন না, দাদা গালি দিবেন না।"

গোয়ালিনী বলিল,—"বাছা রে আমার! জনার্দ্দন চৌধুরীকে এই সোনার বাছা বেচিতে চায়। পোড়ারমুখো বাপ! রও, এইবার দেখা হইলে হয়! গালি দিয়ে ভূত ছাড়াইব!"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন—"না মাসি, বাবাকে গালি দিও না! জান তো, মাসি? বাবা দুঃখী মানুষ! ঘরে অনেকগুলি খাইতে। আমাকে না বেচিলে, বাবা, সংসার প্রতিপালন কি করিয়া করিবেন?"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, কঙ্কাবতী এখন কিছু দিন দিন গোয়ালিনীর ঘরে থাকিবেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মাসি! প্রতিদিন তুমি পাড়ায় যাও। গ্রামে যে দিন যে ঘটনা হয়, আমাকে আসিয়া বলিও।"

গোয়ালিনীর ঘরে কঙ্কাবতী বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামে যে দিন যেখানে যাহা হয়, গোয়ালিনী আসিয়া তাঁহাকে বলে।

এক দিন গোয়ালিনী আসিয়া ব'লিল,—"আহা! খেতুর মার বড অসুখ! খেতুর মা এবাব বাঁচেন কি না!"

অতি কাতর ভাবে, কাঁদ-কাঁদ হইয়া কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কি হইয়াছে, মাসি? তাঁর কি হইয়াছে?"

গোয়ালিনী উত্তর করিল,—"শুনিলাম, তাঁহার জ্বর-বিকাব হইয়াছে। খেতু বৈদ্য ডাকিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদ্য আসেন নাই। বৈদ্য বলিয়াছেন,—'তোমার বাটীতে চিকিৎসা করিতে গিয়া, শেষে জাতিটী হারাইব না কি'?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মাসি! তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। আমার আপনার-মা যেরূপ, তিনিও আমাব সেইরূপ। তাঁব অসময়ে আমি কিছু করিতে পারিলাম না, সেজন্য বড দুঃখ মনে রহিল।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পবদিন অতি প্রত্যূষে কঙ্কাবতী বলিলেন,—মাসি। আজ একটু সকাল সকাল তুমি পাডায় যাও। শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বল তিনি কেমন আছেন।"

গোয়ালিনী সকাল সকাল পাড়ায় যাইল, সকাল সকাল ফিরিযা আসিয়া, কঙ্কাবতীকে বলিল,—"আহা! বড দুঃখের কথা! খেতুর মা নাই! খেতুর মা মারা গিয়াছেন! মাকে ঘাটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, খেতু দ্বার দ্বার ঘুরিতেছেন, কিন্তু কেহই আসিতেছে না। সকলেই বলিতেছে,—'তুমি বরখ খাইয়াছ, তোমার জাতি গিয়াছে, তোমার মাকে ঘাটে লইয়া যাইলে আমাদের জাতি যাইবে।'

খাঁড়েশ্বর চক্রবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন শিরোমণি, আর, কঙ্কাবতী! তোমার বাপ, এই তিনজনে সকলকে মানা করিয়া বেড়াইতেছেন, যেন কেহ না যায়।”

এই সংবাদ শুনিয়া কঙ্কাবতী একেবারে শুইয়া পড়িলেন। অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। গোয়ালিনী তাঁহাকে কত বুঝাইল। গোয়ালিনী কত বলিল,—“কঙ্কাবতী! চুপ কর। কঙ্কাবতী! উঠ, খাও। কঙ্কাবতী উঠিলেন না, সেদিন রাঁধিলেন না, খাইলেন না। মাটিতে পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাবেলা কঙ্কাবতী বলিলেন,—“মাসি। তুমি আর একবার পাড়ায় যাও। দেখ গিয়া সেখানে কি হইতেছে। শীঘ্র আসিয়া আমাকে বল।”

গোয়ালিনী পুনরায় পাড়ায় যাইল। একটু রাত্রি হইল, তবুও গোয়ালিনী ফিরিল না। এক প্রহর রাত্রি হইল, তবু গোয়ালিনী ফিরিল না। মাটিতে শুইয়া, পথপানে চাহিয়া কঙ্কাবতী কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

এক প্রহর রাত্রির পর গোয়ালিনী ফিরিয়া আসিল।

গোয়ালিনী বলিল,—“কঙ্কাবতী! বড়ই দুঃখের কথা শুনিয়া আসিলাম। খেতুর মাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কেহই আসেন নাই। খেতু করেন কি? সন্ধ্যা হইলে কাঠ আপনি মাথায় করিয়া প্রথমে ঘাটে রাখিয়া আসিলেন। আহা! একেবারে অতগুলি কাঠ লইয়া যাইতে পারিবেন কেন? তিন বার কাঠ লইয়া তাঁকে ঘাটে যাইতে হইয়াছে। এখন তিনি মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন।

একেলা আপনি কোলে করিয়া মাকে লইয়া যাইতেছেন। মরিলে লোক ভারী হয়। তাতে শ্মশান ঘাট তো আর কম দূর নয়! খানিক দূর লইয়া যান, তার পর আর পারেন না। মাকে মাটীতে শয়ন করান, একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় লইয়া যান। এইরূপ করিয়া তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। অন্ধকার রাত্রি। একটু দূরে দূরে থাকিয়া আমি এই সব দেখিয়া আসিলাম।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কঙ্কাবতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে গিয়া বাটীর দ্বারটী খুলিলেন, বাটীর বাহিরে যাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন।

গোয়ালিনী বলিল,—"কঙ্কাবতী কোথায় যাও? কঙ্কাবতী কোথায় যাও?"

আর, কোথায় যাও! আজ কঙ্কাবতী রাণী, ধিরাণী, মহারাণী নন, আজ কঙ্কাবতী পাগলিনী। মনোহর রাজবেশে আজ কঙ্কাবতী সুসজ্জিতা নন, আজ কঙ্কাবতী গোয়ালিনীর এক খানি সামান্য মলিন বসন পরিধৃতা। কঙ্কাবতীর মুখ-চন্দ্রিমা আজ উজ্জ্বল প্রভাময়ী নয়, আজ কঙ্কাবতীর মুখ ঘন-ঘটায় আচ্ছাদিত।

বাটীর বহির হইয়া, মলিন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগলিনী সেই শ্মশানের দিকে ছুটিলেন।

"কঙ্কাবতী শুন, কঙ্কাবতী শুন!" এই কথা বলিতে বলিতে কিয়দ্দূর গোয়ালিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু

কঙ্কাবতী তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী অবিলম্বেই নিশার তমোরাশিতে মিশিয়া যাইল। গোয়ালিনী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়া যাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:০:—

শ্মশান

দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া, পাগলিনী এখন শ্মশানের দিকে দৌড়িলেন। কিছু দূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, পথে খেতু মাতাকে রাখিয়াছেন, মার মস্তকটী আপনার কোলে লইয়াছেন, মার কাছে বসিয়া মার মুখ দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। অবিরলধারায় অশ্রুবারি তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বিগলিত হইতেছে।

কঙ্কাবতী নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্রি, সেই জন্য খেতু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মার মুখপানে চাহিয়া খেতু বলিলেন,—"মা! তুমিও চলিলে? যখন কঙ্কাবতী গেল, তখন মনে করিয়াছিলাম, এ ছার জীবন আর রাখিব না। কেবল, মা, তোমার মুখপানে চাহিয়া বাঁচিয়া ছিলাম। এখন, মা, তুমিও গেলে? তবে আর আমার এ প্রাণে কাজ কি? কিসের জন্য, কার জন্য আর বাঁচিয়া থাকিব? এ সংসারে থাকা কিছু নয়। এখানে বড় পাপ, বড় দুঃখ। বেশ করিয়াছ, কঙ্কাবতী, এখান হইতে গিয়াছে। বেশ করিলে, মা, যে এ পাপ সংসার হইতে তুমিও চলিলে! চল, মা। যেখানে কঙ্কাবতী, যেখানে তুমি, সেইখানে আমিও শীঘ্র যাইব। এই সসাগরা পৃথিবী আজ আমার পক্ষে শ্মশান-ভূমি হইল। এ

সংসারে আর আমার কেহ নাই। চল, মা, শীঘ্রই তোমাদিগের নিকট গিয়া প্রাণের এ দারুণ জ্বালা জুড়াইব। মা! কঙ্কাবতীকে বলিও শীঘ্রই গিয়া আমি তাহার সহিত মিলিব।”

কঙ্কাবতী আসিয়া অধোমুখে খেতুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। খেতু চমকিত হইলেন, অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতী মার পায়ের নিকট গিয়া বসিলেন। মার পা দু'খানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। সেই পায়ের উপর আপনার মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, খেতু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে খেতু বলিলেন,—“কঙ্কাবতী! জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, সর্ব্বদা সকলের ইষ্ট-চিন্তাই করিয়াছি। জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, প্রবঞ্চনা কখনও করি নাই, কোনও রূপ দুষ্কর্ম্ম কখনও করি নাই। তবে কি মহাপাপের জন্য আজ আমার এ ভীষণ দণ্ড, আজ এ ঘোর নরক! বিনা দোষে কত দুঃখ পাইয়াছি তাহা সহিয়াছি, গ্রামের লোকে বিধিমত উৎপীড়ন করিল তাহাও সহিলাম, প্রাণের পুতলি তুমি কঙ্কাবতী জলে ডুবিয়া মরিলে তাহাও সহিলাম, প্রাণের অধিক মা আমার আজ মরিলেন তাহাও সহিলাম, কিন্তু এই সঙ্কট সময়ে তুমি যে আমার শত্রুতা সাধিবে স্বপনেও তাহা কখনও ভাবি নাই। মাতার মৃতদেহ একেলা আমি আর বহিতে পারিতেছি না। মাতার পীড়ার

জন্য আজ তিন দিন আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। আজ তিন দিন এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত আমি খাই নাই। শরীরে আমার শক্তি নাই, শরীর আমার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর একটী পা-ও আমি মাকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না। কি করি, ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। এমন সময়ে কি না, তুমি কঙ্কাবতী, ভূত হইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিলে! দুঃখের এইবার আমার চারি পো হইল। এ দুঃখ আমি আর সহিতে পারি না।"

কাঁদ কাঁদ স্বরে, অধোমুখে, কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি ভূত হই নাই, আমি মরি নাই, আমি জীবিত আছি।"

আশ্চর্য হইয়া খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি জীবিত আছ? জলে ডুবিয়া গেলে, তোমার আমরা কত অনুসন্ধান করিলাম। তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে করিলাম, আমিও মরি। মরিবার নিমিত্ত জলে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতার জানিয়াও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া জলের ভিতর রহিলাম, কিছুতেই উঠিলাম না। তাহার পর জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় জেলেরা আমাকে তুলিল, তাহারা আমাকে বাঁচাইল। জ্ঞান হইয়া দেখিলাম, মা আমার কাঁদিতেছেন। মার মুখপানে চাহিয়া প্রাণ ধরিয়া রহিলাম। কঙ্কাবতী! তুমি কি করিয়া বাঁচিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"সে অনেক কথা। সকল কথা পরে বলিব। আমি গোয়ালিনী মাসির বাটীতে ছিলাম। এই ঘোর বিপদের কথা সেইখানে শুনিলাম। আমি থাকিতে পারিলাম

না, আমি ছুটিয়া আসিলাম। এক্ষণে চল মাতাকে ঘাটে লইয়া যাই। তুমি একদিক ধর, আমি একদিক ধরি।"

এই প্রকারে কঙ্কাবতী ও খেতু মাকে ঘাটে লইয়া যাইলেন। সেখানে গিয়া দুই জনে চিতা সাজাইলেন। মাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন। নূতন কাপড় পরাইলেন। তাহার পর চিতার উপর তুলিলেন। চিতার উপর তুলিয়া দুইজনে মায়ের পা ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! তুমি স্বর্গে চলিলে। দীনহীন তোমার এই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর, ধর্ম্মপথ হইতে যেন কখনও বিচলিত না হই। সত্য যেন আমার ধ্যান, সত্য যেন আমার জ্ঞান, সত্য যেন আমার ক্রিয়া হয়। ধন লালসায় কি সুখ লালসায় কি যশ লালসায় যেন সত্যপথ, ধর্ম্মপথ কখনও পরিত্যাগ না করি। অজ্ঞান কপটাচারী জনসমাজের ভ্রুকুটি-ভ্রুভঙ্গিমায় ভীরু নরাধম-দিগের মত কম্পিত হইয়া যেন কর্ত্তব্যে কখনও পরাঙ্মুখ না হই। হে মা! প্রাণ যায় যাউক! পুরুষ হইয়া যেন কখনও কাপুরুষ না হই।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা! তুমি স্বর্গে চলিলে, তোমার এই অনাথিনী কঙ্কাবতীর প্রতি একবার কৃপা-দৃষ্টি কর। জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, মা, যেন ধর্ম্ম আমার মতি হয়, যেন ধর্ম্ম আমার গতি হয়। অধিক আর, মা, তোমাকে কি বলিব! কঙ্কাবতীর মনের কথা তুমি সকলি জান। কঙ্কাবতীর প্রাণ রক্ষা হউক না হউক, কঙ্কাবতীর ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। যদি এদিকের সূর্য্য ওদিকে উদয় হন, যদি

মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তবুও, কঙ্কাবতী যদি সতী হয়, কঙ্কাবতীকে কেহ ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবে না। মনে মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, আজ আবার, মা, তোমার পা ছুঁইয়া মুখ ফুটিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে মা! তোমার কঙ্কাবতী এখন পাগলিনী, তোমার কঙ্কাবতীর অপরাধ ক্ষমা কর।"

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কি করিয়া চিতায় আগুন দিই? জনমের মত কি করিয়া মাকে বিদায় করি! আর মাকে দেখিতে পাইব না। এস কঙ্কাবতী! ভাল করিয়া আর একবার মার মুখ খানি দেখিয়া লই।"

মুখের নিকট দাঁড়াইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, খেতু মা'র চুল গুলি নাড়িতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন,—"দেখ, কঙ্কাবতী! কি স্থির শান্তিময়ী মুখশ্রী! মা যেন পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তোমার কি মনে পড়ে, কঙ্কাবতী! ছেলে বেলা যখন তুমি বিড়াল লইয়া খেলা করিতে? প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় যখন তুমি পড়িতে পারিতে না? আমি তোমাকে কত বকিতাম, আর মা আমার উপর রাগ করিতেন। মা আমাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, সেইরূপ তোমাকেও ভাল-বাসিতেন। আহা! কঙ্কাবতী! কি মা আমরা হারাইলাম!"

এই প্রকারে নানা রূপ খেদ করিয়া, অবশেষে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, খেতু অগ্নি-কার্য্য করিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী ও খেতু নিকটে বসিয়া মাঝে মাঝে কাঁদেন, মাঝে মাঝে খেদ করেন, আর মাঝে মাঝে অন্যান্য কথা-বার্ত্তা কন্। কি করিয়া জল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, কঙ্কাবতী সেই সমুদয় কথা খেতুকে বলিলেন। খেতু মনে করিলেন, নানা দুঃখে কঙ্কাবতীর চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। দুঃখের উপর দুঃখ, এ আবার এক নূতন দুঃখ তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। মনের কথা খেতু কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না।

মা'র সৎকার হইয়া যাইলে, দুই জনে নদীতে স্নান করিলেন।

তাহার পর খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"পুনরায় আমি কি করিয়া বাড়ী যাইব? বাবা আমাকে তিরস্কার করিবেন, দাদা আমাকে গালি দিবেন। আমি জলের ভিতর গিয়া মাছেদের কাছে থাকি, না হয় গোয়ালিনী মাসীর ঘরে যাই।"

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! সেই কাজ করিতে নাই। তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। যতই কেন দুঃখ পাও না, ঘরে থাকিয়া সহ্য করিতে হইবে। মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন! আর এখন বালিকার মত কথা কহিলে চলিবে না। ভীষণ মহাসাগর-বক্ষে উন্মত্ত-তরঙ্গ-তাড়িত জীর্ণ-দেহ সামান্য দুইখানি তরণীর ন্যায়, আমরা দুই জনে এই সংসার কর্ত্তৃক তাড়িত হইতেছি। তাই, কঙ্কাবতী! বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কথা বলিতে

হইবে, বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কাজ করিতে হইবে। মাতার পদ-যুগল ধরিয়া আজ রাত্রিতে যেরূপ ধীর জ্ঞান-গম্ভীর বাক্য তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, এখন হইতে সেইরূপ কথা আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই। ভাবী ঘটনার উপর মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব না থাকুক, অনেক পরিমাণে আছে। তা না হইলে, ভাবী ফলের প্রতীক্ষায় কৃষক কেন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে? উদ্যম উৎসাহের সহিত মনুষ্য এই সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম্ম-বীজ কেন রোপণ করিবে? মনুষ্যের অজ্ঞানতাবশতঃ ভাবী ঘটনার উপর কর্ত্তৃত্বের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এই ভাবী ফল প্রতীক্ষাই মনুষ্যের আশা ভরসা। সেই আশা ভরসাকে সহায় করিয়া আজ আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। তুমি বাড়ী চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি। বাটীর বাহিরে তুমি পা রাখিয়াছ বলিয়া, জনার্দ্দন চৌধুরী আর তোমাকে বিবাহ করিবেন না। সত্বর অন্য পাত্র সংঘটন হওয়াও সম্ভব নয়। তোমার পিতা ভ্রাতা যাহা কিছু তোমার লাঞ্ছনা করেন, এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া থাক। শুনিয়াছি, পশ্চিম অঞ্চলে অধিক বেতনে কর্ম্ম পাওয়া যায়। আমি এক্ষণে পশ্চিম চলিলাম। কাশীতে মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া, কর্ম্মের অনুসন্ধান করিব। এক বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা আনিয়া তোমার পিতাকে দিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তখন তোমার পিতা আহ্লাদের সহিত আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন। কেবল এক বৎসর, কঙ্কাবতী! দেখিতে দেখিতে

যাইবে। দুঃখে হউক সুখে হউক, ঘরে থাকিয়া, কোনও রূপে এই এক বৎসর কাল অতিবাহিত কর।”

তখন কঙ্কাবতী বলিলেন,—“তুমি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমি সেইরূপ করিব।”

দুই জনে ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে চলিলেন। রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, এমন সময় দুই জনে তনু রায়ের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খেতু বলিলেন,—“কঙ্কাবতী! তবে এখন আমি যাই! সাবধানে থাকিবে।”

‘যাই যাই’ করিয়াও খেতু যাইতে পারেন না। যাইতে খেতুর পা সরে না। দুই জনের চক্ষুর জলে তনু রায়ের দ্বার ভিজিয়া গেল।

একবার সাহসে ভর করিয়া খেতু কিছু দূর যাইলেন, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, আর বলিলেন,—“কঙ্কাবতী! একটী কথা তোমাকে ভাল করিয়া বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটী এই যে,—অতি সাবধানে থাকিও।”

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, চারি দিকে লোকের সাড়া-শব্দ হইতে লাগিল।

তখন খেতু বলিলেন,—“কঙ্কাবতী! এইবার আমি নিশ্চয় যাই। অতি সাবধানে থাকিবে। কাঁদিও কাটিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তো এক বৎসর পরে নিশ্চয় আমি আসিব। তখন আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে। তোমার মাকে সকল কথা বলিও, অন্য কাহাকে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।”

খেতু এইবার চলিয়া গেলেন। যত দূর দেখা যাইল, তত দূর কঙ্কাবতী সেই দিক্‌ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর, চক্ষুর জলে তিনি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইবার ভয়ে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে তিনি ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। খেতু ফিরিয়া দেখিলেন যে, চিত্র-পুত্তলির ন্যায় কঙ্কাবতী দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার পর আর দেখিতে পাইলেন না।

খেতু ভাবিলেন,—"হা জগদীশ্বর! মনুষ্য-হৃদয় তুমি কি পাষাণ দিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছ! যে, ঐ প্রভাহীনা মলিনা কাঞ্চন-প্রতিমাকে ওখানে ছাড়িয়া, এখানে আমার হৃদয় এখনও চূর্ণ বিচূর্ণ হয় নাই?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:০:—

বাঘ

খেতু চলিয়া যাইলে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে ঠেশ দিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বার ঠেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে, সাহসে বুক বাঁধিয়া, আস্তে আস্তে তিনি দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া, বাটীর ভিতর বসিয়া, তনু রায় তামাক খাইতেছিলেন। কে দ্বার ঠেলিতেছে, দেখিবার নিমিত্ত তিনি দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন, কঙ্কাবতী!

কঙ্কাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"এ কি? কঙ্কাবতী যে! তুমি মর নাই? তাই বলি, তোমার কি আর মৃত্যু আছে! এত দিন কোথায় ছিলে? আজ কোথা হইতে আসিলে? এতদিন যেখানে ছিলে, পুনরায় সেইখানে যাও। আমার ঘরে তোমার আর স্থান হইবে না!"

কঙ্কাবতী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। সেই মলিন আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা থাকিয়া, দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার কথায় কোনও উত্তর করিলেন না।

পিতার তর্জ্জন গর্জ্জনের শব্দ পাইয়া, পুত্রও সত্বর সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাই বলিলেন,—“এই যে, পাপীয়সী কালামুখ নিয়ে ফের এখানে এসেছেন! যাবেন আর কোন্ চুলো! কিন্তু তা হবে না, এ বাড়ী হইতে তোমার অন্ন উঠিয়াছে। এখন আর মনে করিও না যে, জনার্দ্দন চৌধুরী তোমাকে বিবাহ্ করিবে! বাবা! পাড়ার লোক জানিতে না জানিতে কুলাঙ্গারী পাপীয়সীকে দূর করিয়া দাও।”

বচসা শুনিয়া কঙ্কাবতীর দুই ভগ্নী বাহিরে আসিলেন। অবশেষে মা'ও আসিলেন। মা দেখিলেন, দুঃখিনী কঙ্কাবতী দীন দরিদ্র মলিন বেশে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী ও পুত্র তাঁহাকে বিধি-মতে ভৎ´সনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন।

কঙ্কাবতীর মা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। স্বামী কি পুত্র কাহারও পানে একবার চাহিলেন না। কঙ্কাবতীর বক্ষঃস্থল একবার আপনার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া গদ্গদ মৃদু-ভাষে বলিলেন,—“এস, আমাব মা এস! দুঃখিনী মাকে ভুলিয়া এত দিন কোথা ছিলে, মা?”

মার বুকে মাথা রাখিয়া কঙ্কাবতীর প্রাণ জুড়াইল। অন্তরে অন্তরে যে খরতর অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতেছিল, সে অগ্নি এখন অনেকটা নির্ব্বাণ হইল।

তাহার পর, মা, কঙ্কাবতীর একটী হাত ধরিলেন। অপর হাত দিয়া আর একটী মেয়ের হাত ধরিলেন। স্বামী ও পুত্রকে তখন সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“তোমরা কঙ্কাবতীকে দূর করিয়া দিবে? কঙ্কাবতীকে ঘরে স্থান দিবে না? বটে! এ দুধের বাছা কি হেন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে যে, বাপ মার কাছে ইহার স্থান

হইবে না? মান-সম্ভ্রম, পুণ্য-ধর্ম্ম লইয়া তোমরা এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমরা চারি জন হতভাগিনী এখান হইতে বিদায় হই। এস, মা, আমরা সকলে এখান হইতে যাই। দ্বারে দ্বারে আমরা মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবু এই মুনি ঋষিদের অন্ন আর খাইব না।"

তিন কন্যা ও মাতা, সত্য সত্যই বাটী হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন তনু রায়ের মনে ভয় হইল।

তনু রায় বলিলেন,—"গৃহিণী! কর কি? তুমিও যে পাগল হইলে দেখিতেছি! এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? এ মেয়ের কি আর বিবাহ হইবে? সেই জন্য বলি, ওর যেখানে দু'চক্ষু যায়, সেইখানে ও যাক্, ওর কথায় আর আমাদের থাকিয়া কাজ নাই।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে না? আচ্ছা, সে ভাবনা তোমার ভাবিয়া কাজ নাই। সে ভাবনা আমি ভাবিব। কিন্তু তোমার তো প্রকৃত সে চিন্তা নয়! তোমার চিন্তা যে, জনার্দ্দন চৌধুরীর টাকাগুলি হাত-ছাড়া হইল। যাহা হউক, তোমার গলগ্রহ হইয়া আর আমরা থাকিব না। যেখানে আমাদের দু'চক্ষু যায়, আমরা চারিজনে সেইখানে যাইব। মেয়ে তিনটীর হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে আমি ভিক্ষা করিব।"

স্ত্রীর এইরূপ উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তনু রায় ভাবিলেন,—"ঘোর বিপদ!" নানা রূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অনেকটা রাগ পড়িয়া আসিলে, শেষে তনু রায়

বলিলেন,—“দেখ! পাগলের মত কথা বলিও না! যাও, বাড়ীর ভিতর যাও। যাও, মা, কঙ্কাবতী বাড়ার ভিতর যাও।”

মা, কঙ্কাবতী ও ভগ্নীগণ বাটীর ভিতর যাইলেন। কঙ্কাবতী পুনরায় বাপ মা-র নিকট রহিলেন। বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমুদয় কথা কঙ্কাবতী মাকে বলিলেন। কঙ্কাবতী নিজে, কি কঙ্কাবতীর মা, এ সমুদয় কথা অন্য কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কঙ্কাবতীকে তনু রায় সর্ব্বদাই ভৎর্সনা করেন, সর্ব্বদাই গঞ্জনা দেন। কঙ্কাবতী সে কথায় কোনও উত্তর করেন না, অধোবদনে চুপ করিয়া শুনেন।

তনু রায় বলেন,—“এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপালে সুখ নাই, তা আমি কি করিব? জনার্দ্দন চৌধুরীকে কত বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিবেন না। এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? পঞ্চাশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না।”

স্ত্রী-পুরুষে, মাঝে মাঝে এই কথা লইয়া বিবাদ হয়। স্ত্রী বলেন,—“কঙ্কাবতীর বিবাহের জন্য তোমাকে কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। এক বৎসর কাল চুপ করিয়া থাক। কঙ্কাবতীর বিবাহ আমি নিজে দিব। যদি আমার কথা না শুন, যদি অধিক বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে মেয়ে তিনটীর হাত ধরিয়া তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইব।”

তনু রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্ত্রীকে এখন তিনি ভয় করেন, এখন স্ত্রীকে যা-ইচ্ছা তাই বলিতে বড় সাহস করেন না।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর দেখা নাই, খেতুর কোনও সংবাদ নাই। কঙ্কাবতীর মুখ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল, কঙ্কাবতীর মা'র মনে ঘোর চিন্তার উদয় হইল। কঙ্কাবতীর বিবাহ বিষয়ে স্বামী কোনও কথা বলিলে, এখন আর তিনি পূর্ব্বের মত দম্ভের সহিত উত্তর কবিতে সাহস করেন না। বৎসর শেষ হইয়া যতই দিন গত হইতে লাগিল, তনু রায়ের তিরস্কার ততই বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর মা অপ্রতিভ হইয়া থাকেন, বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

এক দিন সন্ধ্যার পর তনু রায় বলিলেন,—"এত বড় মেয়ে হইল, এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি ? সুপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও দুর্ঘট হইল।"

কঙ্কাবতীর মা উত্তর করিলেন,—"এক বৎসর অপেক্ষা করিলে, আর অল্প দিন অপেক্ষা কর। সুপাত্র শীঘ্রই মিলিবে।"

তনু রায় বলিলেন,—"আজ এক বৎসর ধরিয়া তুমি এই কথা বলিতেছ। কোথা হইতে তোমার সুপাত্র আসিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। তোমার কথা শুনিয়া আমি এই বিপদে পড়িলাম। সে দিন যদি কুলাঙ্গারীকে দূর করিয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ আর আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন দেখিতেছি, সে কালের রাজারা যা করিতেন, আমাকেও তাই করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ না হয়, চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। মনুষ্য না হয়, জীব জন্তুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি সত্য বলিতেছি, যদি এই মুহূর্ত্তে বনের বাঘ আসিয়া কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়. তো আমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিই। যদি এই মুহূর্ত্তে বাঘ আসিয়া বলে,—"রায় মহাশয়! দ্বার খুলিয়া দিন্" তো আমি তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিই!"

এই কথা বলিতে না বলিতে, বাহিরে ভীষণ গর্জ্জনের শব্দ হইল। গর্জ্জন করিয়া কে বলিল,—"রায় মহাশয়! তবে কি দ্বার খুলিয়া দিবেন না?"

সেই শব্দ শুনিয়া তনু রায় ভয় পাইলেন। কিসে এরূপ গর্জ্জন করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিবার নিমিত্ত আস্তে আস্তে দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখেন না, সর্ব্বনাশ! এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাহিরে দণ্ডায়মান!

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"রায় মহাশয়! এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন যে, ব্যাঘ্র আসিয়া যদি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রের সহিত আপনি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, এক্ষণে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিন্; না দিলে, এই মুহূর্ত্তে আপনাকে খাইয়া ফেলিব।"

তনু রায় অতি ভীত হইয়াছিলেন সত্য, ভয়ে এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তবুও আপনার ব্যবসাটী বিস্মরণ হইতে পারেন নাই।

তনু রায় বলিলেন,—"যখন কথা দিয়াছি, তখন অবশ্যই আপনার সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নড় চড় নাই। মুখ হইতে একবার কথা বাহির করিলে, সে কথা আর আমি কখনও অন্যথা করি না। তবে আমার নিয়ম তো জানেন? আমার কুল-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ করিতে পারেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই।"

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত হইলে আপনার কুল-ধর্ম্ম রক্ষা হয়?"

তনু রায় বলিলেন,—"আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জল খাই না। এরূপ ব্রাহ্মণের জামাতা হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। আমার জামাতা হইতে যদি মহাশয়ের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"তা বিলক্ষণ জানি! এখন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন তা বলুন।"

তনু রায় বলিলেন,—"এ গ্রামের জমিদার, মান্যবর শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল। দৈব ঘটনা বশতঃ কার্য্য সমাধা হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ দুই সহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপনি তাহার কিছুই নন; সুতরাং আপনাকে কিছু অধিক দিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"বাটীর ভিতর আসুন। আপনাকে আমি এত

টাকা দিব যে, আপনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই, জীবনে স্বপনে কখনও ভাবেন নাই।”

এই কথা বলিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে, ব্যাঘ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তনু রায়ের মনে তখন বড় ভয় হইল। তনু রায় ভাবিলেন, এইবার বুঝি সপরিবারকে খাইয়া ফেলে। নিরুপায় হইয়া তিনিও ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর যাইলেন।

বাহিরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া, এতক্ষণ কঙ্কাবতী, কঙ্কাবতীর মাতা ও ভগ্নীগণ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া ছিলেন। তনু রায়ের পুত্র তখন ঘরে ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গুণবিশিষ্ট পুত্র, তাই অনেক রাত্রি না হইলে তিনি বাটী ফিরিয়া আসেন না।

যেখানে কঙ্কাবতী প্রভৃতি বসিয়া ছিলেন, ব্যাঘ্র গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সকলের সম্মুখে তিনি একটী বৃহৎ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—“খুলিয়া দেখুন, ইহার ভিতর কি আছে!”

তনু রায় তোড়াটী খুলিলেন; দেখিলেন, তাহার ভিতর কেবল মোহর! হাতে করিয়া, চশমা নাকে দিয়া, আলোর কাছে লইয়া, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মেকি মোহর নয়, প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা! সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন যে, এত টাকা বাঘ কোথা হইতে আনিল? তনু রায়ের মনে আনন্দ আর ধরে না।

তনু রায় ভাবিলেন,—“এত দিন পরে এইবার আমি মনের মত জামাই পাইলাম।”

প্রদীপের কাছে লইয়া তনু রায় মোহরগুলি গণিতে বসিলেন।

এই অবসরে, ব্যাঘ্র ধীরে ধীরে কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতার নিকট গিয়া বলিলেন,—"কোনও ভয় নাই!"

কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতা চমকিত হইলেন। কার সে কণ্ঠস্বর, তাহা তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন। সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাদের প্রাণে সাহস হইল। কেবল সাহস কেন? তাঁহাদের মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। কঙ্কাবতীর মাতা মৃদুভাবে বলিলেন,—"হে ঠাকুর! যেন তাহাই হয়!"

ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া, পুনরায় তনু রায়ের নিকটে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিলেন। তোড়ার ভিতর হইতে তনু রায় তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা গণিয়া পাইলেন।

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে, এখন?"

তনু রায় উত্তর করিলেন,—"এখন আর কি? যখন কথা দিয়াছি, তখন এই রাত্রিতেই আপনার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। সে জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। আর মনে করিবেন না যে, ব্যাঘ্র বলিয়া আপনার প্রতি আমার কিছু মাত্র অভক্তি হইয়াছে। না না! আমি সে প্রকৃতির লোক নই। কারে কিরূপ মান সম্ভ্রম করিতে হয়, তাহা আমি ভালরূপ বুঝি। জনার্দ্দন চৌধুরী দূরে থাকুক, যদি জনার্দ্দন চৌধুরীর বাবা আসিয়া আজ আমার পায়ে ধরে, তবুও আপনাকে ফেলিয়া তাহার সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিই না।"

তাহার পর তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি আমার কথার

উপর কথা কহিও না, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে। আমি নিশ্চয় ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব। ইহার মত সুপাত্র আর পৃথিবীতে পাইব না। এ বিষয়ে আমি কাহারও কথা শুনিব না। যদি তোমরা কান্না-কাটি কর, তাহা হইলে এই ব্যাঘ্র মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এখনি তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি কোনও কথায় থাকিব না।"

যাঁহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা? সেই দণ্ডেই তনু রায় পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন, সেই দণ্ডেই প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই দণ্ডেই নাপিত পুরোহিত আসিলেন, সেই দণ্ডেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল।

সেই রাত্রিতেই ব্যাঘ্রের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। প্রকাণ্ড বনের বাঘকে জামাই করিয়া কার না মনে আনন্দ হয়? আজ তনু রায়ের মনে তাই আনন্দ আর ধরে না।

প্রতিবাসিনীদিগকে তিনি বলিলেন,—"আমার জামাইকে লইয়া তোমরা আমোদ আহ্লাদ করিবে। আমার জামাই যেন মনে কোনও-রূপ দুঃখ না করেন।"

জামাইকে তনু রায় বলিলেন,—"বাবাজি। বাসর ঘরে গান গাহিতে হইবে। গান শিখিয়া আসিয়াছ তো? এখানে কেবল হালুম্ হালুম করিলে চলিবে না। শালী শালাজ তাহা হইলে

কাণ মলিয়া দিবে। বাঘ বলিয়া তাহারা ছাড়িয়া কথা কবে না!"

বর না চোর! ব্যাঘ্র ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বাসর ঘরে গান গাহিয়াছিলেন কি না, সে কথা শালী শালাজ ঠানদিদিরা বলিতে পারেন। আমরা কি করিয়া জানিব?

প্রভাত হইবার পূর্ব্বে, ব্যাঘ্র তনু রায়কে বলিলেন,—"মহাশয়! রাত্রি থাকিতে থাকিতে জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে আমাকে পুনরাগমন করিতে হইবে। অতএব আপনার কন্যাকে সুসজ্জিতা করিয়া আমার সহিত পাঠাইয়া দিন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

প্রতিবাসিনীগণ কঙ্কাবতীর চুল বাঁধিয়া দিলেন। কঙ্কাবতীর মাতা, কঙ্কাবতীর ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া বাহির করিলেন।

তাহা দেখিয়া তনু রায় রাগে আরক্ত-নয়নে স্ত্রীকে বলিলেন,—"তোমার মত নির্ব্বোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। যাহার ঘরে এরূপ লক্ষ্মী-ছাড়া স্ত্রী, তাহার কি কখনও ভাল হয়? ভাল, বল দেখি? বাঘের কিসের অভাব? কাপড়ের দোকানে গিয়া হালুম্ করিয়া পড়িবে, দোকানী দোকান ফেলিয়া পলাইবে, আর বাঘ কাপড়ের গাঁঠরি লইয়া চলিয়া যাইবে। স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া বাঘ হালুম্ করিয়া পড়িবে, প্রাণের দায়ে স্বর্ণকার পলাইবে, আর বাঘ গহনাগুলি লইয়া চলিয়া যাইবে। দেখিয়া শুনিয়া যখন এরূপ সুপাত্রের হাতে কন্যা দিলাম, তখন আবার কঙ্কাবতীর সঙ্গে ভাল কাপড়-চোপড় দেওয়া কেন? তাই বলি, তোমার মত বোকা আর এ ভূ-ভারতে নাই।"

তনু রায় লক্ষ্মী-মন্ত পুরুষ, বৃথা অপব্যয় একেবারে দেখিতে পারেন

না। যখন তাঁহার মাতার ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয়, তখন মাতা বিছানায় শুইয়া ছিলেন। নাভিশ্বাস উপস্থিত হইলে, মাকে তিনি কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়া মাদুরে শয়ন করাইলেন। নিতান্ত পুরাতন নয়, এরূপ একখানি বস্ত্র তখন তাঁহার মাতা পরিয়া ছিলেন। কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইলে, সেই বস্ত্রখানি তনু রায় খুলিয়া লইলেন! আর, একখানি জীর্ণ ছিন্ন গলিত নেকড়া পরাইয়া দিলেন। এইরূপ টানা হেঁচ্ড়া করিতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, মৃত্যু সময়ে তিনি মাতার মুখে এক বিন্দু জল দিতে অবসর পান নাই। কাপড় ছাড়াইয়া, ভক্তিভাবে, যখন পুনরায় মাকে শয়ন করাইলেন, তখন দেখিলেন যে, মার অনেক ক্ষণ হইয়া গিয়াছে!

স্বামীর তিরস্কারে, তনু রায়ের স্ত্রী, দুই এক খানি ছেঁড়া-খোঁড়া নেকড়া-চোকড়া লইয়া একটী পুঁটলী বাঁধিলেন। সেইটী কঙ্কাবতীর হাতে দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, ঠাকুরদের ডাকিতে ডাকিতে, মেয়েকে বিদায় করিলেন!

কঙ্কাবতী ও বাঘ

তোমার কি ভয় করিতেছে ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:•:—

বনে

পুঁটলী হাতে করিয়া, কঙ্কাবতী ব্যাঘ্রের নিকট আসিয়া, অধো-বদনে দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্র মধুর ভাষে বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি বালিকা! পথ চলিতে পারিবে না। তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি তোমাকে লইয়া যাই। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না।"

কঙ্কাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া, বাঘের পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! আমার পিঠের লোম তুমি দৃঢ়রূপে ধর। দেখিও, যেন পড়িয়া যাইও না।"

কঙ্কাবতী তাহাই করিলেন। ব্যাঘ্র বনাভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিলেন।

বীজবন অরণ্যের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তোমার কি ভয় করিতেছে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"তোমার সহিত যাইব, তাতে আবার আমার ভয় কি?"

কঙ্কাবতী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু একেবারেই যে তাঁহার ভয় হয় নাই, তাহা নহে। বাঘের পিঠে তিনি আর কখনও চড়েন নাই, এই প্রথম। সুতরাং ভয় হইবার কথা।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কেন আমি বাঘ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে পরে বলিব। এ দশা হইতে শীঘ্রই আমি মুক্ত হইব, সে জন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই। এখন কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে দুই জনে যাইতে লাগিলেন। অবশেষে বৃহৎ এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নিকট গিয়া দুই জনে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কিছুক্ষণের নিমিত্ত তুমি চক্ষু বুজিয়া থাক। যতক্ষণ না আমি বলি, ততক্ষণ চক্ষু চাহিও না।"

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, 'খল্ খল্' করিয়া বিকট হাসির শব্দ কঙ্কাবতীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বিকট, কি ভয়ানক হাসি। ওরূপ করিয়া কে হাসিল?"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"সে কথা সব তোমাকে পরে বলিব। এখন শুনিয়া কাজ নাই। এখন তুমি চক্ষু উন্মীলন কর, আর কোনও ভয় নাই।"

কঙ্কাবতী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা এক মনোহর অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, বহুমূল্য মণি মুক্তায় অলঙ্কৃত, অতি সুরম্য অট্টালিকা। ঘরগুলি সুন্দর, পরিষ্কৃত, নানা ধনে পরিপূরিত, নানা সাজে সুসজ্জিত। রজত, কাঞ্চন, হীরা, মাণিক, মুকুতা, চারিদিকে রাশি রাশি স্তূপাকারে

রহিয়াছে দেখিয়া কঙ্কাবতী মনে মনে অদ্ভুত মানিলেন। অট্টালিকাটী কিন্তু পর্ব্বতের অভ্যন্তরে স্থিত। বাহির হইতে দেখা যায় না। পর্ব্বত-গাত্রে সামান্য একটী নিবিড় অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ দ্বারা কেবল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। পর্ব্বতের শিখর-দেশ হইতে অট্টালিকার ভিতর আলোক প্রবেশ করে। কিন্তু আলোক আসিবার পথও এরূপ কৌশল ভাবে নিবেশিত ও লুক্কায়িত আছে যে, সে পথ দিয়া ভূচর খেচর কেহ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, অট্টালিকার ভিতর হইতে কেহ বাহিরে যাইতেও পারে না। অট্টালিকার ভিতর, বসন ভূষণ খাট পালঙ্ক প্রভৃতি কোনও দ্রব্যেরই অভাব নাই। নাই কেবল আহারীয় সামগ্রী।

অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! এখন তুমি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কর। একটু খানি এই খানে বসিয়া থাক, আমি আসিতেছি। কিন্তু সাবধান! এখানকার কোনও দ্রব্যে হাত দিও না, কোনও দ্রব্য লইও না। যাহা আমি হাতে করিয়া দিব, তাহাই তুমি লইবে, আপনাআপনি কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিবে না।"

এইরূপ সতর্ক করিয়া ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খেতু আসিয়া কঙ্কাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! আমাকে চিনিতে পার?"

কঙ্কাবতী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

খেতু পুনরায় বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! এই বনের মাঝখানে আসিয়া তোমার কি ভয় করিতেছে?"

কঙ্কাবতী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"না, আমার ভয় করে নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার ঘোমটা দেওয়া উচিত, লজ্জা করা উচিত। তাহা আমি পারিতেছি না। তাই আমি ভাবিতেছি। তুমি কি মনে করিবে!"

খেতু বলিলেন,—"না, কঙ্কাবতী! আমাকে দেখিয়া তোমার ঘোমটা দিতে হইবে না, লজ্জা করিতে হইবে না। আমি কিছু মনে করিব না, তাহার জন্য তোমার ভাবনা নাই। আর এখানে কেবল তুমি আর আমি, অন্য কেহ নাই, তাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? তাও বটে, আবার এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিপদের আশঙ্কা বিলক্ষণরূপ আছে।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বিপদ?"

খেতু বলিলেন,—"এখন সে কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই। তাহা হইলে তুমি ভয় পাইবে। এখন সে কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তবে, এখন তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি তুমি এখানকার দ্রব্য সামগ্রী স্পর্শ না কর, তাহা হইলে কোনও ভয় নাই, কোনও বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেটী আমি হাত তুলিয়া দিব, সেইটী লইবে, নিজ হাতে কোনও দ্রব্য লইবে না। এই বৎসর কাল আমাদিগকে এই খানে থাকিতে হইবে। তাহার পর, এ সমুদয় ধন সম্পত্তি আমাদের হইবে। এই সমুদয় ধন লইয়া তখন আমরা দেশে যাইব।

আচ্ছা! কঙ্কাবতী! যখন আমি তোমাকে বিবাহ করি, তখন তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলে ?”

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—“তা আর পারিনি ? এক বৎসর কাল তোমার জন্য পথ পানে চাহিয়া ছিলাম। যখন এক বৎসর গত হইয়া গেল, তবুও তুমি আসিলে না, তখন মা আর আমি, হতাশ হইয়া পড়িলাম। মা যে কত কাঁদিতেন, আমি যে কত কাঁদিতাম, তা আর তোমাকে কি বলিব! কা’ল রাত্রিতে বাবা যখন বলিলেন যে,—‘বাঘের সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব,’ আর সেই কথায় তুমি যখন বাহির হইতে বলিলে,—‘তবে কি মহাশয়! দ্বার খুলিয়া দিবেন ?’ সেই গর্জ্জনের ভিতর হইতেও একটু যেন বুঝিলাম যে, সে কার কণ্ঠ-স্বর! তার পর আবার, ঘরের ভিতর আসিয়া, যখন তুমি চুপি-চুপি মা’র কানে ও আমার কানে বলিলে,—‘কোনও ভয় নাই’ তখন তো নিশ্চয় বুঝিলাম যে, তুমি বাঘ নও।”

খেতু বলিলেন,—“অনেক দুঃখ গিয়াছে। কঙ্কাবতী! তুমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছ, আমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছি। আর এক বৎসর কাল দুঃখ সহিয়া এই খানে থাকিতে হইবে! তাহার পর ঈশ্বর যদি কৃপা করেন, তো আমাদের সুখের দিন আসিবে। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাল কাটিয়া যাইবে। তখন এই সমুদয় ঐশ্বর্য্য আমাদের হইবে। আহা! মা নাই, এত ধন লইয়া যে কি করিব? তাই ভাবি। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহা কিছু পুণ্য কর্ম্ম আছে, সমস্ত আমি

মাকে করাইতাম। যাহা হউক, পৃথিবীতে অনেক দীন দুঃখী আছে। কঙ্কাবতী! এখন কেবল তুমি আর আমি! যতদূর পারি, দুই জনে জগতের দুঃখ মোচন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতার সৎকার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আমাকে বাটীতে রাখিয়া, তাহার পর তুমি কোথায় যাইলে? কি করিলে? ফিরিয়া আসিতে তোমার এক বৎসরের অধিক হইল কেন? তুমি ব্যাঘ্রের আকার ধরিলে কেন? সে সব কথা তুমি আমাকে এখন বলিবে না?"

খেতু বলিলেন,—"না, কঙ্কাবতী! এখন নয়। এক বৎসর গত হইয়া যাক্, তাহার পর সব কথা তোমাকে বলিব।"

কঙ্কাবতী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কঙ্কাবতী ও খেতু, পর্ব্বত-অভ্যন্তরে সেই অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। অট্টালিকার কোনও দ্রব্য কঙ্কাবতী স্পর্শ করেন না। কেবল খেতু যাহা হাতে করিয়া দেন, তাহাই গ্রহণ করেন।

অট্টালিকার ভিতর সমুদয় দ্রব্য ছিল, কেবল খাদ্য সামগ্রী ছিল না। প্রতিদিন বাহিরে যাইয়া, খেতু বনের ফল মূল লইয়া আসেন, তাহাই দুই জনে আহার করিয়া কাল যাপন করেন। বাহিরে যাইতে হইলে, খেতু ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন। বাঘ না হইয়া খেতু কখনও বাহিরে যান না। আবার, অট্টালিকার ভিতর আসিয়া, খেতু পুনরায় মনুষ্য হন। কেন তিনি বাঘের রূপ না ধরিয়া বাহিরে যান না, কঙ্কাবতী তাহা বুঝিতে পারেন না। খেতু মানা করিয়াছেন, সে জন্য জিজ্ঞাসা করিবারও যো নাই।

এইরূপে দশ মাস কাটিয়া গেল।

এক দিন কঙ্কাবতী বলিলেন,—"অনেক দিন মাকে দেখি নাই। মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। মা'ও আমাদের কোনও সংবাদ পান নাই। মা'ও হয় তো চিন্তিত আছেন। আমরা কোথায় যাইলাম, কি করিলাম, মা তাহার কিছুই জানেন না।"

খেতু উত্তর করিলেন,—"অল্প দিনের মধ্যে পুনরায় দেশে যাইব, সে জন্য আর তাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ দিই নাই। আর, লোকালয়ে যাইতে হইলেই আমাকে বাঘ হইয়া যাইতে হইবে, সে জন্য যাইতে বড় ইচ্ছাও হয় না। কি জানি? কখন কি বিপদ ঘটে! বলিতে তো পারা যায় না! যাহা হউক, মাকে দেখিতে যখন তোমার সাধ হইয়াছে, তখন কা'ল তোমার এ সাধ পূর্ণ করিব। কা'ল সন্ধ্যার সময়, মা'র নিকট তোমাকে আমি লইয়া যাইব। কঙ্কাবতী! বৎসর পূর্ণ হইতে আর কেবল দুই মাস আছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই দুই মাস তুমি না হয় বাপের বাড়ী থাকিও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"না, তা আমি থাকিতে চাই না! তুমি এই বনের ভিতর, নানা বিপদের মধ্যে, একেলা থাকিবে, আর আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তা' কি কখনও হয়? মার জন্য মন উতলা হইয়াছে,—কেবল একবারখানি মাকে দেখিতে চাই; দেখা-শুনা করিয়া আবার তখনি ফিরিয়া আসিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:০:—

শ্বশুরালয়

তাহার পরদিন সন্ধ্যাবেলা, খেতু ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া, কঙ্কাবতীকে তাঁহার পিঠে চড়িতে বলিলেন। অট্টালিকা হইতে অনেকগুলি টাকা কড়ি লইয়া কঙ্কাবতীকে দিলেন, আর বলিলেন যে, "এই টাকা গুলি তোমার মাতা, পিতা, ভাই ও ভগিনীদিগকে দিবে।"

অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া, দুই জনে অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের পথে চলিলেন। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার সময় খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! চক্ষু মুদ্রিত কর। যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চক্ষু চাহিও না।"

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। পুনরায় সেই বিকট হাসি শুনিতে পাইলেন। সেই ভয়াবহ হাসি শুনিয়া আতঙ্কে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া, বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, খেতু কঙ্কাবতীকে চক্ষু চাহিতে বলিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে গ্রামের দিকে ছুটিলেন। প্রায় এক প্রহর রাত্রির সময়, ঝি-জামাতা, তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতীকে পাইয়া, কঙ্কাবতীর মা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া

পাইলেন। কঙ্কাবতীর ভগিনীগণও, কঙ্কাবতীকে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন। অনেক টাকা মোহর দিয়া ব্যাঘ্র, তনু রায়কে নমস্কার করিলেন। শ্যালককেও তিনি অনেক টাকা-কড়ি দিলেন। ব্যাঘ্রের আদর রাখিতে আর স্থান হয় না।

মা, পঞ্চোপচারে কঙ্কাবতীকে আহারাদি করাইলেন। তনু রায়ের ভাবনা হইল,—"জামাতাকে কি আহার করিতে দিই ?"

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, মনে মনে অনেক বিচার করিয়া তনু রায় বলিলেন,—"বাবাজী! এত পথ আসিয়াছ, ক্ষুধা অবশ্যই পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঘরে কেবল ভাত-ব্যঞ্জন আছে, আর কিছু নাই। ভাতব্যঞ্জন কিছু তোমার খাদ্য নয়। তাই ভাবিতেছি,—তোমাকে খাইতে দিই কি ? তা, তুমি এক কর্ম্ম কর। আমার গোয়ালে একটী বৃদ্ধা গাভী আছে। সময়ে সে দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এখন আর তাহার বৎস হয় না, এখন আর সে দুধ দেয় না। বৃথা কেবল বসিয়া খাইতেছে। তুমি সেই গাভীটাকে আহার কর। তাহা হইলে, তোমারও উদর পূর্ণ হইবে, আমারও জামাতাকে আদর করা হইবে; আর মিছামিছি আমাকে খড় যোগাইতে হইবে না।"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"না মহাশয়! আজ দিনের বেলা আমি উত্তমরূপে আহার করিয়াছি। এখন আর আমার ক্ষুধা নাই।—গাভীটী এখন আমি আহার করিতে পারিব না।"

তনু রায় বলিলেন,—"আচ্ছা! যদি তুমি গাভীটী না খাও, তাহা হইলে না হয়, আর একটী কাজ কর। তুমি নিরঞ্জন

কবিরত্নকে খাও। তাহার সহিত আমার চির-বিবাদ। সে শাস্ত্র জানে না, তবু আমার সহিত তর্ক করে। তাহাকে আমি দুটা চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারি না। সে এ গ্রাম হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মামার বাড়ীতে গিয়া আছে। আমি তোমায় সব সন্ধান বলিয়া দিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া তাহাকে খাইয়া আইস।”

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—“না মহাশয়! আজ রাত্রিতে আমার কিছু মাত্র ক্ষুধা নাই। আজ রাত্রিতে আমি নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাইতে পারিব না।

তনু রায় পুনর্ব্বার বলিলেন,—“আচ্ছা! ততদূর যদি না যাইতে পার, তবে এই গ্রামেই তোমার আমি খাবার ঠিক করিয়া দিতেছি। এই গ্রামে এক গোয়ালিনী আছে। মাগী বড় দুষ্ট। দুবেলা আসিয়া আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। তোমাকে কন্যা দিয়াছি বলিয়া মাগী আমাকে যা' নয় তা'ই বলে। মাগি আমাকে বলে,—“অল্পায়ু, বুড়ো, ডোক্‌রা! টাকা নিয়ে কি না বাঘকে মেয়ে বেচে খেলি!' তুমি আমার জামাতা, ইহার একটা প্রতিকার তোমাকে করিতে হইবে! তুমি তার ঘাড়টী ভাঙ্গিয়া রক্ত খাও। তার রক্ত ভাল, খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে।”

ব্যাঘ্র বলিলেন,—“না মহাশয়! আজ আমি কিছু খাইতে পারিব না, আজ ক্ষুধা নাই।”

তনু রায় ভাবিলেন,—“জামাতারা কিছু লজ্জাশীল হন। বার বার 'খাও খাও' বলিতে হয়, তবে কিছু খান্। খাইতে বসিয়া,

'এটী খাও, ওটী খাও, আর একটু খাও,' এইরূপ পাঁচজনে বার বার না বলিলে, জামাতারা পেট ভরিয়া আহার করেন না। পাতে সব ফেলিয়া উঠিয়া যান। এদিকে জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে, ওদিকে মুখে বলেন,—'আর ক্ষুধা নাই, আর খাইতে পারি না।' জামাতাদিগের রীতি এই।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তনু রায় আবার বলিলেন,—"শ্বশুরবাড়ী আসিয়া কিছু না খাওয়া কি ভাল? লোকে আমার নিন্দা করিবে। পাড়ার লোকগুলির কথা তোমাকে আর কি পরিচয় দিব! পাড়ার মেয়ে-পুরুষগুলি এক একটী সব অবতার! তামাসা দেখিতে খুব প্রস্তুত; পরের ভাল একটু দেখিতে পারেন না। তুমি আমার জামাতা হইয়াছ, যা'ই হউক, তোমার দু পয়সা সঙ্গতি আছে, এই হিংসায় সকলে ফাটিয়া মরিতেছেন। এখনি কা'ল সকলে বলিবেন যে, 'তনু রায়ের জামাতা আসিয়াছিল, তনু রায় জামাতার কিছু মাত্র আদর করে নাই, এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খাইতে দেয় নাই।' সেই জন্য কিছু খাইতে তোমাকে বার বার অনুরোধ করিতেছি। চল, গোয়ালিনীর ঘর তোমাকে দেখাইয়া দিই। সে দুধ ঘি খায়। মাংস তাহার কোমল। তাহার মাংস তোমার মুখে ভাল লাগিবে। খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। যে-সে দ্রব্য কি তোমাকে খাইতে বলিতে পারি?"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"এবার মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। এই বার যখন আসিব, তখন দেখা যাইবে।"

তনু রায় মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। জামাতা আদরের সামগ্রী।

প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে না পারিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে ক্লেশ হয়। তিন তিনটী সুখাদ্যের কথা বলিলেন, জামাতা কিন্তু একটীও খাইলেন না। তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কথা।

তনু রায় বলিলেন,—"শ্বশুরবাড়ীতে এরূপ খাইয়া দাইয়া আসিতে নাই। শ্বশুব-শাশুড়ীর মন তাহাতে বুঝিবে কেন? জামাতা কিছু না খাইলে, শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে দুঃখ হয়। এই, আজ তুমি কিছু খাইলে না, সে জন্য তোমার শাশুড়ীঠাকুরাণী আমাকে কত বকিবেন। তিনি বলিবেন,—'তুমি জামাতাকে ভাল করিয়া বল নাই, তাই জামাতা আহার করিলেন না।' এবার যখন আসিবে, তখন আহারাদি করিয়া আসিও না। এই খানে আসিয়া আহাব করিবে। তোমার জন্য এই তিনটী খাদ্য-সামগ্রী আমি ঠিককরিয়া রাখিলাম। এবার আসিয়া একেবাবে তিনটিকেই খাইতে হইবে। যদি না খাও, তাহা হইলে বনে যাইতে দিব না, তোমার চাদর ও ছাতি লুকাইয়া রাখিব। না না! ও কথা নয়! তোমার যে আবার ছাতি কি চাদর নাই! যদি না খাও, তাহা হইলে তোমার উপর আমি রাগ করিব।"

কঙ্কাবতী, সমস্ত রাত্রি মা ও ভগ্নীদিগের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র প্রকৃত কে, তাহা মাতাকে বলিলেন। আর, দুই মাস পরে তাঁহারা যে বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া দেশে আসিবেন, তাহাও মাতাকে বলিলেন।

তনু রায়, একবার কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! বোধ হইতেছে যে জামাতা আমার প্রকৃত ব্যাঘ্র

নন। বনের শিকড় মাথায় দিয়া মানুষে যে সেই বাঘ হয়, ইনি বোধ হয় তাই। আমি ইঁহাকে নানারূপ সুখাদ্য খাইতে বলিলাম। আমার গোয়ালের বুড়ো গরুটীকে খাইতে বলিলাম, নিরঞ্জনকে খাইতে বলিলাম, গোয়ালিনীকে খাইতে বলিলাম, কিন্তু ইনি ইহার একটীকেও খাইলেন না। যথার্থ বাঘ হইলে কি এ সব লোভ সামলাইতে পারিতেন? তাই আমার বোধ হইতেছে, ইনি প্রকৃত বাঘ নন। তুমি দেখিও দেখি? ইঁহার মাথায় কোনও-রূপ শিকড় আছে কি না? যদি শিকড় পাও, তাহা হইলে সেই শিকড়টী দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। যদি লোকে মন্দ করিয়া থাকে, তো শিকড়টী পোড়াইলেই ভাল হইয়া যাইবে। যে কারণেই কেন বাঘ হইয়া থাকুন না, শিকড়টী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে। তখন পুনরায় মানুষ হইয়া ইনি লোকালয়ে আসিবেন!"

পিতার এই উপদেশ পাইয়া, কঙ্কাবতী যখন পুনরায় মা'র নিকট আসিলেন, তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উনি তোমাকে চুপি চুপি কি বলিলেন?"

পিতা যেরূপ উপদেশ দিলেন, কঙ্কাবতী সে সমস্ত কথা মা'র নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি এ কাজ কখনও করিবে না। করিলে নিশ্চয় মন্দ হইবে। খেতু অতি ধীর ও সুবুদ্ধি। খেতু যাহা করিতেছেন, তাহা ভালর জন্যই করিতেছেন। খেতুর আজ্ঞা তুমি কোন মতেই অমান্য করিও

না। সাবধান, কঙ্কাবতী। আমি যাহা বলিলাম, মনে যেন থাকে !”

রাত্রি অবসান-প্রায় হইলে, খেতু ও কঙ্কাবতী পুনরায় বনে চলিলেন। পর্ব্বতের নিকটে আসিয়া, খেতু পূর্ব্বের মত কঙ্কাবতীকে চক্ষু বুজিতে বলিলেন। সুড়ঙ্গ-দ্বারে পূর্ব্বের মত কঙ্কাবতী সেই বিকট হাসি শুনিলেন। অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের মত ইঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

—:০:—

শিকড়

আর একমাস গত হইয়া গেল।

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কেবল আর এক মাস রহিল। এই এক মাস পরে আমরা স্বাধীন হইব। আর এক মাস গত হইয়া যাইলে, আমাদিগকে আর বনবাসী হইয়া থাকিতে হইবে না। এই বিপুল বিভব লইয়া আমরা তখন দেশে যাইব।"

এক একটী দিন যায়, আর খেতু বলেন,—"কঙ্কাবতী! আর উনত্রিশ দিন রহিল; কঙ্কাবতী! আর আটাইশ দিন রহিল; কঙ্কাবতী! আর সাতাইশ দিন রহিল।"

এইরূপে কুড়ি দিন গত হইয়া গেল। কেবল আর দশ দিন রহিল। দশ দিন পরে কঙ্কাবতীকে লইয়া দেশে যাইবেন; সে জন্য খেতুর মনে অসীম আনন্দের উদয় হইল! খেতুর মুখে সদাই হাসি!

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি এক কর্ম্ম কর। কয়লা দ্বারা এই প্রাচীরের গায়ে দশটী দাগ দিয়া রাখ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া একটী করিয়া দাগ পুঁছিয়া ফেলিব, তাহা হইলে সম্মুখে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ দেখিব, ক-দিন আর বাকি রহিল।"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে,—"দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর মন বড়ই আকুল হইয়াছে। প্রাচীরে তো দশটী দাগ দিলাম, যেমন এক একটী দিন যাইবে, তেমনি এক একটী দাগ তো মুছিয়া ফেলিলাম; তা তো সব হইবে! কিন্তু এক দিনেই কি দশটী দিন মুছিয়া ফেলিতে পারি না? এক দিনেই কি স্বামীর উদ্ধার করিতে পারি না? বাবা যা বলিয়া দিয়াছেন, তাই করিয়া দেখিলে তো হয়। আজ কি কা'ল যদি দেশে যাইতে পান, তাহা হইলে আমার স্বামীর মনে কতই না আনন্দ হইবে!"

এই দুই মাসের মধ্যে, পিতার কথা তাঁহার অনেকবার স্মরণ হইয়াছিল। মন্দ লোকে তাঁহার স্বামীকে গুণ করিয়াছে, এই চিন্তা তাঁহার মনে বারবার উদয় হইয়াছিল। তবে মা বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সে জন্য এত দিন তিনি কোনও রূপ প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। এক্ষণে দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর ঘোরতর ব্যগ্রতা দেখিয়া, কঙ্কাবতীর মন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"বাবা, পুরুষ মানুষ! পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, বাঘ-ভাল্লুক, শিকড়-মাকড়, তন্ত্র-মন্ত্র, এ সকলের কথা বাবা যত জানেন, মা তত কি করিয়া জানিবেন? মা, মেয়ে মানুষ, ঘরের বাহিরে যান না। মা কি করিয়া জানিবেন যে, লোকে শিকড় দিয়া মন্দ করিলে তাহার কি উপায় করিতে হয়? শিকড়টী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সকল বিপদ কাটিয়া

যায়, বাবা এই কথা বলিয়াছেন। এখনও দশ দিন আছে, স্বামী আমার দিন গণিতেছেন। যদি কাল তিনি বাড়ী যাইতে পান, তাহা হইলে তাঁর কত না আনন্দ হইবে!"

এইরূপ কঙ্কাবতী সমস্ত দিন ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে ভাবেন,—"কি জানি, পাছে ভাল করিতে গিয়া মন্দ হয়! কাজ নাই, এ দশটা দিন চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকি। বাবা যাহা করিতে বলিয়াছেন, মা তাহা বারণ করিয়াছেন।"

আবার ভাবেন,—"দুষ্টেরা আমার স্বামীর মন্দ করিয়াছে। দুষ্টদিগের দুরভিসন্ধি হইতে স্বামীকে আমি মুক্ত করিব। আমি যদি স্বামীকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কত না আমার উপর পরিতুষ্ট হইবেন!"

ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। কি করিবেন, কঙ্কাবতী কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রিতেও কঙ্কাবতী এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিলকসুন্দরী ও ভুশকুমড়োর গল্প মনে পড়িল।

রাজপুত্র, তিলকসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিলকসুন্দরীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন হইয়াছিল। তিলকসুন্দরীর সৎ-মা তাহার মাথায় একটী শিকড় দিয়া দিলেন। শিকড়ের গুণে তিলকসুন্দরী পক্ষী হইয়া গেল। উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে বসিল। সৎ-মা কৌশল করিয়া আপনার মেয়ে ভুশকুমড়োর সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন। ভুশকুমড়োকে রাজপুত্র আদর করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তিলকসুন্দরী

গাছের ডাল হইতে বলিল,—“ভুশকুমড়ো কোলে। তিলকসুন্দরী ডালে!!” রাজপুত্র মনে করিলেন,—“পাখিটী কি বলে?” রাজপুত্র সেই পাখিটীকে ডাকিলেন। পাখিটী আসিয়া রাজপুত্রের হাতে বসিল। সুন্দর পাখিটী দেখিয়া, রাজপুত্র তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। হাত বুলাইতে বুলাইতে মাথার শিকড়টী পড়িয়া গেল। পাখি তখন পুনরায় তিলকসুন্দরী হইল। রাজপুত্র তখন সৎ-মার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। সৎ-মার কন্যা ভুশকুমড়োকে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিলেন। তিলকসুন্দরীকে লইয়া সুখে ঘর-কন্না করিতে লাগিলেন।

কঙ্কাবতীর সেই তিলকসুন্দরীর কথা এখন মনে হইল। আরব্য-উপন্যাসে এই ভাবের যে গল্প আছে, তাহাও তাঁর মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন,—“দুষ্টগণ শিকড়ের দ্বারা এইরূপে লোকের মন্দ করে। আচ্ছা যাই, দেখি দেখি, আমার স্বামীর মাথায় কোনও রূপ শিকড় আছে কি না?”

এই মনে করিয়া তিনি অন্য ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিলেন। বাতিটী হাতে করিয়া, শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া, খেতুর মাথায় শিকড়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খেতু ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। খেতু ইহার কিছুই জানেন না।

সর্ব্বনাশ! অনুসন্ধান করিতে করিতে কঙ্কাবতী খেতুর মাথায় একটী শিকড় দেখিতে পাইলেন। “বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাই! দুষ্ট-লোকদিগের একবার দুরভিসন্ধি দেখ! ভাগ্যক্রমে

সর্ব্বনাশ! বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাই!

আজ আমি মাথাটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। তা না হইলে কি হইত?”

কঙ্কাবতী, শিকড়টী খেতুর মাথা হইতে খুলিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিকড়টী মাথার চুলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, খুলিয়া লইতে পারিলেন না। পাছে খেতু জাগিয়া উঠেন, এই ভয়ে আর অধিক বল প্রয়োগ করিলেন না। পুনরায় অপর ঘরে গিয়া, সেখান হইতে কাঁচি লইয়া আসিলেন। চুলের সহিত শিকড়টী খেতুর মাথা হইতে কাটিয়া লইলেন। শিকড়টী তৎক্ষণাৎ বাতির অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

শিকড় পুড়িয়া ঘরের ভিতর অতি ভয়ানক তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হইল। সেই গন্ধে, কঙ্কাবতীর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে কঙ্কাবতী বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

চমকিয়া খেতু জাগরিত হইলেন! মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন যে, শিকড় নাই! ভয়ে বিহ্বলা, কম্পিত-কলেবরা, জ্ঞানহীনা, কঙ্কাবতীকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিলেন। অচেতন হইয়া, কঙ্কাবতী ভূতলশায়িনী হন আর কি, এমন সময় খেতু উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। বাতিটী তাঁহার হাত হইতে লইয়া, কঙ্কাবতীকে আস্তে আস্তে বসাইলেন। কঙ্কাবতীর মুখে জল দিয়া, কঙ্কাবতীকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সুস্থ হইয়া কঙ্কাবতী বলিলেন,—“আমি যে ঘোর কু-কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।”

এই কথা বলিয়া, কঙ্কাবতী অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। প্রথম তো অদৃষ্টের দোষ। তা না হইলে এত দিন গিয়া আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন? তাহার পর আমার দোষ। আমি যদি আদ্যোপান্ত সকল কথা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতাম, যদি তোমার নিকট কিছু গোপন না করিতাম, তাহা হইলে এ কাজ তুমি কখনই করিতে না, আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। শিকড়টী কি বাতির আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছ?"

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"হাঁ! শিকড়টী দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি।"

খেতু বলিলেন,—"তবে এখন তোমাকে বুকে সাহস বাঁধিতে হইবে। স্ত্রীলোক, বালিকার মত এখন আর কাঁদিলে চলিবে না। এই জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে তুমি একাকিনী। তোমার জন্যই প্রাণ আমার নিতান্ত আকুল হইয়াছে। কঙ্কাবতী! প্রকৃত যাহারা পুরুষ হয়, মরিতে তাহারা ভয় করে না। অনাথিনী স্ত্রী প্রভৃতি পোষ্যদিগের জন্যই তাহারা কাতর হয়।"

ব্যস্ত হইয়া কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? কি? আমাদের কি বিপদ হইবে? কি বিপদের আশঙ্কা তুমি করিতেছ?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"কঙ্কাবতী! যদি গোপন করিবার সময় থাকিত, তাহা হইলে আমি গোপন করিতাম। কিন্তু গোপন করিবার আর সময় নাই! তোমাকে একাকিনী এস্থান হইতে বাটী

ফিরিয়া যাইতে হইবে। সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঠিক উত্তরমুখে যাইবে। প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্য উদয় হইবে, সূর্য্যকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া চলিলেই তুমি গ্রামে গিয়া পৌঁছিবে।”

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর তুমি ?”

খেতু বলিলেন,—“আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি এস্থানের দ্রব্য ছুঁইয়াছি, এখান হইতে আমি টাকা কড়ি লইয়াছি, সুতরাং আমি এখান হইতে আর যাইতে পারিব না। আমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে। সেইজন্য এখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতে তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না। অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া সুড়ঙ্গ-পথে গমন করিবে। পর্ব্বতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোনও গাছতলায় রাত্রিটী যাপন করিবে। যখন প্রাতঃকাল হইবে, সূর্য্য উদয় হইবে, তখন কোন্ দিক উত্তর অনায়াসেই জানিতে পারিবে। উত্তর মুখে যাইলেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইবে। কঙ্কাবতী আর বিলম্ব করিও না।”

কঙ্কাবতী বলিলেন,—“এস্থান হইতে আমি যাইব ? তোমাকে এই খানে রাখিয়া আমি এখান হইতে যাইব ? এমন কথা তুমি কি করিয়া বলিলে ? আমি ঘোরতর কুকর্ম্ম করিয়াছি সত্য। আমি অপরাধিনী সত্য, আমি হতভাগিনী ! কিন্তু তা’ বলিয়া কি আমাকে দূর করিতে হয় ? আমি বালিকা, আমি অজ্ঞান, আমি জানি না ; না জানিয়া একাজ করিয়াছি, ভাল ভাবিয়া মন্দ করিয়াছি। আমার কি আর ক্ষমা নাই !”

খেতু উত্তর করিলেন,—“কঙ্কাবতী ! তোমার উপর আমি রাগ

করি নাই। রাগ করিয়া তোমাকে বলি নাই যে, 'তুমি এখান হইতে যাও।' বড় বিপদের কথা, বড় নিদারুণ কথা, কি করিয়া তোমাকে বলি? এখান হইতে তোমাকে যাইতে হইবে,—কঙ্কাবতী! নিশ্চয় তোমাকে এখান হইতে যাইতে হইবে, আর এখনি যাইতে হইবে; বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখন তুমি পিতার বাটীতে গিয়া থাক, লোক-জন সঙ্গে করিয়া দশ দিন পরে পুনর্ব্বার এই বনের ভিতর আসিও। এই অট্টালিকার ভিতর যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, তাহা লইয়া যাইও। দশ দিন পরে লইলে কোন'ও ভয় নাই, তখন তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। এই ধন-সম্পত্তি চারি ভাগ করিবে। একভাগ তোমার পিতাকে দিবে, এক ভাগ রামহরি দাদা মহাশয়কে দিবে, এক ভাগ নিরঞ্জন কাকাকে দিবে, আর এক ভাগ তুমি লইবে। ব্রত-নিয়ম, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দান-ধ্যান করিয়া জীবন যাপন করিবে। মনুষ্য জীবন কয়দিন? কঙ্কাবতী! দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। তাহার পর, এখন আমি যেখানে যাইতেছি, সেই খানে তুমিও যাইবে; দুই জনে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তোমার কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, প্রাণে বড় ভয় হইতেছে। হায়! আমি কি করিলাম! কি বিপদের কথা? কি নিদারুণ কথা? এখন কোথায় তুমি যাইবে? আমাকে ভাল করিয়া সকল কথা তুমি বল।"

খেতু বলিলেন,—"তবে শুন। এই অট্টালিকার ভিতর যা ধন দেখিতেছ, ইহার প্রহরিণী স্বরূপ নাকেশ্বরী নাম-ধারিণী এক ভয়ঙ্করী

ভূতিনী আছে। সুড়ঙ্গের দ্বারে সর্ব্বদা সে বসিয়া থাকে। সেই যে খল খল বিকট হাসি তুমি শুনিয়াছিলে, সে হাসি এই নাকেশ্বরীর। যে কেহ তাহার এই ধন স্পর্শ করিবে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। আমি এই ধন লইয়াছি। কিন্তু, যে শিকড়টী তুমি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ, সেই শিকড়ের দ্বারা এতদিন আমি রক্ষিত হইতেছিলাম। তা' না হইলে এতদিন কোন কালে নাকেশ্বরী আমাকে খাইয়া ফেলিত! শিকড় নাই, একথা নাকেশ্বরী এখনও বোধ হয় জানিতে পারে নাই। কিন্তু শীঘ্রই সে জানিতে পারিবে। জানিতে পারিলেই সে এখানে আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে। নাকেশ্বরীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই। এক তো এখান হইতে বাহিরে যাইবার অন্য উপায় নাই। তা থাকিলেও কোনও লাভ নাই। বনে যাই কি জলে যাই, গ্রামে যাই কি নগরে যাই, যেখানে যাইব, নাকেশ্বরী সেই খানে গিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে।"

এই কথা শুনিয়া, কঙ্কাবতী খেতুর পা দুটী ধরিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন।

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কাঁদিও না। কাঁদিলে আর কি হইবে? যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিল। সকলি তাঁহার ইচ্ছা। উঠ, যাও। আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ দিয়া বাহিরে যাও। এখনি নাকেশ্বরী এখানে আসিয়া পড়িবে। তাহাকে দেখিলে তুমি ভয় পাইবে। যাও, বাড়ী যাও; মা'র কাছে যাইলে, তবু তোমার প্রাণ অনেকটা সুস্থ হইবে।"

কঙ্কাবতী উঠিয়া বসিলেন। আরক্ত-নয়নে, আরক্ত-বদনে

কঙ্কাবতী উঠিয়া বসিলেন। কঙ্কাবতীর মৃদু মনোমুগ্ধকারিণী সেই রূপ-মাধুরী উগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া, এখন অন্য প্রকার এক সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হইল।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া যাইব? তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া নাকেশ্বরীর ভয়ে প্রাণ লইয়া আমি পলাইব? তা যদি করি, তো ধিক্ আমার প্রাণে, ধিক্ আমার বাঁচনে! শত ধিক্ আমার প্রাণে, শত ধিক্ আমার বাঁচনে! তোমার কঙ্কাবতী অল্পবুদ্ধি বালিকা বটে, সেইজন্য সে তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়াছে। তা বলিয়া, কঙ্কাবতী নরকের কীট নয়! নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি ভাল; না পারি, তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কঙ্কাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কঙ্কাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না! কঙ্কাবতীর এই প্রতিজ্ঞা। কঙ্কাবতী নিশ্চয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"

খেতু, কঙ্কাবতীর মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন। কঙ্কাবতীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, অচল। কঙ্কাবতীর চক্ষে আর জল নাই, কঙ্কাবতীর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। খেতু ভাবিলেন,—"কঙ্কাবতীকে আর যাইতে অনুরোধ করা বৃথা।"

দশম পরিচ্ছেদ

—:০:—

চুরি

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী। যদি নিতান্ত তুমি এখান হইতে পলাইবে না, তবে তোমাকে সকল কথা বলি,—শুন। তুমি বালিকা, তা'তে জন-শূন্য এই বিজন অরণ্যের মধ্যে আমাদের বাস। ঘরের দ্বারে ভয়ঙ্করী নাকেশ্বরী। পাছে তুমি ভয় পাও, তাই এতদিন সকল কথা তোমাকে বলি নাই। এখন বলি,—শুন। কিন্তু কথা আমার শেষ হইলে হয়। শিকড়-পোড়ার গন্ধ পাইলেই বোধ হয়, নাকেশ্বরী জানিতে পারিবে যে, আমার কাছে আর শিকড় নাই। তখনি সে ভিতরে আসিয়া আমার প্রাণবধ করিবে। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়।

"মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কাশী-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কলিকাতা না গিয়া কিজন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলাম, সে কথা তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাশীতে উপস্থিত হইয়া, মাতার শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর কর্ম্ম-কাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে, অবিলম্বেই একটী উত্তম কাজ পাইলাম। অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইত সত্য, কিন্তু বেতন অধিক ছিল। এক বৎসরের

মধ্যে অনেকগুলি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব, এরূপ আশা হইল। কেবল মাত্র শরীরে প্রাণ রাখিতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেইরূপ, যৎসামান্য ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট টাকা আমি তোমার বাপের জন্য রাখিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতী! বলিতে হইলে, জল খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, এক এক দিন সন্ধ্যা বেলা, এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না, মাথা ঘুরিয়া, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু রাত্রিতে আর কিছু খাইতাম না। জল খাবার নয়, কেবল খালি জল, তাই পান করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। তাহাতে শরীর অনেকটা সুস্থ হইত, কিছুক্ষণের নিমিত্ত ক্ষুধার জ্বালাও নিবৃত্ত হইত। তাহার পর শয়ন করিলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম, ক্ষুধার জ্বালা আর জানিতে পারিতাম না। জল আনিবার জন্য কাহাকেও একটী পয়সা দিতাম না। একটী বড় লোটা কিনিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর, যখন কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না, সেই সময়ে আপনি গিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে জল আনিতাম। কাশীতে গঙ্গার ঘাট বড় উচ্চ। জল আনিতে গিয়া, একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। হাতে ও পায়ে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল। কোনও মতে উঠিয়া সেই ঘাটের একটী সোপানে বসিলাম। কঙ্কাবতী! সেই খানে বসিয়া কত যে কাঁদিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! মনে মনে করিলাম যে, 'হে ঈশ্বর! আমি কি পাপ করিয়াছি? যে, তাহার জন্য আমার এ ঘোর শাস্তি!' কেন লোকে সংসার পরিত্যাগ

করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা বুঝিলাম। নিজের সুখ-দুঃখে যিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন, এ জগতে শান্তির আশা কেবল তিনিই করিতে পারেন। যাঁহারা পাঁচটা লইয়া থাকেন, পাঁচটার ভাল-মন্দের উপর যাঁহারা আপনাদিগের সুখ-দুঃখ নির্ভর করেন, তাঁহাদের আবার এ জগতে শান্তি কোথায়? যা'রে আমি ভাল বাসি, যা'র জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাখিয়াছি, যা'র মঙ্গল-কামনা সতত করিয়া থাকি, সে কি অকর্ম্ম-দুষ্কর্ম্ম করিবে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? তাহার কর্ম্মের উপর আমার কোনও অধিকার নাই, অথচ তাহার অসুখ, তাহার ক্লেশ দেখিলে হৃদয় আমার ঘোরতর ব্যথিত হয়। আবার, সে নিজে যদিও কোনও দুষ্কর্ম্ম না করে, কি নিজে নিজের অসুখের কারণ না হয়, পরের অত্যাচারে সে প্রপীড়িত হইতে পারে! আমি হয় তো পরের অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। নিরুপায় হইয়া, প্রাণসম সেই প্রিয়-বস্তুর যাতনা আমাকে দেখিতে হয়। এই ধর,—যেমন তোমার প্রতি পিতা-ভ্রাতার পীড়ন; তাহার আমি কি করিতে পারিয়াছিলাম? চারিদিকে সাধুদিগের ধুনী দেখিয়া, তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। আবার ভাবিলাম,—'এই সংসার-ক্ষেত্র প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র। নানা পাপ, নানা দুঃখ, এই সংসারে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি প্রাণী সেই পাপে, সেই তাপে, তাপিত হইয়া সংসার-যাতনা ভোগ করিতেছে। আমি,—যা'র জ্ঞান-চক্ষু তাহাদের চেয়ে অনেক পরিমাণে উন্মীলিত

হইয়াছে, পাপ-তাপের সহিত যুদ্ধ করিতে যে অধিকতর সুসজ্জিত হইয়াছে, আমি কি সে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইব? জগতের হিতের নিমিত্ত অহিতের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, কাপুরুষের ন্যায় পরাজয় মানিয়া, নির্জ্জন গভীর কাননে গিয়া বসিয়া থাকিব?' কঙ্কাবতী! এইরূপ কত যে কি ভাবিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব!

"আস্তে আস্তে পুনরায় জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে এক বৎসর গত হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। মনে করিলাম,—'এই টাকা পাইলে, তোমার পিতা পরিতোষ লাভ করিবেন। তোমাকে আমি পাইব।' টাকা গুলি লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমুদয় নগদ টাকা ছিল, নোট লই নাই; কারণ নোটের প্রতি আমাদের গ্রামের লোকের আস্থা নাই। একটী ব্যাগের ভিতর টাকা গুলি লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িলাম। ব্যাগটী আপনার কাছে অতি যত্নে, অতি সাবধানে রাখিলাম। পাছে কেহ চুরি করে, পাছে কেহ লয়, এই ভয়ে একবারও গাড়ী হইতে নামি না। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন বড় একটী ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। সেখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী দাঁড়াইবে। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। তবুও জল-খাবার কিনিবার জন্য গাড়ী হইতে আমি নামিলাম না। যে গাড়ীতে আমি বসিয়াছিলাম, সে গাড়ীতে আর একটী অপরিচিত লোক ছিল,—অন্য আর কেহ ছিল না। সে লোকটী, নিজের জন্য জল-খাবার আনিতে

গেল। যাইবার সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মহাশয়। আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো বলুন, আমি আনিয়া দিই।' আমি উত্তর করিলাম,—'যদি তুমি আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি উপকৃত হইব।' এই বলিয়া, জল-খাবার কিনিবার নিমিত্ত তাহাকে আমি পয়সা দিলাম। সে আমাকে জল-খাবার আনিয়া দিল। আমি তাহা খাইলাম। অল্পক্ষণ পরে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মনে করিলাম,—'গাড়ীর উত্তাপে এইরূপ হইয়াছে।' একটু শুইলাম। শুইতে না শুইতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য কিছু মাত্র রহিল না। প্রাতঃকাল হইলে অল্পে অল্পে জ্ঞানের উদয় হইল। কিন্তু মাথা বড় ব্যথা করিতে লাগিল, মাথা যেন তুলিতে পারি না। যাহা হউক, জ্ঞান হইয়া দেখি যে, শিয়রে আমার ব্যাগ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখি যে, গাড়ীতে সে লোকটাও নাই। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া গাড়ীর চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। ব্যাগ নাই! ব্যাগ দেখিতে পাইলাম না! আমার যে ঘোর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এখন তাহা নিশ্চয় বুঝিলাম। এক বৎসর ধরিয়া, এত কষ্ট পাইয়া, জল খাইয়া যে টাকা আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজ সে টাকা আমার নাই! কিরূপ মর্ম্মভেদী অসহ্য যাতনা আমার মনের ভিতর তখন হইল, একবার বুঝিয়া দেখ দেখি! হাঁ কঙ্কাবতী! মানবের মনে এরূপ নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে আসিল? যদি এ নিষ্ঠুরতা নরক নয়, তবে নরক আবার কি? হাঁ কঙ্কাবতী!

মানুষে মানুষকে এরূপ যাতনা দেয় কেন? পরকে যাতনা দিতে, তাদের কি ক্লেশ হয় না?"

অনেক ক্ষণ পরে কঙ্কাবতীর চক্ষুতে জল আসিল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে! কাজ নাই!—কাজ নাই আব এ জগতে থাকিয়া! চল আমরা এ জগৎ হইতে যাই। নাকেশ্ববী আমাদের শত্রু নয়,—নাকেশ্বরী আমাদের পরম মিত্র।"

খেতু বলিলেন,—"কান পাতিয়া শুন দেখি! নাকেশ্বরীর কোনও সাড়া-শব্দ পাও কি না?"

কঙ্কাবতী একটু কান পাতিয়া শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন,— "না,—কোনরূপ সাড়া-শব্দ নাই।

খেতু পুনরায় বলিলেন,—"তবে শুন, তাহার পর কি হইল। নাকেশ্বরী না আসিতে আসিতে সকল কথা বলিয়া লই।

"যখন বুঝিলাম যে, আমার টাকা গুলি চুরি গিয়াছে, তখন মনে করিলাম,—'আজ আমার সকল আশা নির্ম্মূল হইল!' যে লোকটী আমার সঙ্গে গাড়ীতে ছিল, সে চোর। জল-খাবারের সহিত সে কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য মিশাইয়া দিয়াছিল। সেই জল-খাবার খাইয়া যখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, তখন সে আমার টাকা গুলি লইয়া পলাইয়াছে। কখন্ কোন্ ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? সুতরাং চোর ধরা পড়িবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। তবু, রেলের কর্ম্মচারীদিগকে সকল কথা জানাইলাম। আমাকে সঙ্গে লইয়া, সমস্ত গাড়ী তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেন।

কোনও গাড়ীতে সে লোকটীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতী! এই যে মনুষ্য-জীবন দেখিতেছ! কেবল কতক গুলি আশা ও হতাশা, এই লইয়াই মনুষ্য জীবন! কি করিব আর, কঙ্কাবতী? চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—'এখন করি কি? যাই কোথায়? কলিকাতা যাই, কি কাশী ফিরিয়া যাই, কি দেশে যাই!' তার পর মনে পড়িল যে, রাণীগঞ্জের টিকিট খানি, আর গুটি কত পয়সা ভিন্ন হাতে আর কিছুই নাই। যাহা হউক, হাতে পয়সা থাকুক আর না থাকুক, দেশে আসাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। কারণ, তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিব। তুমি পথ পানে চাহিয়া থাকিবে। হয় তো কত তাড়না, কত গঞ্জনা, কত লাঞ্ছনা তোমাকে সহ্য করিতে হইতেছে! মনে করিলাম,—'তোমার বাপের পায়ে গিয়া ধরি, তাঁহাকে দুই হাজার টাকার খত লিখিয়া দিই, মাসে মাসে টাকা দিয়া ঋণ-পরিশোধ করিব।'

"কঙ্কাবতী! বার বার তোমার বাপের কথা মুখে আনিতে মনে বড় ক্লেশ হয়। তিনি কেন যাই হউন না? তোমার পিতা তো বটে! তাঁর কথা বলিতে গেলেই যেন নিন্দা হইয়া পড়ে। মনে করিয়াছিলাম, —'এখান হইতে প্রচুর ধন দিয়া, ধনের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা করিয়া দিব।' পৃথিবীর আর একটী রোগ দেখ, কঙ্কাবতী! ধনের জন্য সবাই উন্মত্ত, ধনের জন্য সবাই লালায়িত। পেটে কত-কটী খাই, কঙ্কাবতী! গায়ে কি পরি? যে, ধন-পিপাসায় এত তৃষিত হইব? হাঁ! ধন উপার্জ্জনের আবশ্যক। কেননা, ইহা দ্বারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-

বান্ধবের উপকার করিতে পারা যায়, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিতে পারা যায়, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতে পারা যায়, দায়গ্রস্তকে দায় হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, অনেক পরিমাণে দুঃখময় জগতের দুঃখ মোচন করিতে পারা যায়।

"যাঁহার দ্বারা অনেকের উপকার হয়, যিনি আমোদ-প্রমোদে বিরত হইয়া, ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন বা জ্ঞানোপার্জ্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরাবৃত এই সংসারে তিনি দেবতা স্বরূপ। কিন্তু তা বলিয়া, কঙ্কাবতী! ধনোপার্জ্জনে লোক যেন উন্মত্ত না হয়! জ্ঞানোপার্জ্জনে ও ধর্ম্মোপার্জ্জনে লোকে উন্মত্ত হয়, হউক। মেঘের বর্ষণ, প্রবল প্রভঞ্জনের গভীর গর্জ্জন, পৃথিবীর নিম্ন-প্রদেশেই ঘটিয়া থাকে। ঊর্দ্ধপ্রদেশে, সেই মহা আকাশে সব স্থির, সব শান্তি। সেইরূপ মানবের এই কর্ম্মক্ষেত্রেও উচ্চতা-নীচতা আছে। ধন, মান, জাতি, ধর্ম্ম লইয়া যত কিছু কোলাহল শুনিতে পাও, অজ্ঞানতাময় নীচ-পথাশ্রিত মানব-মন হইতেই সে সমুদয় উত্থিত হয়। এই মৃত্যু সময়ে, মোহান্ধ, নিম্নপথ-অবলম্বী মানবকুলের বৃথা বাদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কঙ্কাবতী! আমি আর হাস্য-সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

"কলিকাতা কি কাশী না গিয়া বাড়ী যাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রাণীগঞ্জে নামিলাম। রাণীগঞ্জ হইতে আমাদের গ্রামে আসিতে দুইটী পথ আছে। একটী রাজপথ, যাহা দিয়া অনেক লোক গতি-বিধি করে। দ্বিতীয়টী বনপথ। তাহাতে বাঘ-ভালুকের

ভয় আছে, সেজন্য সে পথ দিয়া লোকে বড় যাতায়াত করে না। বনপথটী কিন্তু নিকট। সে পথটী দিয়া আসিলে পাঁচ দিনে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে পারা যায়, রাজপথ দিয়া যাইলে ছয় দিন লাগে। রাণীগঞ্জে যখন নামিলাম, তখন আমার হাতে কেবল চারিটী পয়সা ছিল। শীঘ্র গ্রামে পৌঁছিব, সে নিমিত্ত আমি বন-পথটী অবলম্বন করিলাম। প্রথম দিনেই পয়সা কয়টী খরচ হইয়া গেল। পাহাড়-পর্ব্বত, বন-উপবন, নদী-নির্ঝর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। বনের ফল মূল যাহা কিছু পাই, তাহাই খাই। রাত্রিতে যে দিন গ্রাম পাই, সে দিন কাহারও দ্বারে পড়িয়া থাকি। যে দিন গ্রাম না পাই, সে দিন গাছতলায় শুইয়া থাকি। মনে করিলাম, 'আমাকে বাঘ ভল্লুকে কিছু বলিবে না, তার জন্য কোনও চিন্তা নাই। আমাকে যদি বাঘ ভল্লুকে খাইবে, তবে পৃথিবীতে এমন হতভাগা আর কে আছে, যে এ দুঃখ সব ভোগ করিবে?"

"এইরূপে চারি দিন কাটিয়া গেল। আমাদের গ্রাম হইতে যে উচ্চ পর্ব্বতটী দেখিতে পাওয়া যায়, সন্ধ্যা বেলা আমি সেই পর্ব্বতের নিম্ন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই পর্ব্বতটী এ'ই; যাহার ভিতর এক্ষণে আমরা রহিয়াছি। এখান হইতে আমাদিগের গ্রাম প্রায় এক দিনের পথ। কয় দিন অনাহারে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম, আগত প্রাতঃ-কালে আরও অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, তাহার চেয়ে সমস্ত রাত্রি চলি, সকাল বেলা গ্রামে গিয়া পৌঁছিব। এইরূপ ভাবিয়া,

সে রাত্রিতে আর বিশ্রাম না করিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। রাত্রি এক প্রহরের পর চন্দ্র অস্ত যাইলেন, ঘোরতর অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হইল, আমি পথ হারাইলাম। নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আর পথ পাই না। একবার অগ্রে যাই, একবার পশ্চাতে যাই, একবার দক্ষিণে যাই, একবার বাম দিকে যাই, পথ আর কোনও দিকে পাই না। অনেকক্ষণ ধরিয়া, অতি কষ্টে বনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলাম, পথ কিন্তু কিছুতেই পাইলাম না। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পা আর তুলিতে পারি না। পিপাসায় বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময়, সম্মুখে একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটী দেখিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, অবশ্য এই স্থানে লোক আছে। আর কিছু পাই না পাই, এখন একটু জল পাইলে প্রাণ রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া, তৃষিত চাতকের ন্যায় ব্যগ্রতার সহিত মন্দিরের দিকে যাইলাম। হা অদৃষ্ট! গিয়া দেখিলাম, মন্দিরে দেব নাই, দেবী নাই, জন মানব নাই। মন্দিরটী অতি প্রাচীন, ভগ্ন, ভিতর ও বাহির বন্য বৃক্ষ-লতায় আচ্ছাদিত। বহুকাল হইতে জন মানবের সেখানে পদার্পণ হয় নাই। 'হা ভগবান! তোমার মনে আরও কত কি আছে, দেখি!' এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই খানে আমি শুইয়া পড়িলাম।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

ভূত কোম্পানী

খেতু বলিতেছেন,—রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে, অতিশয় শ্রান্তি বশতঃ আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মন্দিরের সোপানে কি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি না, ভীষণাকার শ্বেতবর্ণ এক মড়ার মাথা। একটী পৈটা হইতে অন্য পৈটার উপর লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে। কঙ্কাবতী! ভয় আমার শরীরে কখনও নাই, তবুও এই মড়ার মাথার কাণ্ড দেখিয়া আমার শরীর কেমন একটু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। মড়ার মাথাটী, লাফাইয়া লাফাইয়া সমস্ত পৈটা গুলি উঠিল, তাহার পর ভঁটার মত গড়াইতে গড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিকট আসিয়া একটী লাফ মারিল, লাফ মারিয়া আমার ঠিক মুখের সম্মুখে শূন্যেতে স্থির হইয়া কিছু ক্ষণের নিমিত্ত আমার পানে চাহিয়া রহিল। সেই খানে থাকিয়া আকর্ণ হাঁ করিয়া দন্ত পাতি দুইটী বাহির করিল।

এইরূপ বিকটাকার হাঁ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না?"

আমি উত্তর করিলাম,—"রক্ষা করুন, মহাশয়! আপনারা পর্য্যন্ত

আর আমার সহিত লাগিবেন না। নানা কষ্টে, নানা দুঃখে, আমি বড়ই উৎপীড়িত হইয়াছি। যা'ন, ঘরে যা'ন! আমাকে আর জ্বালাতন করিবেন না।"

আমার কথায় মুণ্ডটীর আরও ক্রোধ হইল। চীৎকার করিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না? ইংরেজি পড়িয়া তুমি না কি ভূত মানো না?"

আমি বলিলাম,—"ইংরেজি-পড়া বাবুরা ভূত মানেন না বলিয়া কি আপনার রাগ হইয়াছে? লোকে ভূত না মানিলে কি আপনাদের অপমান বোধ হয়?"

মড়ার মুণ্ড উত্তর করিল,—"রাগ হইবে না তো কি, সর্ব্ব শরীর শীতল হইবে নাকি? লোকে ভূত না মানিলে, ভূতদিগের অপমান হয় না তো কি আর মর্য্যাদা বাড়ে না কি? কেন লোকে বলিবে যে, পৃথিবীতে ভূত নাই? ইংরেজি-পড়া বাবুদের আমরা কি করিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে একেবারে উড়াইয়া দিবে? দেবতাদিগকে তো তোমরা উড়াইয়া দিয়াছ, এখন এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিলেই হয়! বটে!"

দুঃখের সময়ও হাসি পায়! দেবতাদিগকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন, এ কথা পূর্ব্বে জানিতাম; কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কখনও শুনি নাই। আমার তাই হাসি পাইল।
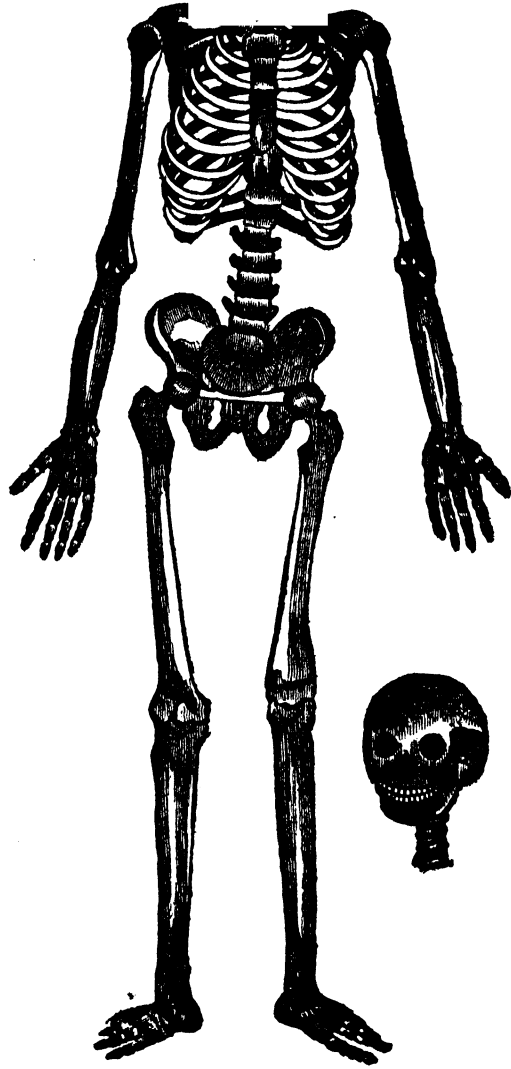
স্কল স্কেলিটন এবং কোং

আমি বলিলাম,—"হাঁ মহাশয়! ইংরেজি-পড়া বাবুদের এটী অন্যায় বটে।"

আমার কথায় মড়ার মাথা কিছু সন্তুষ্ট হইল, অনেকটা তাহার রাগ পড়িল। মুণ্ড বলিল,—"তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ইংরেজি-পড়া বাবুদের মত ত্রিপণ্ড নাস্তিক নও! তোমার মাথায় টিকি আছে?"

আমি বলিলাম,—"না মহাশয়! আমার মাথায় টিকি নাই।"

মুণ্ড বলিল,—"এইবার ঘরে গিয়া টিকি রাখিও। আর শুন, ইংরেজি-পড়া বাবুদের আমরা সহজে ছাড়িব না। যাহাতে পুনরায় ভূতের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে, আমরা সে সমুদয় আয়োজন করিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ভজাইব। যেখানে সেখানে গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তক ছাপাইব, সংবাদ-পত্র বাহির করিব। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমরা একটী কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্পানির নাম রাখিয়াছি, 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং'।"

কঙ্কাবতী! তোমার বোধ হয়, মনে থাকিতে পারে যে, "স্কল" মানে মনুষ্যের মাথার খুলি, আর "স্কেলিটন" মানে কঙ্কাল, অর্থাৎ কিনা অস্থি-নির্ম্মিত মনুষ্য শরীরের কাটামো। মুণ্ড যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, ইংরেজি-পড়া লোকেরা যাহাতে ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনে যাহাতে ভূতের উপর বিশ্বাস হয়, ভূতের প্রতি ভক্তি হয়, এইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত খুলি, কঙ্কাল প্রভৃতি ভূতগণ দল-বদ্ধ হইয়াছেন।

স্কল অর্থাৎ সেই মড়ার মাথাটী আমাকে পুনরায় বলিলেন,—

"আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্পানির নাম রাখিয়াছি, 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজি-নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম, 'খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানি,' তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাওনা? যে যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন, 'লংম্যান এণ্ড কোং।' দেখিয়া শুনিয়া, শত সহস্র বার ঠকিয়া, দেশী লোককে আর কেহ বিশ্বাস করে না। বরং ইংক্রজ পিংক্রজ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে না। আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতি সাহেবরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানির নাম দিয়াছি—'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং'। স্কেলিটন ভায়া ঐ খানে দাঁড়াইয়া আছেন। এস তো, স্কেলিটন ভায়া, একটু এদিকে এস তো!"

হাড় ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে স্কেলিটন আমার নিকটে আসিলেন। সর্ব্বশরীরের অস্থিকে স্কেলিটন বলে, কিন্তু এক্ষণে আমার সম্মুখে যিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলাম মুণ্ডহীন স্কেলিটন।

তখন স্কল আমাকে পুনরায় বলিলেন,—"কেমন! ভূতের উপর এখন তোমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তো?"

আমি উত্তর করিলাম,—"পূর্ব্ব হইতেই আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, ভূতের ষড়যন্ত্রেই আমি এত দিন ধরিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছি। কিন্তু সে অন্য প্রকার ভূত। এখন হইতে আপনা-দিগের মত ভূতকে মানিয়া লইলাম। প্রত্যক্ষ চক্ষের উপর দেখিয়া আর কি করিয়া না মানি? তার জন্য আর আপনারা কোনও চিন্তা করিবেন না। যা'ন, এক্ষণে ঘরে যা'ন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আপনাদিগের ঘরের লোকে ভাবিবে। আর, আমাকে একটু নিদ্রা যাইতে হইবে। কারণ, কা'ল প্রাতঃকাল হইতে আবার আমাকে পথ চলিতে হইবে।"

স্কল তখন স্কেলিটনকে বলিলেন,—"দেখিলে, স্কেলিটন ভায়া! কোম্পানি খুলিলে কত উপকার হয়! ইংরেজি পড়িয়া এই বাবুটীর মতি-গতি একেবারেই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। দু কথাতেই পুনরায় ইঁহাকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিলাম। এক্ষণে চল, অন্যান্য বিকৃতমতি বাবুদিগকে অন্বেষণ করি। ভূতবর্গের প্রতি যাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, চল, সেই রূপ উপায় করি।"

স্কেলিটন হাড় ঝম্ ঝম্ করিলেন। আমি একটু কান পাতিয়া শুনিলাম যে, সে কেবল হাড় ঝম্ ঝম্ নয়। তাঁহার মুণ্ড নাই, সুতরাং মুখ দিয়া কথা কহিবার তাঁহার উপায় নাই। তার জন্য গায়ের হাড় নাড়িয়া, হাড় ঝম্ ঝম্ করিয়া তিনি কথা-বার্ত্তা কহিয়া থাকেন!

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে কথা আমি অনায়াসে বুঝিতে পারিলাম।"

স্কেলিটন বলিলেন,—"যদি ইনি ভূতভক্ত হইলেন, তবে ইঁহাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। লোককে ভক্ত করিতে হইলে অর্থদান একটী তাহার প্রধান উপায়। অর্থ পাইলে লোকে অতি ধর্ম্মবান্, অতি ভক্তিমান মহাপুরুষ হয়। অতএব তুমি ইঁহাকে ধন দান কর। যখন দেশে গিয়া, ইনি গল্প করিবেন, তখন শত শত লোক অর্থলোভে ভূতভক্ত হইবে।"

আমি বলিলাম,—"সম্প্রতি আমার অর্থেব নিতান্ত প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু আমি অর্থলোভী নই। ধন দিয়া আমাকে ভূতভক্ত করিতে হইবে না। আপনাদের অর্থ আমি লইব না।"

এই কথা শুনিয়া স্কল আরও প্রসন্নমূর্ত্তি ধাবণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"এস, আমাদের সঙ্গে এস। আমাদের সঞ্চিত ধন তোমাকে দিলে, ধনের সফলতা হইবে, ধন সুপাত্রে অর্পিত হইবে, সে ধন দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে, সেই জন্য তোমাকে আমাদেব সঞ্চিত ধন দিব। জীবিত থাকিতে আমরা ধনের সদ্ব্যবহার কবি নাই। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক সে ধনের সদ্ব্যবহার হইলে আমাদেব উপকার হইবে।"

স্কেলিটনও আমাকে সেইরূপ অনেক অনুরোধ করিলেন। দুই ভূতের অনুরোধে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলাম। স্কেলিটন হাঁটিয়া চলিলেন, আর স্কল স্থান-বিশেষে লাফাইয়া বা গড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে অনেকগুলি ফল-

বৃক্ষের নিকট লইয়া যাইলেন। আম্র, কদলী, পনস, কেন্দু, পিয়াল প্রভৃতি নানা ফল সেই খানে সুপক্ক হইয়া ছিল। সেই ফল আমাকে তাঁহারা আহার করিতে বলিলেন। আমি আহার করিলাম। তাহার পর তাঁহারা আমাকে সুশীতল স্ফটিক সদৃশ নির্ঝর দেখাইয়া দিলেন। জলপান করিয়া আমি পিপাসা দূর করিলাম। সেখান হইতে আমরা পুনরায় চলিলাম। অল্প ক্ষণ পরে এই পর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের এক স্থানে আসিয়া স্কল বলিলেন,—'এই খানকার বন আমা-দিগকে একটু পরিষ্কার করিতে হইবে। আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া এখানে জন মানব পদার্পণ করে নাই।" আমরা তিন জনে অনেক ক্ষণ ধরিয়া সেই বন পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। পরিষ্কৃত হইলে পর্ব্বত-গাত্রে গাঁথুনির ঈষৎ একটু রেখা বাহির হইয়া পড়িল। স্কল, স্কেলিটন ও আমি, অতি কষ্টে সেই গাঁথুনির পাথরগুলি ক্রমে খুলিয়া ফেলিলাম। গাঁথুনি খুলিতেই আমাদের এই অট্টালিকার সুড়ঙ্গ পথটী বাহির হইয়া পড়িল। সুড়ঙ্গ-দ্বারে ভয়ঙ্করী নাকেশ্বরীকে দেখিলাম। নাকেশ্বরী খল খল করিয়া হাসিল। কিন্তু যেই স্কল চক্ষু-কোটর বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে কোপ-কটাক্ষ করিলেন, আর সে চুপ করিল। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া আমরা এই অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।

স্কল্ বলিলেন,—"সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের আমরা

রাজা ছিলাম। প্রতিবাসী রাজাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, এই অপরিমিত ধন অর্জ্জন করি। জীবিত থাকিতে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই করি নাই, কেবল যুদ্ধ ও ধনসঞ্চয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমাদের সন্তান সন্ততি ছিল না। সে জন্য কিন্তু আমরা দুঃখিত ছিলাম না, বরং আনন্দিত ছিলাম। যে হেতু সন্তান সন্ততি দ্বারা ধনের ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। টাকা গণিয়া, টাকা নাড়িয়া চাড়িয়া আমরা স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতাম। আমাদের অবর্ত্তমানে পাছে কেহ এই ধন লয়, সে জন্য আমরা ইহার উপর 'যক্' দিলাম, অর্থাৎ ইহার উপর এক ভূতিনীকে প্রহরিণী-স্বরূপ নিযুক্ত করিলাম। এ কার্য্যে যক্ষ বা যক্ষিণী নিযুক্ত করি নাই। কথায় লোকে বলে বটে, কিন্তু ধনের উপরে যক্ষ বা যক্ষিণী কেহ নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদিগের ধন ঐশ্বর্য্যের উপর 'যক্' দিবার উদ্দেশে প্রথমে পর্ব্বত-অভ্যন্তরে এই সুরম্য অট্টালিকাটী নির্ম্মাণ করিলাম। রাজ বাড়ী হইতে সমুদয় টাকা-কড়ি, মণি-মুকুতা, বসন-ভূষণ, ইহার ভিতর লইয়া আসিলাম। যথাবিধি যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া, নবম বর্ষীয়া সুলক্ষণা একটী বালিকাকে উৎসর্গ করিয়া, তাহাকে বলিয়া দিলাম যে, এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তুমি এই ধনের প্রহরিণী স্বরূপ নিযুক্ত থাকিবে। এক সহস্র বৎসরের মধ্যে যদি কেহ এই ধনের এক কণা মাত্রও লয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহার প্রাণবধ করিবে। এক সহস্র বৎসর পরে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাইও, তখন যাহার অদৃষ্টে থাকিবে, সে এই

কন্যা

নাকেশ্বরী অতি সুন্দরী ভূতিনী

ধনের অধিকারী হইবে। বালিকাকে এইরূপ আদেশ করিয়া, অট্টালিকার ভিতর একটী প্রদীপ জ্বালিয়া, আমরা সুড়ঙ্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। প্রদীপটী যেই নির্ব্বাণ হইল, আর বালিকার মৃত্যু হইল, মরিয়া সে ভীষণাকৃতি অতি দীর্ঘ নাসিকা-ধারিণী ভূতিনী হইল। ভূত-সমাজে সে জন্য সে নাকেশ্বরী নামে পরিচিত। দ্বারে এখন যে এই প্রহরিণী-স্বরূপ রহিয়াছে, সে সেই বিকৃতি আকৃতি ভূতিনী, যাহার বিকট হাসি তুমি এই-মাত্র শুনিলে। বালিকা না রাখিয়া ধনের উপর অনেকে বালক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে। বালক মরিয়া ভূত হয়। কিছু দিন পরে যুদ্ধে আমরা হত হই। শত্রুর তরবারি-আঘাতে দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবিত থাকিতে, ছিলাম এক জন মনুষ্য; মরিয়া হইলাম, দুই জন ভূত। মুণ্ডটী হইলাম আমি স্কল্, আর ধড়টী হইলেন ইনি স্কেলিটন ভায়া। ৯৯৯ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই ধনের উপর 'যক্' দিয়াছি। আর এক বৎসর গত হইলেই সহস্র বৎসর পূর্ণ হয়। তখন নাকেশ্বরী এ ধন ছাড়িয়া দিবে। গত পৌষ মাসে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঘোঁ নামক ভূতের শুভ বিবাহ হইয়াছে। নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। তখন এ ধন লইলে আর তোমার কোনও বিপদ ঘটিবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের ভিতর কোনও মতে এ ধনের কণা মাত্র স্পর্শ করিবে না, করিলেই অবিলম্বে নাকেশ্বরী তোমাকে খাইয়া ফেলিবে, অবিলম্বে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এই ধন সম্পত্তির প্রকৃত স্বামী আমরা দুই জন। এই

ধন আমরা তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু সাবধান, এই এক বৎসরের ভিতর এ ধন স্পর্শ করিবে না।"

আমি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! আপনাদের কৃপায় আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। যদি আমাকে এ সম্পত্তি দিলেন, তবে এরূপ কোনও একটা উপায় করুন, যাহাতে এ ধন হইতে এখন আমি কিছু লইতে পারি। সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। এখন যদি পাই, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, এমন কি, আমার প্রাণরক্ষা হয়। এখন না পাইলে, এক বৎসর পরে জীবিত থাকি কি না, তাই সন্দেহ।"

এই কথা শুনিয়া, অনেক ক্ষণ ধরিয়া, স্কল ও স্কেলিটনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি বলাবলি করিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

স্কল বলিলেন,—"এস, আমাদের সঙ্গে পুনরায় বাহিরে এস।" সকলে পুনরায় বাহিরে যাইলাম,—বনের ভিতর পুনরায় আমরা ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। স্কল্ বন খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে সামান্য একটী ওষধীর গাছ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন,— "এই গাছটীর তুমি মূল উত্তোলন কর।" আমি সেই গাছটীর শিকড় তুলিলাম। স্কলের আদেশে অপর একটী গাছের আটা দিয়া সেই শিকড়টী আমার চুলের সহিত জুড়িয়া দিলাম। তাহার পর সকলে পুনরায় আবার এই অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিলাম।

এই খানে উপস্থিত হইয়া স্কল বলিলেন,—"যে সকল কথা

তোমাকে আমি এখন বলি, অতি মনোযোগের সহিত শুন। আপাততঃ যথাপ্রয়োজন টাকা লইয়া তুমি তোমার কার্য্য সমাধা করিবে। যে শিকড় তোমাকে আমরা দিলাম, তাহার গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে, যতক্ষণ তুমি অট্টালিকার ভিতর থাকিবে, ততক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। অট্টালিকার বাহিরে শিকড় তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শিকড়ের কিন্তু আর একটী গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে যে জন্তুর আকার ধরিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই জন্তু হইতে পারিবে। ব্যাঘ্র হইতেছেন নাকেশ্বরীর ইষ্ট দেবতা। সে জন্য যখন তুমি অট্টালিকার বাহিরে যাইবে, তখন ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া যাইবে। তাহা হইলে নাকেশ্বরী তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। তাহার পর অট্টালিকার ভিতর প্রত্যাগমন করিয়া ইচ্ছা করিলেই মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরিতে পারিবে। অতএব দুইটী কথা স্মরণ রাখিও, কোনও মতেই ভুলিবে না। প্রথম, এ এক বৎসর শিকড়টী যেন কিছুতেই তোমার মাথা হইতে না যায়, যাইলেই মৃত্যু। তুমি যেখানে থাক না কেন, সেই খানেই মৃত্যু। দ্বিতীয়, ব্যাঘ্ররূপ না ধরিয়া বাহিরে যাইবে না, এক মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও নিজরূপে বাহিরে থাকিবে না, থাকিলেই মৃত্যু, সেই দণ্ডেই মৃত্যু। এক বৎসর পরে শিকড়টী দগ্ধ করিয়া সমুদয় ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। এ এক বৎসরের ভিতর যদি তুমি ধন না লইতে, তাহা হইলে এসব কিছুই করিতে হইত না। কারণ নাকেশ্বরী-রক্ষিত ধন না লইলে, নাকেশ্বরী কাহাকেও কিছু বলে

না, বলিতেও পারে না। যাহা হউক, এক বৎসর পরে ধন ছাড়িয়া নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। ঘ্যাঁঘোঁ ভূতের সহিত যখন তাহার বিবাহের কথা হয়, তখন লোকে কত না ভাঙচি দিয়াছিল!”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ভাঙচি কেন দিয়াছিল, মহাশয়?”

স্কল বলিলেন,—“তুমি জান না, তাই পাগলের মত কথা জিজ্ঞাসা কর। বিবাহে ভাঙচি দিলে যেমন আমোদটী হয়, এমন আমোদ আর কিছুতে হয় না। তুমি একটী পাত্র কি পাত্রী স্থির করিয়া বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মত জিজ্ঞাসা কর; তাঁবা বলিবেন,—‘দিবে দাও! কিন্তু,—’। ঐ যে ‘কিন্তু’ কথাটী, উহার ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে। যাহা হউক, যা বলি আর যা কই, ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহে অতি চমৎকার ভাঙচি দিয়াছিল। প্রশংসা করিতে হয়!”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ভাঙচির আবার চমৎকার কি, মহাশয়?”

স্কল উত্তর করিলেন,—“সাত কাণ্ড,—সেই যা আমাদের নাম করিতে নাই,—তা পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ভূতের কাণ্ড তুমি কিছুই জান না। কি হইয়াছিল বলিতেছি,—শুন। ঘ্যাঁঘোঁর সহিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটী ভূত পাঠাইয়া দিলেন। ঘ্যাঁঘোঁর বাটীতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে, ঘ্যাঁঘোঁ তাঁহার বিশেষ সমাদর করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তিনি নিকটস্থ একটী বিলের জলে স্নান

আগন্তুক ভূত

মহাশয়ের নিবাস ?

আমার নিবাস এক ঠেঙো মুল্লুকের ওধারে

করিতে যাইলেন। সেই খানে, প্রতিবাসী ভূতগণও পরামর্শ করিয়া স্নান করিতে যাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন, আগন্তুক ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়ের নিবাস?' আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমার নিবাস একঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে, বৌ ভুলুনি নামক আঁব গাছে।' ঘ্যাঁঘোঁর প্রতিবাসী ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখানে কি মনে করিয়া আগমন হইয়াছে?' আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমি ঘ্যাঁঘোঁকে দেখিতে আসিয়াছি।' প্রতিবাসী ভূতগণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'মহাশয়, তবে কি বৈদ্য?' আগন্তুক ভূত বলিলেন,—'কেন? বৈদ্য কেন হইব? ঘ্যাঁঘোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া আছে না-কি?' প্রতিবাসী ভূতগণ একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন,—'না না! এমন কিছু নয়! তবে একটু একটু খুক্ খুক্ করিয়া কাশি আছে, তাহার সহিত অল্প অল্প আলকাতরার ছিট্ থাকে, আর বৈকাল বেলা যৎসামান্য ঘুষ-ঘুষে জ্বর হয়! তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়াছে, নাইতে-খাইতে ভাল হইয়া যাইবে।' এই কথা শুনিয়া আগন্তুক ভূতের তো চক্ষু-স্থির! আর তিনি ঘ্যাঁঘোঁর কাছে ফিরিয়া যাইলেন না। সেই বিল হইতে একবারে একঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নাকেশ্বরীর মাসীকে সকল কথা বলিলেন। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। নাকেশ্বরী একটী সুন্দরী ভূতিনী। তাহার রূপে ঘ্যাঁঘোঁ একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। কত দিন ধরিয়া পাগলের মত সে গাছে গাছে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল। তার পর, মৌনব্রত অবলম্বন

করিয়া অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া ছিল। যাহা হউক, অবশেষে বিবাহ যে হইয়া গিয়াছে, তাহাই সুখের কথা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শ্লেষ্মার সহিত আলকাতরা কি?"

স্কল বলিলেন,—"তোমাদের যেরূপ রক্ত, আমাদের সেইরূপ আলকাতরা। কাশরোগে আমাদের বক্ষঃস্থল হইতে আলকাতরা বাহির হয়!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"যদি আমাদিগের মত ভূতদিগের রোগ হয়, তাহা হইলে ভূতেরাও তো মরিয়া যায়? আচ্ছা! মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয়?"

স্কল উত্তর করিলেন,—"কেন? ভূত মরিয়া মারবেল হয়! সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাঁটার মত মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব খেলা করে!"

আমি বলিলাম,—"মারবেল হয়! পৃথিবীতে এত বস্তু থাকিতে মারবেল হয় কেন?"

স্কল আমার এই কথায় কিছু রাগতঃ হইয়া বলিলেন,—"ভুল হইয়াছে! তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া তার পর আমাদের মরা উচিত! এখন হইতে না হয় তাই করা যাইবে।"

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি জানি না তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি অনুমতি করেন তো আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—'ভূত মরিয়া যদি মারবেল হয়, তাহা হইলে মারবেল লইয়া খেলা করা তো বড় বিপদের কথা'?"

স্কল উত্তর করিলেন,—"মরা ভূত লইয়া খেলা করিতে আর দোষ কি ? হাঁ ! জীয়ন্ত ভূত হইত ! তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করা বিপদের কথা বটে !"

স্কল পুনরায় বলিলেন,—"তোমার সহিত আর আমাদের মিছা-মিছি বকিবার সময় নাই। আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি, এখন গিয়া কোম্পানির কাজ করি। আমরা 'স্কল, স্কেলিটন এবং কোম্পানি'। আমরা কম ভূত নই। যে সব কথা বলিয়া দিয়াছি, সাবধানে মনে করিয়া রাখিবে। তা না হইলে বিপদে পড়িবে। এখন আমরা চলিলাম। আর তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া স্কল ও স্কেলিটন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। অট্টালিকার ভিতর আমি একেলা বসিয়া রহিলাম। তাহার পর কি করিলাম, তাহা তুমি জান, বলিবার আর আবশ্যক নাই। কঙ্কাবতী ! কথা এই ! এখন সকল কথা তোমাকে বলিলাম।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তবে আমিও যাই, গিয়া নাকেশ্বরীর টাকা লই, তাহা হইলে আমাদের দুই জনকে সে এক সঙ্গে মারিয়া ফেলিবে। পতিপরায়ণা সতীর ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি ?"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এক অতি ভয়াবহ চীৎকারে সে স্থান পরিপূরিত হইল। অট্টালিকা কাঁপিতে লাগিল। দ্বার গবাক্ষ পরস্পরে আঘাতিত হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অট্টালিকা ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। প্রজ্বলিত বাতিটী নির্ব্বাণ হইল না বটে, কিন্তু অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল।

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! ঐ নাকেশ্বরী আসিতেছে।"

কঙ্কাবতী এতক্ষণ শয্যার ধারে বসিয়াছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দ্বারটী উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর দ্বারের উপর সমুদয় শরীরের বলের সহিত ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। নাকেশ্বরীকে তিনি ভিতরে আসিতে দিবেন না!

অতি দুর্গন্ধে, নিবিড় অন্ধকারে, ঘন ঘন ঘোর গভীব শব্দে, ঘব পরিপূরিত হইল।

ক্রমে শব্দ থামিল, অন্ধকার দূর হইল, বাতির আলোকে পুনরায় ঘর আলোকিত হইল।

তখন কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, খেতু বিছানায় পড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। কঙ্কাবতী দৌড়িয়া গিয়া নাকেশ্বরীর পায়ে পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ও গো! তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। ও গো! আমি বড় দুঃখিনী, আমি কাঙ্গালিনী কঙ্কাবতী! কত দুঃখ পাইয়া আমি এই প্রাণসম পতিকে পাইয়াছি। পৃথিবীতে এই পতি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। ও গো! আমার স্বামীকে না মারিয়া তুমি আমার প্রাণ বধ কর। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। আমরা তোমার এ ধন চাহি না, কিছু চাহি না। আমার পতিকে তুমি দাও, আমার

দূর ! দূর !

পতিকে লইয়া আমি ঘরে যাই। তোমার যাহা কিছু টাকা লইয়াছি, সব ফিরিয়া দিব। মানুষ খাইতে যদি তোমার সাধ হইয়া থাকে, তুমি আমাকে খাও, তুমি আমার রক্ত পান কর। আমার স্বামীকে তুমি কিছু বলিও না, স্বামীকে আমার দেশে ফিরিয়া যাইতে দাও।”

নাকেশ্বরীর পা ধরিয়া কঙ্কাবতী এই রূপে কাঁদিতে লাগিলেন, নানা মতে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সে খেদের কথা শুনিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়! নাকেশ্বরীর মনে কিন্তু কিছু মাত্র দয়া হইল না, নাকেশ্বরী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। কঙ্কাবতী যত কাঁদেন, আর নাকেশ্বরী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া কেবল বলে, —“দূর! দূর!”

কঙ্কাবতী বলিলেন,—“ও গো! আমার স্বামীকে ছাড়িয়া আমি এখান হইতে দূর হইব না। আমার স্বামীকে দাও, আমি এখান হইতে এখনি দূর হইতেছি। স্বামি স্বামি! উঠ! চল আমরা এখান হইতে যাই, স্বামি উঠ!”

কঙ্কাবতী যত কাঁদেন, যত বলেন, হাত উত্তোলন করিয়া নাকেশ্বরী তত বলে,—“দূর, দূর!”

কঙ্কাবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু মুছিলেন। তাহার পর আরক্ত-নয়নে দর্পের সহিত নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—“আমার স্বামীকে দিবে না? আমাকেও খাইবে না? কেবল—‘দূর, দূর!’ মুখে অন্য কথা নাই? বটে! তা নাকেশ্বরীই হও, আর যাই হও? আজ তোমার এক দিন, কি আমার এক দিন!”

এই কথা বলিয়া পাগলিনী উন্মাদিনীর ন্যায়, কঙ্কাবতী নাকে-

শ্বরীকে ধরিতে যাইলেন। কোনও উত্তর না করিয়া, নাকেশ্বরী কেবল মাত্র একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই নিশ্বাসের প্রবল বেগে কঙ্কাবতী একেবারে দ্বারের নিকট গিয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী পুনরায় উঠিলেন, পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে ধরিতে দৌড়িলেন। নাকেশ্বরী আর একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিল, আর কঙ্কাবতী একেবারে অট্টালিকার বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

তখন কঙ্কাবতী আস্তে-ব্যস্তে পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে বলিলেন, —"ওগো! তোমাকে আমি আর ধরিতে যাইব না, তোমাকে আমি মারিব না। আমি আমার স্বামীকে আর ফিরিয়া চাই না। এখন কেবল এই চাই যে, স্বামী হইতে তুমি আমাকে পৃথক করিও না। স্বামীর পদ-যুগল ধরিয়া আমাকে মরিতে দাও। যদি মারিবে তো আমাদের দুই জনকেই এক সঙ্গে মার, যদি খাইবে তো আমাদের দুই জনকেই এক সঙ্গে খাও। আর তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তোমার নিকট এখন কেবল এই প্রার্থনাটী করি। ইহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী পুনরায় ঘরের দিকে দৌড়িলেন। কোনও কথা না বলিয়া নাকেশ্বরী আর একটী নিশ্বাস ছাড়িল, আর কঙ্কাবতী একেবারে পর্ব্বতের বাহিরে বনের মাঝখানে গিয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

ব্যাঙ সাহেব

বনের মাঝে কঙ্কাবতী একবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন। বার বার উঠিয়া-পড়িয়া শরীর তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। শরীরের নানা স্থান হইতে শোণিত-ধারা বহিতেছিল। কঙ্কাবতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। উঠিয়াই বা কি করিবেন? স্বামীর নিকট যাইতে গেলেই, নাকেশ্বরী আবার তাঁহাকে নিশ্বাসের দ্বারা দূরীকৃত করিবে। বনের মাঝে পড়িয়া কঙ্কাবতী অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া তিনি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পাইলেন না, এখন কেবল এই দুঃখ তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর তাঁহার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—"আচ্ছা! তাই ভাল! স্বামী ভিতরে থাকুন, আমি এই বাহিরে পড়িয়া থাকি। তাঁহার পদ-যুগল ধ্যান করিতে করিতে এই বাহিরেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন। মরিয়া আমি তাঁহাকে পাইব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কঙ্কাবতী স্বামীর পা দুটী মনে মনে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন,—উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ, অল্প আয়তন, চম্পক-কলি-সদৃশ-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট, সেই পা দু-খানি মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

একাবিষ্ট চিত্তে এইরূপ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় কঙ্কাবতীর মনে একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—"ভাল! ভূতিনী, প্রেতিনী, ডাকিনীতে মনুষ্যের মন্দ করিলে, তাহার তো উপায় আছে! পৃথিবীতে অনেক গুণী মনুষ্য আছেন, তাঁহারা মন্ত্র জানেন, তাঁহারা তো ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন! কেন বা আমার স্বামীকে তাঁহারা রক্ষা করিতে না পারিবেন? আর, যদি একান্তই আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা না হয়, তাঁহার মৃতদেহ তো আমি পাইব! তাহা লইয়া পুড়িয়া মরিতে পারিলেও আমি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব। যাহা হউক, আমি আমার স্বামীকে নাকেশ্বরীর হাত হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিব,—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব না। হই না কেন স্ত্রীলোক? আমি কি মানুষ নই? পতির হিত-কামনায়, আমি সমুদয় জগৎকে তৃণ জ্ঞান করি,—কাহাকেও আমি ভয় করি না।"

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কঙ্কাবতী চক্ষু মুছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। এখন লোকালয়ে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু লোকালয় কোন্ দিকে, তাহা তো তিনি জানেন না! উত্তরমুখে যাইতে খেতু বলিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর কোন্ দিক্? বিস্তীর্ণ তমোময় সেই বন-কান্তারে দিক্ নির্ণয় করা তো সহজ কথা নহে! রাত্রি এখনও প্রভাত হয় নাই, সূর্য্য এখনও উদয় হন নাই; তবে কোন্ দিক উত্তর, কোন্ দিক দক্ষিণ, কিরূপে তিনি জানিবেন?

তাই তিনি ভাবিলেন,—"যেদিকে হয় যাই। একটা না একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইব। লোকালয়ে গিয়া সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিব। কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কাল বিলম্ব করিলে আমার আশা হয় তো ফলবতী হইবে না।"

বন-জঙ্গল, গিরি-গুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কঙ্কাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কত দূর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্য উদয় হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জন-মানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

"কি করি, কোন্ দিকে যাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি", কঙ্কাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে একটী ব্যাঙ দেখিতে পাইলেন। ব্যাঙের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া কঙ্কাবতী বিস্মিত হইলেন। ব্যাঙের মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেণ্ট্‌লেন। ব্যাঙ, সাহেবের পোষাক পরিয়াছেন। ব্যাঙকে আর চেনা যায় না। রংটী কেবল ব্যাঙের মত আছে, সাবাং মাখিয়াও রংটী সাহেবের মত হয় নাই। আর, পায়ে জুতা নাই। জুতা এখনও কেনা হয় নাই, ইহার পর তখন কিনিয়া পরিবেন। আপাততঃ সাহেবের সাজ পরিয়া, দুই পকেটে দুই হাত রাখিয়া, সদর্পে ব্যাঙ চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া, এই ঘোর দুঃখের সময়ও, কঙ্কাবতীর মুখে ঈষৎ একটু হাসি দেখা দিল। কঙ্কাবতী মনে করিলেন,—"ইঁহাকে আমি পথ জিজ্ঞাসা করি।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! গ্রাম কোন্ দিকে? কোন্ দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে গিয়া পৌঁছিব?"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—"হিট্, মিট্, ফ্যাট"।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কোন দিক্ দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়?"

ব্যাঙ বলিলেন,—"হিশ্, ফিশ্, ড্যাম্।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! আমি দেখিতেছি,—আপনি ইংরেজি কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজি পড়ি নাই, আপনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গলা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।"

ব্যাঙ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাঙ্গলা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে "নেটিব" মনে করিবে। যখন দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গলা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

কঙ্কাবতীর দিকে কোপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ-ভাবে ব্যাঙ বলিলেন,—"কোথাকার ছুঁড়ী রে তুই? আ গেল যা! দেখিতেছিস, আমি সাহেব! তবু বলে, ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই! কেন? সাহেব বলিতে তোর কি হয়?"

ব্যাঙ-সাহেব

হিট্ মিট্ ফ্যাট

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ সাহেব! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।"

এই কথা শুনিয়া ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মোলো যা! এ হতভাগা ছুঁড়ীর রকম দেখ! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাহ্য হয় না। কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় না কি? আমার নাম, মিষ্টার গমীশ।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে, মিষ্টার গমীশ! আমি লোকালয়ে যাইব কোন দিক দিয়া, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। আমার নাম কঙ্কাবতী। বড় বিপদে আমি পড়িয়াছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতির চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অনুসন্ধান করিতেছি। রতি মাত্র বিলম্ব আর করিতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া বলিয়া দিন্, কোন্ দিক দিয়া আমি গ্রামে যাই।"

কঙ্কাবতী তাঁহাকে সাহেব বলিলেন, কঙ্কাবতী তাঁহাকে মিষ্টার গমীশ বলিয়া ডাকিলেন, সে জন্য ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল!

কঙ্কাবতীর প্রতি হৃষ্ট হইয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি সাহেব হইয়াছি কেন, তা জান?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা না! তা আমি জানি না।

মহাশয়! গ্রামে কোন দিক দিয়া যাইতে হয়? গ্রাম এখান হইতে কত দূর?"

ব্যাঙ বলিলেন,—"দেখ লঙ্কাবতী! তোমার নাম লঙ্কাবতী বলিলে বুঝি? দেখ লঙ্কাবতী! এক দিন আমি এই বনের ভিতর বসিয়াছিলাম। হাতী সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিলাম, আমার মান মর্য্যাদা রাখিয়া, আমাকে ভয় করিয়া, হাতী অবশ্যই পাশ দিয়া যাইবে। একবার আস্পর্দ্ধার কথা শুন! দুষ্ট হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল! রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আমার ভয়ে তাই সবাই সদাই সশঙ্কিত। আমি ভাবিলাম, হাতীকে একবার উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতীকে বলিলাম, —'উট্‌কপালী চিরুণ-দাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে?' কেমন বেশ ভাল বলি নাই, লঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমার নাম 'কঙ্কাবতী'; 'লঙ্কাবতী' নয়। আপনি উত্তম বলিয়াছেন। গ্রামে যাইবার পথ আপনি বলিয়া দিলেন না? তবে আমি যাই, আর আমি এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"শুন না! অত তাড়াতাড়ি কর কেন? দুষ্ট হাতীর এক বার কথা শুন। আমি রাগিয়াছি দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয় হইল না! হাতীটা উত্তর করিল,—'থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাব্‌ড়া-নাকী, ধর্ম্মে রেখেছে তোরে!' হাঁ কঙ্কাবতী! আমার কি থ্যাব্‌ড়া নাক?"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, এই নাক লইয়া কাঁকড়ার অভিমান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি এই ভেকটীরও সেই অভিমান।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"না, না! কে বলে আপনার থ্যাব্ড়া নাক? আপনার চমৎকার নাক! মহাশয়! এই দিক দিয়া কি গ্রামে যাইতে হয়?"

কিছু ক্ষণের নিমিত্ত ব্যাঙ একটু চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কখন পথ বলিয়া দেন, সেই প্রতীক্ষায় একাগ্র-চিত্তে কঙ্কাবতী ব্যাঙের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্থির গম্ভীর ভাবে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে ব্যাঙ বলিলেন,—"তবে বোধ হয়, কথার মিল করিবার নিমিত্ত তাই আমাকে 'থ্যাব্ড়া-নাকী' বলিয়াছে। কারণ, এই দেখ না? আমার কথায়, আর হাতীর কথায় উত্তম মিল হয়—

উট্-কপালী চিরুণ দাঁতী বড় যে ডিঙ্গুলি মোরে?
থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাব্ড়া-নাকী ধর্ম্মে রেখেছে তোরে!

কঙ্কাবতী! কবিতাটী খবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না? কিন্তু ইহাতে আমার নিন্দা আছে, থ্যাব্ড়া নাকের কথা আছে। তাই খবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনিলে তো এখন? হাতির একবার আস্পর্দ্ধার কথা! তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেই জন্য এই সাহেবের পোষাক পরিয়াছি। কেমন? আমাকে ঠিক সাহেবের মত দেখাইতেছে তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয়

করিবে। যখন রেল গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে, আর বলিবে, 'ও গাড়ীতে সাহেব রহিয়াছে!' কেমন কঙ্কাবতী! এ পরামর্শ ভাল নয়?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"উত্তম পরামর্শ? এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পথ বলিয়া দিন! আর যদি না দেন, তো বলুন আমি চলিয়া যাই।"

কানে হাত দিয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিলে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কোন্ পথ দিয়া গ্রামে যাইব? গ্রাম এখান হইতে কত দূর? কত ক্ষণে সেখানে গিয়া পৌঁছাইব?"

ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ত্রৈরাশিক জান?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"অল্প অল্প জানি।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"তবে শ্লেট পেন্সিল নাও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! এ সময়ে আমার সহিত বিদ্রূপ করিবেন না। শোক-সাগরে আমি এখন নিমগ্ন। দুঃখে এখন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। আমার সহিত এখন অধিক কথা কহিবেন না। গল্প করিবার আমার এ সময় নয়। পথ বলিয়া দিন, চলিয়া যাই। পতির প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত প্রতিকার করি।"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—"আমি বিদ্রূপ করি নাই। অঙ্ক না কষিয়া কি করিয়া বলি,—তুমি কত ক্ষণে গ্রামে গিয়া পৌঁছিবে? যাই হউক, তোমার কাছে শ্লেট পেনসিল না থাকে তো মুখে

মুখে কষিলেই হইবে। তবে একবার লাফাও দেখি! এক লাফে কতদূর যাইতে পার দেখি! এই গুলি সব ত্রৈরাশিকের রাশি। এই গুলি পাইলে হিসাব করিয়া বলিব,—তুমি কতক্ষণে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে। কারণ, সকলকার লাফ তো আর সমান নয়!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! আপনাদিগের মত আমরা লাফাইয়া পথ চলি না। আমি লাফাইতে জানি না।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"ঐ তো দোষ! এখন ত্রৈরাশিকের রাশি কোথা পাই? কঙ্কাবতী! তুমি তার কিছু সন্ধান জান? মাটীর ভিতর গর্ত্তে তো নাই? গাছের কোটরে তো নাই? কঙ্কাবতী! তুমি গিয়া ত্রৈরাশিকের রাশি তিনটীকে ধরিয়া আনিতে পার?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি তা জানি না, আমাকে আপনি পথ বলিয়া দিন!"

ব্যাঙ বলিলেন,—"তবে এই অঙ্কটা কষিয়া আমাকে উত্তর বল। যদি দুই জন লোকে দুই দিনে এক হাত প্রাচীর গাঁথে, তাহা হইলে দুই হাজার লোক এক হাত প্রাচীর কত দিনে গাঁথিবে?"

কঙ্কাবতী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"উত্তর—১/৫০০, এক দিনের পাঁচশত ভাগের এক ভাগ।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"ভুল! যদি চব্বিশ ঘণ্টায়ও দিন ধরি, তাহা হইলে তোমার উত্তরে তিন মিনিট হয়। গাঁথিতে তো

হইবে,—এক হাত প্রাচীর; এ দু'হাজার লোক দাঁড়ায় কোথা যে, তিন মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা করিবে?"

কঙ্কাবতী মনে মনে করিলেন,—"সত্য বটে, এ দুই সহস্র লোক কোথায় দাঁড়াইয়া প্রাচীর গাঁথিবে?"

তাহার পর ব্যাঙ বলিলেন,—"যখন এ অঙ্কটি ভাল করিয়া কষিতে পারিলে না, তখন আর একটী অঙ্ক তোমাকে করিতে হইবে। মনে কর যে, আমার একটী আধুলি আছে। আমি সেটী এক জনকে ধার দিলাম। কিস্তিবন্দী করিয়া সে ধার শোধ দিবে,—তাহার সহিত এইরূপ নিয়ম হইল, প্রতিদিন হিসাব হইবে, যাহা কিছু বাকি থাকিবে, তাহার সে অর্দ্ধেক দিয়া যাইবে। কঙ্কাবতী। বল, কয় দিনে সে আমার আধুলিটী পরিশোধ করিবে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"এটী সহজ আঁক। ছয় দিনে সমুদয় শোধ হইয়া যাইবে।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"আমিও তাই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া এখন আমার মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আচ্ছা, কি করিয়া ছয় দিনে শোধ যাইবে? তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আধুলির অর্দ্ধেক চারি আনা, প্রথম দিন সে চারি আনা দিবে। বাকি রহিল,—চারি আনা। চারি আনার অর্দ্ধেক দুই আনা, দ্বিতীয় দিনে সে দুই আনা দিবে। বাকি রহিল,—দুই আনা। দুই আনার অর্দ্ধেক এক আনা, তৃতীয় দিনে সে এক আনা দিবে। বাকি রহিল,—এক আনা।

এক আনার অৰ্দ্ধেক দুই পয়সা, চতুর্থ দিনে সে দুই পয়সা দিবে। বাকি রহিল,—দুই পয়সা। দুই পয়সার অৰ্দ্ধেক এক পয়সা, পঞ্চম দিনে সে এক পয়সা দিবে। বাকি রহিল,—এক পয়সা। ষষ্ঠ দিনে সেই পয়সাটী দিয়া দিলেই সব শোধ হইয়া হইয়া যাইবে।”

ব্যাঙ বলিলেন,—“তাহা কি করিয়া হইবে? ষষ্ঠ দিনে সে পূরাপূরি এক পয়সা দিবে কেন? যাহা বাকি থাকিবে, তাহার সে অৰ্দ্ধেক দিবে তো? এক পয়সায় হয় পাঁচ গণ্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। ষষ্ঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন সে আমাকে পাঁচ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পরদিন স-কড়া, তার পরদিন তার অৰ্দ্ধেক, পরদিন তার অৰ্দ্ধেক, পরদিন তার অৰ্দ্ধেক—”

অতি চমৎকার সুমিষ্ট কান্না-স্বরে ব্যাঙ এইবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—“ওগো! মা গো! এ যে আর কখনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটী যে আর কখন পূরাপূরি হবে না গো! ওগো আমি কোথায় যাব গো! জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্ব্বস্ব গেল গো! ওগো আমার যে ঐ আধুলিটী বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো! ওগো তা লইয়া মানুষে যে কত ঠাট্টা করে গো! ‘ব্যাঙের আধুলি’, ‘ব্যাঙের আধুলি’ বলিয়া মানুষে যে হিংসায় ফাটিয়া মরে গো! ওগো মা গো! আমার কি হ'ল গো!”

ব্যাঙ সুর করিয়া, বিনিয়ে বিনিয়ে এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! কাঁদিবেন না, চুপ করুন, ধৈর্য্য ধরুন।"

ব্যাঙ পুনরায় স্বর তুলিলেন,—"ওগো! আমার যে ঐ আধুলিটী বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ছি মহাশয়! চুপ করুন, কাঁদিতে নাই। আপনি সাহেব মানুষ। কত আধুলি আপনি উপার্জ্জন করিবেন।"

ব্যাঙ পুনরায় স্বর ধরিলেন,—"ওগো! জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্ব্বস্ব গেল গো! ওগো মা গো!"

কঙ্কাবতী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, হাতে মুখে জল দিয়া শান্ত করিলেন।

অবশেষে ব্যাঙ আধ-কান্না স্বরে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বলিলেন,—"ওগো! আমি যে মনে করিয়াছিলাম,—দুই দণ্ড বসিয়া তোমাব সঙ্গে গল্প-গাছা করিব গো! ওগো তা যে আর হইল না গো! ওগো আমার যে শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল গো। ওগো তুমি ঐ দিক দিয়া যাও গো; তাহা হইলে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে গো! ওগো সে যে অনেক দূর গো! ওগো আজ সেখানে যাইতে পারিবে না গো! ওগো তোমরা যে আমাদের মত লাফাইতে পার না গো! ওগো তোমরা যে গুটি-গুটি চলিয়া যাও গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া আমার যে হাসি পায় গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া আমার যে কান্না পায় না গো! ওগো তুমি যে মেয়েটী ভাল গো! ওগো লেখা-পড়া শিখিয়া তুমি যে মন্দা-মেয়েমানুষ হওনি গো! ওগো

তুমি যে ধীর, শান্ত, লজ্জাশীলা পতিপরায়ণা গো। ওগো। তুমি যে মদ্দা-মেয়েমানুষ কি মেয়ে জ্যাঠা নও গো! ওগো! আমার যে আধুলিটী এইবার জন্মের মত গেল গো! ওগো! আমার কি হইল গো! ওগো মা গো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

পচাজল

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"একে আপনাব দুঃখে মবি, তাহাব উপব এ আবার এক জ্বালা। যাহা হউক, ব্যাঙেব কান্না এখন একটু থামিয়াছে, এই বাব আমি যাই।"

ব্যাঙ যেরূপ বলিয়া দিলেন, কঙ্কাবতী সেই পথ দিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও বন পার হইতে পাবিলেন না। যখন সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখন তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পডিলেন, আব চলিতে পারিলেন না। বনের মাঝখানে এক খানি পাথবেব উপব বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাথরের উপর বসিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতেছেন, এমন সময় মৃদুমন্দ মধুর তানে গুন্‌গুন্ করিয়া কে তাঁহার কানে বলিল,—"তোমরা কাবা গা? তুমি কাদের মেয়ে গা?"

কঙ্কাবতী এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, একটী অতি ক্ষুদ্র মশা তাঁহাব কানে কানে এই কথা বলিতেছে। মশাটীকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সেটী নিতান্ত বালিকা-মশা।

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মানুষের মেয়ে গো! আমাব নাম কঙ্কাবতী।"

মশা-বালিকা বলিলেন,—"মানুষের মেয়ে! আমাদের খাবার? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আসেন? খাই বটে, কিন্তু মানুষ কখনও দেখি নাই। আমরা ভদ্র-মশা কি-না? তাই আমরা ওসব কথা জানি না। আমি কখনও মানুষ দেখি নাই। কিরূপ গাছে মানুষ হয়, তাও আমি জানি না। কৈ? দেখি দেখি! মানুষ আবার কিরূপ হয়!"

এই বলিয়া মশা-বালিকা, কঙ্কাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

ভাল করিয়া দেখিয়া, শেষে মশা-বালিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ধাড়ি মানুষ নও, বাচ্ছা মানুষ;—না?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"নিতান্ত ছেলে-মানুষ নই, তবে এখনও লোকে আমাকে বালিকা বলে।"

মশা-বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি বলিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমার নাম, কঙ্কাবতী।"

মশা-বালিকা বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে। আমার নাম, রক্তবতী! ছেলেবেলা রক্ত খাইয়া পেটটী আমার টুপ্‌টুপে হইয়া থাকিত, বাবা তাই আমার নাম রাখিয়াছেন,—রক্তবতী। আমাদের দুই জনের নামে নামে বেশ মিল হইয়াছে, রক্তবতী আর কঙ্কাবতী। এস ভাই! আমরা দুইজনে কিছু একটা পাতাই।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি এখন বড় শোক পাইয়াছি। আমি এখন ঘোর মনোদুঃখে আছি। আমি এখন পতিহারা সতী। তুমি

বালিকা; সে সব কথা বুঝিতে পারিবে না। কিছু পাতাইয়া আহ্লাদ-আমোদ করি, এখন আমার সে সময় নয়।"

রক্তবতী বলিলেন,—"তুমি পতিহারা সতী! তার জন্য আর ভাবনা কি? বাবা বাড়ী আসুন, বাবাকে আমি বলিব। বাবা তোমার কত পতি আনিয়া দিবেন! এখন এস ভাই। কিছু একটা পাতাই। কি পাতাই বল দেখি? আমি পচা-জল বড় ভালবাসি। যেখানে পচা-জল থাকে, মনের সুখে আমি সেইখানে উড়িয়া বেড়াই,—পচাজলের ধারে উড়িয়া উড়িয়া আমি কত খেলা করি। তোমার সহিত আমি 'পচাজল' পাতাইব। তুমি আমার 'পচাজল', আমি তোমার 'পচাজল'! কেমন! এখন মনের মত হইয়াছে তো?"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"ইহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। বুড়ো মিন্‌সে ব্যাঙ, তারেই বড় বুঝাইয়া পারিলাম, তা এতো একটী সামান্য বালিকা-মশা। ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই। ইহাদের যাহা ইচ্ছা হয়, করুক; আমি আর কোনও কথা কহিব না।"

কঙ্কাবতী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই ভাল! আমি তোমার পচাজল, তুমি আমার পচাজল। হা জগদীশ্বর! হে হৃদয় দেবতা! তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়! সেখানে তোমার কি দশা, আর এখানে আমার কি দশা!"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী বার বার নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে লাগিলেন।

পচাজলের দুঃখ দেখিয়া মশা-বালিকাটীরও দুঃখ হইল।

মশা-বালিকাটী বুঝিতে পারেন না যে, তাঁর পচাজল এত কাঁদেন কেন? গুন্ গুন্ করিয়া কঙ্কাবতীর চারিদিকে তিনি উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—“পচাজল! তোমার ভাই! আর দুটী পা কোথায় গেল? উপরের দুটী পা আছে, নীচের দুটী পা আছে, মাঝের দুটী পা কোথায় গেল? ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুঝি? ওঃ! সেই জন্য তুমি কাঁদিতেছ? তার আবার কান্না কি, পচাজল? খেলা করিতে করিতে আমারও একটী পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই দেখ, সে পা-টী পুনরায় গজাইতেছে। তোমারও পা সেইরূপ গজাইবে, চুপ কর,— কাঁদিও না!”

কঙ্কাবতী বলিলেন,—“আমার পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই। তোমা-দের মত আমাদের পা নয়; আমাদের পা এইরূপ। পায়ের জন্য কাঁদি নাই।”

মশা-বালিকা পুনরায় গুন্ গুন্ করিয়া উড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘুরিয়া, কঙ্কাবতীর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদয় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে কঙ্কাবতীর নাকের কাছে গিয়া বলিলেন,—“একি ভাই, পচাজল! সর্ব্বনাশ! তোমার নাক কোথায় গেল? তোমার নাকটী কে কাটিয়া নিল? আহা! তোমার নাক নাই তো খাবে কি দিয়া?”

মশা-বালিকা কি বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা প্রথম বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিলেন যে, সে শুঁড়ের কথা বলিতেছে।

কঙ্কাবতী মনে করিলেন যে, “এ মশা-বালিকাটী নিতান্ত শিশু, এখনও ইহার কিছু মাত্র জ্ঞান হয় নাই।”

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—“পচাজল! আমাদের নাক এইরূপ। তোমাদের নাক যেরূপ দীর্ঘ, আমাদের নাক সেরূপ লম্বা নয়। আমরা নাক দিয়া খাই না, আমরা মুখ দিয়া খাই।”

রক্তবতী বলিলেন,—“আহা! তবে, পচাজল! তোমার কি দুরদৃষ্ট, যে আমার মত তোমার নাক নয়। এই বড নাকে আমাকে কেমন দেখায়, দেখ দেখি? জলের উপর গিয়া আমি আমার মুখ খানি দেখি, আর মনে মনে কত আহ্লাদ করি। মা বলেন যে, ‘বড হইলে আমার রক্তবতী একটী সাক্ষাৎ সুন্দরী হইবে।’ তা ভাই পচাজল! তোমাকেও আমি সুন্দরী করিব। বাবা বাড়ী আসিলে বাবাকে বলিব, তিনি তোমার নাকটী টানিয়া বড় করিয়া দিবেন। তখন তোমাকে বেশ দেখাইবে।”

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—“আবার সেই নাকের কথা! নাক নাক করিয়া ইহারা সব সারা হইয়া গেল। কাঁকড়া নাকের কথা বলিয়াছিল। ব্যাঙ বলিয়াছিল, এই মশা-বালিকাও সেই কথা বলিতেছে। তার পর সেই নাকেশ্বরীর নাক! উঃ! কি ভয়ানক!”

কঙ্কাবতী আরও ভাবিতে লাগিলেন,—“এই ঘোর দুঃখের সময় আমি বড় বিপদেই পড়িলাম। কোথায় তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়া চিকিৎসক আনিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিব; না,—ওখানে ব্যাঙ, এখানে মশা,—সকলে মিলিয়া আমাকে বিষম জ্বালাতনে ফেলিল! ব্যাঙের হাত এড়াইতে না এড়াইতে মশার হাতে

আসিয়া পাড়লাম। মশার একরত্তি মেয়েটী তো এই রঙ্গ করিতে-ছেন; আবার ইহার বাপ বাড়ী আসিয়া যে কি রঙ্গ করিবেন। তা তো বলিতে পারি না!”

রক্তবতী বলিলেন,—“ঐ যে পাতাটী দেখিতেছ, পচাজল! যার কোণটী কুঁকড়ে রহিয়াছে? উহার ভিতর আমাদের ঘর। আমার মা’রা উহার ভিতরে আছেন। আমার তিন মা। বাবা চরিতে গিয়াছেন। বাবা এখনি কত খাবার আনিবেন। যাই, মা’দের বলিয়া আসি যে, আমার পচাজল আসিয়াছে।”

এই বলিয়া রক্তবতী ঘরের দিকে উড়িয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে রক্তবতী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—“পচাজল! মা তোমাকে ডাকিতেছেন। উঠ। চল, আমার মা’র সঙ্গে দেখা করিবে।”

কঙ্কাবতী করেন কি? ধীরে ধীরে উঠিলেন। মশাদের ঘর, সেই কোঁকড়ানো পাতাটীর কাছে যাইলেন।

একটী নবীনা মশানী কুঞ্চিত পত্রকোণ হইতে ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিলেন,—“হাঁ গা বাছা! তুমি আমার রক্তবতীর সহিত পচাজল পাতাইয়াছ? তা বেশ করিয়াছ। রক্তবতী আমাদের বড় আদরের মেয়ে। কর্ত্তার এত বিষয়-বৈভব তা আমার এই রক্তবতীই তাঁর একমাত্র সন্তান। তা, হাঁ গা বাছা! রক্তবতী কি তোমার পতির কথা বলিতেছিল? কি হইয়াছে?”

কঙ্কাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“ওগো আমি বড় দুঃখিনী! আমি বড় শোক পাইয়াছি। পৃথিবী আমি অন্ধকার

দেখিতেছি। যদি আমার পতিকে আমি না পাই, তবে এ ছার প্রাণ আমি কিছুতেই রাখিব না। আমার পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালয়ে যাইতেছি। সেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার স্বামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরায় আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। কিন্তু আমি পথ জানি না, অন্ধকারে আমি পথ দেখিতে পাইব না। তোমরা আমাকে একটু যদি পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"

মশানী বলিলেন,—"ছেলে মানুষ, বালিকা তুমি, তোমার কোনও জ্ঞান নাই! একে আমরা স্ত্রীলোক; তায় যে-সে মশার স্ত্রী নই, গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত মশার স্ত্রী; তাতে আমরা পর্দ্দানশীন। আমাদিগের কি ঘরের বাহিরে যাইতে আছে, বাছা? না,—আমরা পথ-ঘাট জানি? তুমি কাঁদিও না। কর্ত্তা বাড়ী আসুন, কর্ত্তাকে আমি ভাল করিয়া বলিব। তুমি এখন আমাদের কুটুম্ব,—রক্তবতীর পচাজল। যাহা ভাল হয়, তোমার জন্য কর্ত্তা অবশ্যই করিবেন। তুমি একটু অপেক্ষা কর।"

কঙ্কাবতীর সহিত যিনি এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, তিনি রক্তবতীর মা;—মশার ছোট-রাণী। এইবার মশার বড়-রাণী পাশ দিয়া একটু মুখ বাড়াইলেন।

বড়-মশানী বলিলেন,—"ওটা একটা মানুষের ছানা, বুঝি? আমি ওরে পুষিব। আমার ছেলে পিলে নাই; অনেক দিন

ধরিয়া আমার মনে সাধ আছে যে, জীব জন্তু কিছু একটা পুষি। তা ভাল হইয়াছে, ঐ মানুষের ছানাটা এখানে আসিয়াছে, ওটাকে আমি পুষিব। কিছু বড় হইয়া গিয়াছে সত্য, তা যাই হউক, এখনও পোষ মানিবার সময় আছে। মানুষে, শুনিয়াছি, মেষ, ছাগল, পায়রা এই সব খায়, আবার সাধ করিয়া তাদের পোষে। এই মানুষের ছানাটাকে পুষিলে, ইহার উপর আমার মায়া পড়িবে। ইহাকে খাইতে তখন আর আমার ইচ্ছা হইবে না।"

মেজ-মশানী আর একপাশ দিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন,—"দিদি! তোমার যেমন এক কথা! মানুষের ছানাটাকে যদি পুষিবে তো যা'তে কাজে লাগে, এরূপ করিয়া পুষিয়া রাখ। মানুষে যেরূপ দুধের জন্য গরু পোষে, সেইরূপ করিয়া ইহাকে ঘরে পুষিয়া রাখ। কর্ত্তা কতদূর হইতে রক্ত লইয়া আসেন। আনিতে আনিতে রক্ত বাসি হইয়া যায়। মানুষ একটা ঘরে পোষা থাকিলে, যখন ইচ্ছা হইবে, তখন টাট্‌কা রক্ত খাইতে পাইব।"

রক্তবতীর মা বলিলেন,—"তোমাদের সব এক কথা! সব তা'তেই তোমাদের প্রয়োজন! ছেলে-মানুষ, রক্তবতী, মানুষের ছানাটাকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে; পুষিতে কি খাইতে সে তোমাদিগকে দিবে কেন? ছেলের হাতের জিনিসটা তোমরা কাড়িয়া লইতে চাও! তোমাদের কিরূপ বিবেচনা বল দেখি? আসুন, আজ কর্ত্তা আসুন, তাঁহাকে সকল কথা বলিব। এ সংসারে

আর আমি থাকিতে চাই না। আমাকে তিনি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিন্। আমার বাপ ভাই বাঁচিয়া থাকুক, আমার ভাবনা কিসের? আমি ছন্নছাড়া আঁটকুড়োদের মেয়ে নই। আমার চারি দিকে সব জাজ্বল্যমান!"

বড়-মশানী বলিলেন,—"আঃ মর্! ছুঁড়ীর কথা শুন! বাপ-ভাইয়ের গরবে ওঁর মাটিতে আর পা পড়ে না। বাপ-ভাইয়েব মাথা খাও!"

এইরূপে তিন সপত্নীতে ধুন্ধুমার ঝগড়া বাধিয়া গেল। কঙ্কাবতী অবাক্! কঙ্কাবতী মনে কবিলেন,—"ভাল কথা! জীবজন্তুর মত ইহারা আমাকে পুষিতে চায়!"

তিন সতীনে ঝগড়া ক্রমে একটু থামিল। কখন্ মশা ঘবে আসিবেন, সেই প্রতীক্ষায় কঙ্কাবতী সেই খানে বসিয়া রহিলেন। অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তবু মশা ফিরিলেন না।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা! তোমাদের কর্ত্তার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?"

ছোট রাণী বলিলেন,—"বাঁশ কাট্‌ছেন, ভার বাঁধ্‌ছেন, রক্ত নিয়ে আসছেন পারা!"

অর্থাৎ কিনা,—কর্ত্তা হয় তো আজ অনেক রক্ত পাইয়াছেন। একেলা বহিয়া আনিতে পারিতেছেন না। তাই বাঁশ কাটিয়া ভার বাঁধিয়া মুটে করিয়া রক্ত আনিতেছেন। বিলম্ব সেইজন্য হইতেছে।

কঙ্কাবতী আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তবুও মশা ঘরে ফিরিলেন না।

কঙ্কাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কর্ত্তা কখন্ আসিবেন গা? বড় যে বিলম্ব হইতেছে!"

এবার মধ্যম-মশানী উত্তর দিলেন,—"তুঁষের ধোঁ কুলোর বাতাস, কোণ নিয়েছেন পারা!"

অর্থাৎ কিনা,—চরিবার নিমিত্ত কর্ত্তা হয় তো কোনও লোকের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। সে লোক তুঁষের অগ্নি করিয়া, তাহার উপর স্বর্পের বাতাস দিয়া, ঘর ধূমে পরিপূর্ণ করিয়াছে। কর্ত্তা গিয়া ঘরের এক কোণে লুক্কায়িত হইয়াছেন, বাহির হইতে পারিতেছেন না। সেইজন্য বিলম্ব হইতেছে। একটু ধূম কমিলে বাহির হইয়া আসিবেন।

কঙ্কাবতী আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ গা! তিনি তো এখনও এলেন না! আর কত বিলম্ব হইবে?"

এইবার বড়-মশানী উত্তর করিলেন,—"কটাস কামড়, চটাস চাপড়, ম'রে গিয়েছেন পারা!"

অর্থাৎ কিনা,—কর্ত্তা হয় তো কোনও লোকের গায়ে বসিয়াছিলেন। গায়ে বসিয়া যেমন কটাস করিয়া কামড় মারিয়াছেন, আর অমনি সে লোকটী একটী চটাস করিয়া চাপড় মারিয়াছে। সেই চাপড়ে কর্ত্তা হয় তো মরিয়া গিয়াছেন।

"কর্ত্তা মরিয়া গিয়াছেন," এইরূপ অকল্যাণের কথা শুনিয়া ছোট রাণী ফোঁস করিয়া উঠিলেন! তিনি বলিলেন,—"তোমার যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আসুন কর্ত্তা! তাঁরে বলি যে, 'তুমি মরিয়া

গেলে, তোমার বড় রাণীর হাড়ে বাতাস লাগে।' তোমার মুখে চুণ-কালি দিয়া, তোমার মাথা মুড়াইয়া, তোমার মাথায় ঘোল ঢালিয়া, তোমাকে এখনি বিদায় করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মশা প্রভু

তিন সতীনে পুনরায় ঘোরতর বিবাদ বাধিল। রক্তবতী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মশার ঘরে কলহের রোল উঠিল। এমন সময় মশা বাড়ী আসিলেন। ঘরে কলহ-কচ্‌কচির কোলাহল শুনিয়া মশার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মশা বলিলেন,—"এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। তোমাদের ঝগড়ার জ্বালায়, আমাদের ঘরের কাছে গাছের ডালে কাক-চিল বসিতে পারে না। যেখানে এরূপ বিবাদ হয়, সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না,—তালুকে মনুষ্যদিগের শরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। ইচ্ছা হয় যে, গলায় দড়ি দিয়া মরি, কি বিষ খাইয়া মরি। আত্মহত্যা হইয়া আমাকে মরিতে হইবে। এই সেদিন ধর্ম্মে ধর্ম্মে আমার প্রাণটী রক্ষা হইয়াছে। আমি একজন আফিম-খোরের গায়ে বসিয়াছিলাম। তাহার রক্ত কি তিক্ত! এক শুঁড় রক্ত সব ফেলিয়া দিলাম। বার বার কুলকুচা করিয়া তবে প্রাণ রক্ষা হইল। মনে করিলাম,—অপঘাত-মৃত্যুতে মরিব? তাই এত কাণ্ড করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু তোমাদের জ্বালায় এত জ্বালাতন হইয়াছি যে, বাঁচিতে আর আমার তিল মাত্র সাধ নাই।"

এইরূপে মশা স্ত্রীগণকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার রাগ পড়িলে, তিনি একটু সুস্থির হইলে, রক্তবতী গিয়া তাঁহার কোলে বসিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! আমার পচাজল আসিয়াছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার কে? পচাজল আবার কি?"

রক্তবতীর মা উত্তর করিলেন,—"ওগো! একটী মানুষের মেয়ে। সন্ধ্যা হইতে, এখানে বসিয়া আছে। রক্তবতী তাহার সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। আহা! মেয়েটী এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত কেবল কাঁদিতেছে। বলে, 'আমি পতি-হারা সতী! আমার পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। আমি লোকালয়ে যাইব, সেখান হইতে বৈদ্য আনিয়া আমার পতিকে ভাল করিব।' আমি তাকে বলিলাম,—'বাছা! একটু অপেক্ষা কর। কর্ত্তাটী বাড়ী আসুন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার একটা উপায় করা যাইবে। তুমি যখন রক্তবতীর পচাজল হইয়াছ, তখন তোমার দুঃখ মোচন করিতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব।' রক্তবতীর পচাজল হইবে, রক্তবতী পচাজলকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবে, তোমার আর দুইটী রাণীর প্রাণে তা সহিবে কেন? তাঁদের আবার ঐ মানুষের ছানাটীকে পুষিতে সাধ হইল। সেই কথা লইয়া আমাকে তাঁরা, যা-না-তাই বলিলেন। তা, আমার আর এখানে থাকিয়া আবশ্যক নাই, তুমি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। দিয়া, দুই রাণী নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে

ঘর-কন্না কর। আমি তোমার কণ্টক হইয়াছি, আমি এখান হইতে যাই।”

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে মানুষের মেয়েটী কোথায় ?”

রক্তবতীর মা বলিলেন,—“ঐ বাহিরে বসিয়া আছে।”

রক্তবতী বলিলেন,—“বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস। আমার পচাজল কোথায়, আমি এখনি দেখাইয়া দিব।”

মশা ও রক্তবতী দুই জন উড়িলেন। বিষণ্ণ-বদনে, অশ্রু-পূরিত-নয়নে, যেখানে কঙ্কাবতী বসিয়া ছিলেন, গুন্ গুন্ করিয়া দুই জনে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—“পচাজল! এই দেখ বাবা আসিয়াছেন।”

কঙ্কাবতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া মশাকে নমস্কার করিলেন। কঙ্কাবতীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন বলিয়া, মশা গিয়া একটী ঘাসের ডগার উপর বসিলেন। তাহার পাশে আর একটী ঘাসের ডগার উপর রক্তবতী বসিলেন। মশার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া কঙ্কাবতী দণ্ডায়মান রহিলেন।

অতি বিনীতভাবে কঙ্কাবতী বলিলেন,—“মহাশয়! বিপন্না অনাথিনী বালিকা আমি। জনশূন্য এই গহন কাননে আমি একাকিনী! আমি পতিহারা সতী। আমি দুঃখিনী কঙ্কাবতী। প্রাণসম পতি আমার ভূতিনীর হস্তগত হইয়াছেন। আমার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিন। আমি আপনার শরণ লইলাম।”

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কাহার সম্পত্তি ?”

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—“মহাশয়! পূর্ব্বে আমি পিতার

সম্পত্তি ছিলাম। বাল্যকালে মনুষ্য-বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দান-বিক্রয়ের অধিকার পিতার থাকে। অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত—যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই তিনি দান-বিক্রয় করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে পিতামাতা আপন আপন বালিকাদিগকে দান-বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হন। আমাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। আমার পিতা, তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া, আমাকে আমার পতির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি, যে পতিকে হারাইয়া অনাথিনী হইয়া আজ আমি বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বে পিতার সম্পত্তি ছিলাম, এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি।"

মশা বলিলেন,—"উঁহু! সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি কোন্ মশার সম্পত্তি?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"কোন্ মশার সম্পত্তি। সে কথা তো আমি কিছু জানি না। কৈ? আমি তো কোনও মশার সম্পত্তি নই।"

মশা বলিলেন,—"রক্তবতী! তোমার পচাজল দেখিতেছি পাগলিনী, উন্মত্তা; ইহার কোনও জ্ঞান নাই। সঠিক, সত্য সত্য কথার উত্তর না পাইলে তোমার পচাজলের কি করিয়া আমি উপকার করি?"

রক্তবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল! বাবা যে কথা জিজ্ঞাসা করেন, সত্য সত্য তাহার উত্তর দাও।"

মশা বলিলেন,—"শুন, মনুষ্য-শাবক! এই ভারতে যত নর-নারী

দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিগের সম্পত্তি। যে মশা মহাশয় তোমার অধিকারী, তাঁহার নিকট হইতে বোধ হয়, তুমি পলাইয়া আসিয়াছ। সেই ভয়ে তুমি আমার নিকট সত্য কথা বলিতেছ না, আমার নিকট কথা গোপন করিতেছ! তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য সত্য আমার কথার উত্তর দাও। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,—তুমি কোন্ মশার সম্পত্তি? কোন মশা তোমার গাত্রে উপবিষ্ট হইয়া রক্ত পান করেন? তাঁহার নাম কি? তাঁহার নিবাস কোথায়? তাঁহার কয় স্ত্রী? কয় পুত্র? কয় কন্যা? পৌত্র দৌহিত্র আছে কি না? তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের তোমার উপর কোনও অধিকার আছে কি না? তাঁহারা তোমাকে এজমালিতে রাখিয়াছেন, কি তোমার হস্ত-পদাদি বণ্টন করিয়া লইয়াছেন? যদি তুমি বণ্টিত হইয়া থাক, তাহা হইলে সে বিভাগের কাগজ কোথায়? মধ্যস্থ দ্বারা তুমি বণ্টিত হইয়াছ, কি আদালত হইতে আমীন আসিয়া তোমাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে? এই সব কথার তুমি আমাকে সঠিক উত্তর দাও। কারণ, আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মানুষ আছে, মানুষের আমার অভাব নাই। আমার সম্পত্তি নর-নারীগণের দেহে যা রক্ত আছে, তাহাই খায় কে? তবে তুমি রক্তবতীর সহিত 'পচাজল' পাতাইয়াছ, সেই জন্য তোমাকে আমি একেবারে কিনিয়া লইতে বাসনা করি। তাহা যদি না করি, তাহা হইলে তোমার অধিকারী মশাগণ আমার নামে আদালতে অভিযোগ

উপস্থিত করিতে পারেন। তোমাকে এখান হইতে তাঁহারা পুনরায় লইয়া যাইতে পারেন। আমার রক্তবতী তাহা হইলে কাঁদিবে। আমি আর একটী কথা বলি, এরূপ করিয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসীদিগের যাওয়া উচিত নয়। ভারতবাসীদিগের উচিত, আপন আপন গ্রামে বসিয়া থাকা। তাহা করিলে, মশাদিগের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না। মশাগণ আপন আপন সম্পত্তি সুখে স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ করিতে পারেন। শীঘ্রই আমরা ইহার একটা উপায় করিব। এক্ষণে আমার কথার উত্তর দাও। এখন বল তোমার মশা-প্রভুর নাম কি ?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি, আমায় মশা-প্রভুর নাম আমি জানি না। মনুষ্যেরা যে মশাদিগের সম্পত্তি, তাহাও আমি এত দিন জানিতাম না। মশাদিগের মধ্যে যে মনুষ্যেরা বিতরিত, বিক্রীত ও বণ্টিত হইয়া থাকে, তাহাও আমি জানিতাম না। মশাদিগের যে আবার নাম থাকে, তাহাও আমি জানি না। তা আমি কি করিয়া বলি? যে আমি কোন্ মশার সম্পত্তি।"

ক্রোধে মশা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার নয়ন আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মশা বলিলেন,—"না, তুমি কিছুই জান না! তুমি কচি খুকীটী! গায়ে কখনও মশা বসিতে দেখ নাই! সে মশাগুলিকে তুমি চেন না! তাহাদের তুমি নাম জান না! তুমি ন্যাকা! পতিহারা সতী হইয়া কেবল পথে পথে কাঁদিতে জান!"

মশার এইরূপ তাড়নায় কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতীর পানে চাহিয়া, রক্তবতী চক্ষু টিপিলেন। সে চক্ষু-টিপুনীর অর্থ এই যে,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না! বাবা বড় রাগী মশা! একে রাগিয়াছেন, তাতে তুমি কাঁদিলে আরও রাগিয়া যাইবেন। চুপ কর, বাবাব রাগ এখনি পড়িয়া যাইবে।"

রক্তবতী যা বলিলেন, তাই হইল। কঙ্কাবতীর কান্না দেখিয়া মশা আরও রাগিয়া উঠিলেন। মশা বলিলেন,—"এ কোথাকার প্যান্‌পেনে মেয়েটা র‍্যা। ভ্যানোর্ ভ্যানোর্ করিয়া কাঁদে দেখ! আচ্ছা! যে সব কথা এতক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা-পড়া করিলাম, তার তুমি কিছুই জান না, বলিলে! এখন এ কথাটার উত্তর দিতে পারিবে কি না? ভাল! এই যে সব মানুষ হইয়াছে, এই যে কোটি কোটি মানুষ ভারতে রহিয়াছে, এ সব মানুষ কেন? কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? এ কথার আমাকে এখন উত্তর দাও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মানুষ কেন, কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? তা ত আমি জানি না।"

মশা বলিলেন,—"এঃ! এ মেয়েটা নিতান্ত বোকা! একেবারে বদ্ধ পাগল! কিছু জানে না। এই ভারতের মানুষগুলো বড় বোকা। কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। বক্তবতী শিশু বটে, কিন্তু এর চেয়ে আমার রক্তবতীর লক্ষগুণে বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। তুমি বল তো, মা, রক্তবতী, ভারতের মানুষ কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে?"

রক্তবতী বলিলেন,—"কেন বাবা! আমরা খাব বলিয়া তাই হইয়াছে!"

মশা বলিলেন,—"এখন শুনিলে ? ভারতের মানুষ কিসের জন্য হইয়াছে তা বুঝিলে ?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ ! এখন বুঝিলাম। মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মানুষের সৃজন হইয়াছে।"

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা ! আমাব পচাজল মানুষেব ছানা বই তো নয় ! মানুষেব বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই, তা সকল মশাই জানে। নির্ব্বোধ মশাকে সকলে 'মানুষ' বলিয়া গালি দেয়। সকলে বলে,— 'অমুক মশা তো মশা নয়, ওটা মানুষ।' তা, আমাদের মত পচাজলেব বোধ-শোধ কেমন করিয়া হইবে ? আমার পচাজলকে, বাবা, তুমি আর বকিও না।"

মশা ভাবিলেন,—"সত্য কথা ! মানুষের ছানাটাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমাকে নিজেই সকল সন্ধান লইতে হইবে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলি, হাঁগো মেয়ে ! এখন তোমাব বাডী কোন্ গ্রামে বল দেখি ? তা বলিতে পারিবে তো ?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের নাম, কুসুমঘাটী। মশা তৎক্ষণাৎ আপনার অনুচরদিগকে কুসুমঘাটী পাঠাইলেন। কঙ্কাবতীর প্রভুগণকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। দূতগণ কুসুমঘাটীতে উপস্থিত হইয়া, অনেক অনুসন্ধানেব পর জানিতে পারিলেন যে, কঙ্কাবতীর অধিকারী তিনটী মশা। তাঁহাদের নাম গজগণ্ড, বৃহৎ-মুণ্ড, ও বিকৃত-তুণ্ড। রক্তবতীর পিতার নাম দীর্ঘ-শুণ্ড। দূতগণ শুনিলেন যে কঙ্কাবতীর অধিকারী-গণের বাস 'আকাশমুখ' নামক শালবৃক্ষ। সেই খানে যাইয়া

কঙ্কাবতীর অধিকারীগণকে সকল কথা তাঁহারা বলিলেন। তাঁহারা দূতগণের সহিত আসিয়া অবিলম্বে দীর্ঘ-শুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক বাদানুবাদ, অনেক দর কষা-কষির পর, তিন ছটাক নররক্ত দিয়া কঙ্কাবতীকে দীর্ঘ-শুণ্ড কিনিয়া লইলেন। কঙ্কাবতীকে ক্রয় করিয়া তিনি কন্যাকে বলিলেন,—"রক্তবতী! এই নাও, তোমার পচাজল নাও! এ মানুষের ছানাটী এখন আমাদের নিজস্ব, ইহা এখন আমাদের সম্পত্তি।"

দীর্ঘ-শুণ্ড, তাহার পর, গজগণ্ড, বৃহৎ-মুণ্ড, বিকৃত-তুণ্ড প্রভৃতি মশাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহোদয়গণ! আমি দেখিতেছি আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। ভারতবাসীগণের রক্ত পান করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মশা এত দিন সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ভারতের তিন দিকে কালা-পানি, এক দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। জীব-জন্তুগণকে যেরূপ লোকে বেড়া দিয়া রাখে, ভারতবাসীগণকে এত দিন আমরা সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভারতের লোকে ভারতে থাকিয়া এত দিন আমাদিগের সেবা করিতেছিল, বিনীত ভাবে শোণিত দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ করিতেছিল। এক্ষণে কেহ কেহ মহাসাগর ও মহাপর্ব্বত উলঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ কার্য্য করিয়া, আমাদিগকে রক্ত হইতে বঞ্চিত করিলে যে তাহাদের মহাপাতক হয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। যেমন করিয়া হউক, ভারতবাসীগণকে সে দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। তাহার পর আবার, ভারতবাসীদিগের

এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন আজ কাল কিছু অধিক হইয়াছে। এই দেখুন, আজ সন্ধ্যা বেলা কুসুমঘাটী হইতে একটী মনুষ্য-শাবক আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে মনুষ্য-শাবকটী আপনাদের সম্পত্তি। আজ আপনার সম্পত্তি পলাইবে, কা'ল আমার সম্পত্তি পলাইবে। এই প্রকারে মনুষ্যেরা যদি এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যায়, তাহা হইলে সম্পত্তি লইয়া আমাদের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাহাব পর আবার বুঝিয়া দেখুন, দেশ-ভ্রমণের কি ফল। দেশভ্রমণ করিলে মনুষ্যেরা নানা নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, মনুষ্য-দিগের জ্ঞানের উদয় হয়। দেশভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগের যদি চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা হইলে, মনুষ্যগণ আর আমাদের বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে না। আবার, বাণিজ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ক্রমে তাহাবা ধনবান্ হইয়া উঠিবে। তখন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া রক্তপান হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। অতএব, যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশে গমনাগমন না করিতে পারে, যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না পায়, এরূপ উপায় সত্বর আমাদিগকে করিতে হইবে।"

দীর্ঘ-শুণ্ডের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, দীর্ঘশুণ্ড অতি বিচক্ষণ মশা, দীর্ঘ-শুণ্ডের অতি দূর-দৃষ্টি, এরূপ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ মশা পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবাসীরা যাহাতে ভবিষ্যতে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে না পারে, এরূপ উপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা
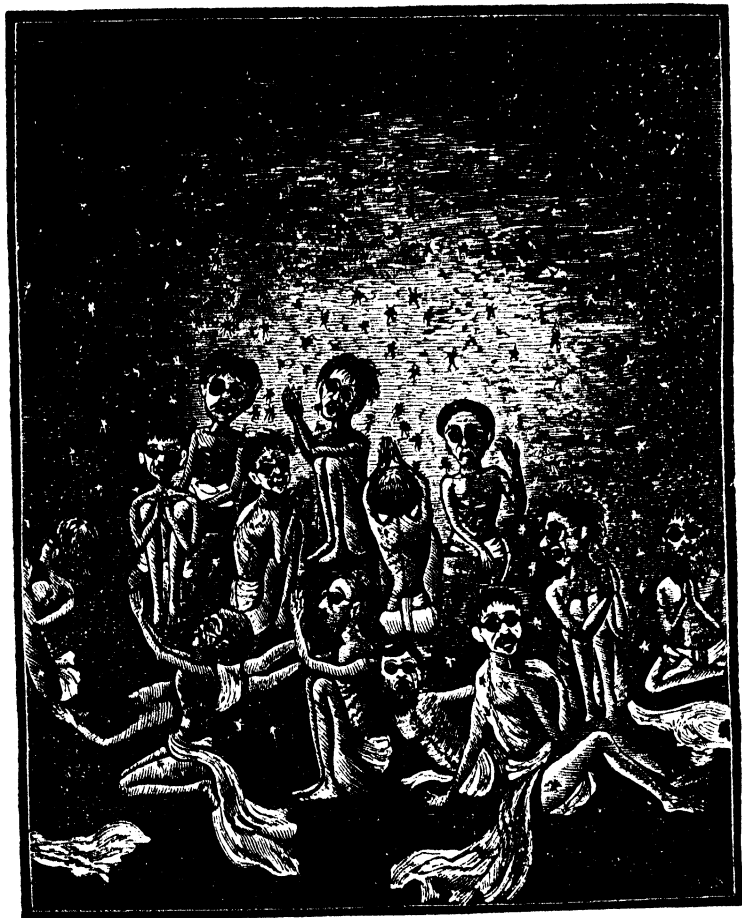
এবারকার শাস্ত্র

সকলেই স্বীকার করিলেন। মশাগণ অনেক অনুধাবনা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, যে পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া একটী ভাল বিধি প্রচলিত করিতে হইবে, তবে লোকে সে বিধি প্রতিপালন করিবে, তা না হইলে লোকে মানিবে না। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমাগত মশাবৃন্দ ভারতের মহা মহা পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে, দীর্ঘশুণ্ড তাঁহাদিগকে মশাকুল-অনুমোদিত শাস্ত্রীয় বচন বাহির করিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রাদি পর্য্যা-লোচনা করিয়া, পণ্ডিতগণ অবিলম্বে বিধি বাহির করিলেন যে, এ কলিকালে ভারতবাসীদিগের পক্ষে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করা একেবারেই নিষিদ্ধ। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিলে অতি মহা-পাতক হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে কলিকালে ভারতবাসীগণ করিবে কি ? কলিকালে ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত এই বিধি আছে—

সদাকৃতাঞ্জলিপুটাঃ ব্যংশুকাঃ পিহিতেক্ষণাঃ।
ঘোরান্ধতমসে কূপে সন্তু ভারতবাসিনঃ॥
পিবন্তু রুধিরঞ্চৈষাং যাবন্তো মশকা ভুবি।
অদ্য প্রভৃতি বৈ লোকে বিধিরেষ প্রবর্ত্তিতঃ॥

ইহার স্থূল অর্থ এই যে,—কলিকালে ভারতবাসীগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া হাত যোড় করিয়া, অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে।

এইরূপ মনের মত ব্যবস্থা পাইয়া মশাগণ পরম পরিতোষ

লাভ করিলেন। পণ্ডিতগণ যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মশাগণও আপন-আপন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

খর্ব্বুর

দীর্ঘ-শুণ্ড মশা বলিলেন,—"রক্তবতী! এক্ষণে এই মনুষ্য-শাবকটী তোমার। ইহাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

রক্তবতী বলিলেন,—"পিতা! ইনি আমার ভগ্নী। ইঁহার সহিত আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমার পচাজল বিপদে পড়িয়াছে। পচাজলের পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পচা-জল আমার সারা হইয়া গেল। যাহাতে আমার পচাজল আপনার পতি পায়, বাবা, তুমি তাহাই কর।"

কি করিয়া কঙ্কাবতীর পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে, মশা আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। আগা-গোড়া সকল কথা কঙ্কাবতী তাঁহাকে বলিলেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মশা শেষে বলিলেন,—"তুমি আমার রক্তবতীর পচাজল, সে নিমিত্ত তোমার প্রতি আমার স্নেহের উদয় হইয়াছে। তোমাকে আমরা কেহ আর খাইব না। স্নেহের সহিত তোমাকে আমরা প্রতিপালন করিব। যাহাতে তুমি তোমার পতি পাও, সে জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার তালুকে খর্ব্বুর মহা-রাজ বলিয়া একটী মনুষ্য আছে। শুনিয়াছি, সে নানারূপ ঔষধ, নানারূপ মন্ত্র তন্ত্র জানে। আকাশে বৃষ্টি না হইলে, মন্ত্র

পড়িয়া মেঘে সে ছিদ্র করিয়া দিতে পারে। শিলা-বৃষ্টি পড় পড় হইলে, সে নিবারণ করিতে পারে। বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই সে বলিতে পারে,—এ ডাইনি কি ডাইনি নয়। তাহাকে দেখিবামাত্র ভূতগণ পলায়ন করে। তাহার মত গুণী মনুষ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমার পতিকে সে-ই উদ্ধার করিতে পারিবে।”

কঙ্কাবতী বলিলেন,—“তবে, মহাশয়, আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন, এখনি তাঁহার নিকট যাই। মহাশয়, স্বামী-শোকে শরীর আমার প্রতিনিয়তই দগ্ধ হইতেছে, সংসার আমি শূন্য দেখিতেছি! তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবে, কেবল এই প্রত্যাশায় জীবিত আছি। তা না হইলে, কোন্ কালে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম।”

মশা বলিলেন,—“অধিক রাত্রি হইয়াছে, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমার তালুক নিতান্ত নিকট নয়। তবে রও! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাই। তাঁহার পিঠে চড়িয়া আমরা সকলে এখনি খর্ব্বুর মহারাজের নিকট গমন করিব।”

মশা এই বলিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে মশার ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মশানীগণ তাঁহাকে “হাতি-ঠাকুর-পো হাতি-ঠাকুর-পো” বলিয়া অনেক সমাদর ও নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিলেন।

রক্তবতী তাঁহাকে বলিলেন,—‘কাকা। আমি একটী মানুষের ছানা পাইয়াছি। তাহার সঙ্গে আমি পচাজল পাতাইয়াছি।

আমি পচাজলকে বড় ভালবাসি, আমার পচাজলও আমাকে বড় ভাল বাসে।”

কঙ্কাবতী আশ্চর্য্য হইলেন। মশার ছোট ভাই, হাতী! প্রকাণ্ড হাতী! বনের সকলে তাঁহাকে “হাতি-ঠাকুর-পো” বলিয়া ডাকে।

রক্তবতীর পিতা হস্তীকে বলিলেন,—“ভায়া! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। রক্তবতী একটী মানুষের মেয়ের সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। মেয়েটীর পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। মেয়েটী পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। রক্তবতীর দয়ার শরীর। রক্তবতী তার দুঃখে বড় দুঃখী। আমি তাই মনে করিয়াছি, যদি কোনও মতে পারি তো তার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া দিই। খর্ব্বুর মহারাজের দ্বারাই এ কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে। তাই আমার ইচ্ছা যে, এখনি খর্ব্বুরের নিকট যাই। কিন্তু মানুষের মেয়েটী পথ হাঁটিয়া ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত পথ সে চলিতে পারিবে না। এখন, ভায়া, তুমি যদি কৃপা কর তবেই হয়। আমাদিগকে যদি পিঠে করিয়া লইয়া যাও তো বড় উপকার হয়।”

হাতি-ঠাকুর-পো সে কথায় সম্মত হইলেন। কঙ্কাবতী মশানীদিগকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রক্তবতীর গলা ধরিয়া কঙ্কাবতী বলিলেন,—“ভাই পচাজল! তুমি আমার অনেক উপকার করিলে। তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, কখনও ভুলিতে পারিব না। যদি ভাই পতি পাই.

তবেই পুনরায় দেখা হইবে। তা না হইলে, ভাই, এজনমের মত তোমার পচাজল এই বিদায় হইল।”

রক্তবতীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, রক্তবতীর চক্ষু হইতে অশ্রু-বিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মশা ও কঙ্কাবতী দুই জনে হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সমস্ত রাত্রি গত হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে খর্ব্বুরের বাটীতে গিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, খর্ব্বুর শয্যা হইতে উঠিয়াছেন। অতি বিষণ্ণ-বদনে আপনার দ্বারদেশে বসিয়া আছেন। একটু একটু তখনও অন্ধকার আছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদের চন্দ্র তখনও অস্ত যান্ নাই। খর্ব্বুরের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আকাশের চাঁদ অতি প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। চাঁদের মুখে আব হাসি ধরে না। চাঁদের হাসি দেখিয়া খর্ব্বুবের রাগ হইতেছে। খর্ব্বুব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—“এই চাঁদের এক দিন আমি দণ্ড করিব। চাঁদকে যদি উচিত মত দণ্ড না দিতে পারি, তাহা হইলে খর্ব্বুরের গুণ জ্ঞান, তুক্ তাক্, মন্ত্র তন্ত্র, শিকড় মাকড়, সবই বৃথা।”

মশা, কঙ্কাবতী ও হস্তী গিয়া খর্ব্বুরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মশাকে দেখিয়া খর্ব্বুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

হাত যোড় করিয়া খর্ব্বুর বলিলেন,—“মহাশয়! আজ প্রাতঃকালে কি মনে করিয়া? প্রতি দিন তো সন্ধ্যার সময় আপনার শুভাগমন হয়। আজ দিনের বেলায় কেন? ঘরে কুটুম্ব সাক্ষাৎ
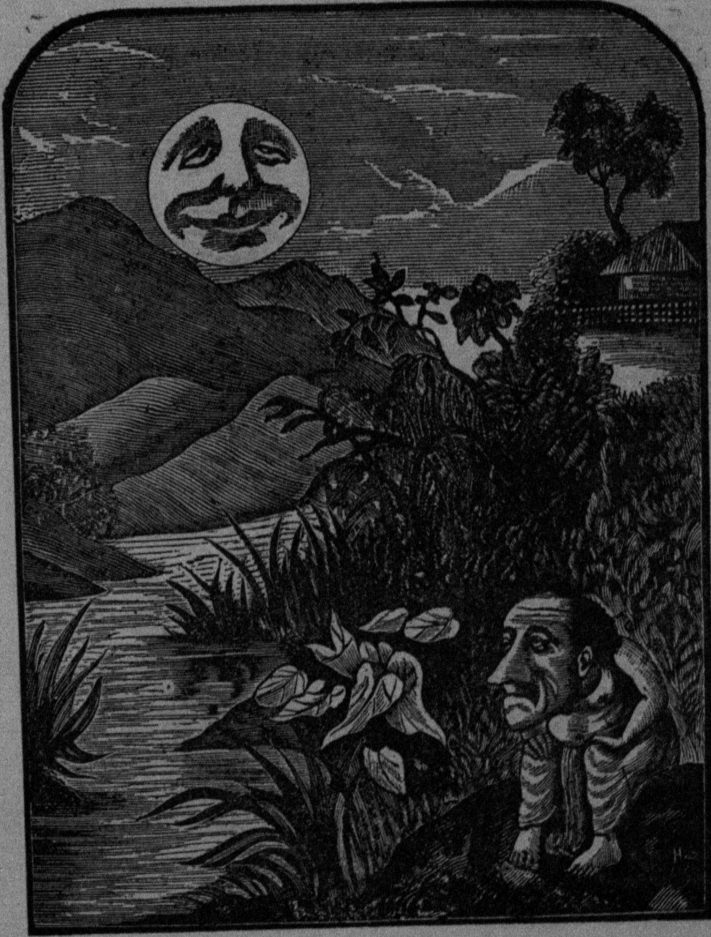
সেই যার সাত হাত স্ত্রী

আনিয়াছেন না কি? তাই কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন, যে তাঁহার পিঠে বোঝাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত লইয়া যাইবেন?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না, তা নয়! সে জন্য আমি আসি নাই। কি জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি। আপাততঃ জিজ্ঞাসা করি, তুমি বিষণ্ণ-মুখে বসিয়া আছ কেন? এরূপ বিষণ্ণ-বদনে থাকা তো উচিত নয়! মনোদুঃখে থাকিতে তোমাদিগকে আমি বার বার নিষেধ করিয়াছি। মনের সুখে না থাকিলে শরীরে রক্ত হয় না, সে রক্ত সুস্বাদু হয় না। মনের সুখে যদি তোমরা না থাকিবে, পুষ্টিকর, তেজস্কর দ্রব্য সামগ্রী যদি আহারাদি না করিবে, তবে তোমাদের রক্তহীন দেহে বসিয়া আমাদের ফল কি? তোমরা সব যদি নিয়ত এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবে, তবে আমরা পরিবারবর্গকে কি করিয়া প্রতিপালন করি? তোমাদের মনে কি একটু ত্রাস হয় না যে, আমাদের গায়ে বসিয়া মশা প্রভু যদি সুচারুরূপে রক্ত পান করিতে না পান, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের উপর রাগ করিবেন?"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"প্রভু! আমি শীর্ণ হইয়া যাইতেছি সত্য। আমার শরীরে ভালরূপ সুস্বাদু রক্ত না পাইলে, মহাশয় যে রাগ করিবেন, তাহাও জানি। কিন্তু কি করিব? কেবল স্ত্রীর তাড়নায় আমার এই দশা ঘটিতেছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? কি হইয়াছে? তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করেন?'

খর্ব্বুর উত্তর করিলেন,—"প্রভু! আমাদের স্ত্রী-পুরুষে সর্ব্বদা

বিবাদ হয়। দিনের মধ্যে দুই তিন বার মারা-মারি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা আর মহাশয়কে কি বলিব! আমি হইলাম তিন হাত লম্বা, আমার স্ত্রী হইলেন সাত হাত লম্বা। যখন আমাদের মারামারি হয়, তখন আমার স্ত্রী নাগরা জুতা লইয়া ঠন্ ঠন্ করিয়া আমার মস্তকে প্রহার করেন। আমি তত দূর নাগাল পাই না, আমি যা মারি তা কেবল তাঁর পিঠে পড়ে। স্ত্রীর প্রহারের চোটে অবিলম্বেই আমি কাতর হইয়া পড়ি, আমার প্রহারে স্ত্রীর কিন্তু কিছুই হয় না। সুতরাং স্ত্রীর নিকট আমি সর্ব্বদাই হারিয়া যাই। একে মা'র খাইয়া, তাতে মনঃক্লেশে, শরীর আমার শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দেহে আমার রক্ত নাই। সে জন্য মহাশয় রাগ করিতে পারেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কি করিব? আমার অপরাধ নাই।"

মশা বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, তুমি এক কর্ম্ম কর। আজ হাতিভায়ার পিঠে চড়িয়া তুমি স্ত্রীর সহিত মারামারি কর!"

এই বলিয়া মশা খর্ব্বুরকে হাতীটী দিলেন। খর্ব্বুর হাতীর পিঠে চড়িয়া, বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় ক্রমে মারামারি আরম্ভ হইল। খর্ব্বুর আজ হাতীর উপর বসিয়া, মনের সুখে ঠন্ ঠন্ করিয়া, স্ত্রীর মাথায় নাগরা জুতা মারিতে লাগিলেন। আজ স্ত্রী যাহা মারেন, খর্ব্বুরের পায়ে কেবল সামান্য ভাবে লাগে। যখন তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, মশার তখন আনন্দের পরিসীমা

রহিল না। মশার হাত নাই যে হাততালি দিবেন, নখ নাই যে নখে নখে ঘর্ষণ করবেন! তাই তিনি কখনও এক পা তুলিয়া, কখনও দুই পা তুলিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন, ও গুন্ গুন্ করিয়া "নারদ নারদ" বলিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই আজ খর্ব্বুরের স্ত্রীকে পরাভব মানিতে হইল। খর্ব্বুরের মন আজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। খর্ব্বুরের ধমনী ও শিরায় প্রবলবেগে আজ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। মশা, সেই রক্ত একটু চাখিয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন,—"বাঃ! অতি সুমিষ্ট, অতি সুস্বাদু!"

মশা-মহাশয়কে খর্ব্বুর শত শত ধন্যবাদ দিলেন, ও কি জন্য তাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কঙ্কাবতী ও নাকেশ্বরীর বিবরণ মশা-মহাশয় আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া খর্ব্বুর বলিলেন,—"আপনাদের কোনও চিন্তা নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে আমি ইঁহার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিব। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনী, ডাইনী, সকলেই আমাকে ভয় করে। চলুন, আমাকে সেই নাকেশ্বরীর ঘরে লইয়া চলুন, দেখি সে কেমন নাকেশ্বরী!"

মশা বলিলেন,—"এবার চল!! কিন্তু তোমাদের চলা-চলি সব শেষ হইল। বড় সব জাহাজে চড়িয়া, কোথায় রেঙ্গুন, কোথায় বিলাত; এ-খানে ও-খানে সেখানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছ! বড় সব রেলগাড়ি করিয়া এ-দেশ, ও-দেশ, সে-দেশ করিতেছ! রও, এবারকার শাস্ত্র একবার জারি হইতে দাও, তাহা হইলে টের পাবে!"

খর্ব্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এবারকার শাস্ত্রে আমাদের গমনাগমন একেবারেই নিষিদ্ধ হইল না কি? গাছগাছড়া আনিতে যাইতেও পাইব না?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না! এবারকার শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ঘর হইতে তোমরা আর একেবারেই বাহির হইতে পারিবে না। সকলকে অন্ধকূপ খনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়া সকলকে সেই অন্ধকূপে বসিয়া থাকিতে হইবে। অন্ধকূপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্ষুর ঠুলিটী খুলিলে, পাপ হইবে। যেমন তেমন পাপ নয়, সেই যারে বলে পাতক। কেবল পাতক নয়, সেই যারে বলে মহাপাতক। শুধু মহাপাতক নয়, সেই যারে বলে অতিমহাপাতক। কেমন! বড় যে সব জাহাজে চড়া, রেলে চড়া, লেখা-পড়া শেখা, মশারি করা! এই বার?"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"আপনারা মহাপ্রভু! যেরূপ শাস্ত্র করিয়া দিবেন, আমাদিগকে মানিতে হইবে। আপনারা আমাদিগের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। আপনারা সব করিতে পারেন।"

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই প্রহরের সময় পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—:o:—

খোক্কোশ

নাকেশ্বরী যখন খেতুকে পাইল, তখন খেতু একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান গোচর আর তাঁহার কিছু মাত্র রহিল না। নিশ্বাস দ্বারা নাকেশ্বরী যে কঙ্কাবতীকে দূরীভূত করিল, খেতু তাহার কিছুই জানেন না।

খেতুকে মৃতপ্রায় করিয়া নাকেশ্বরী মনে মনে ভাবিল,—"বহু কাল ধরিয়া অনাহারে আছি। ইষ্ট দেবতা ব্যাঘ্রের প্রসাদে আজ যদি এরূপ উপাদেয় খাদ্য মিলিল, তবে ইহাকে ভাল-রূপে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। এমন সুখাদ্য একেলা খাইয়া তৃপ্তি হইবে না। যাই, মাসীকে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনি।"

মাসী আসিতে আসিতে পাছে খাদ্য পচিয়া যায়, সেজন্য নাকেশ্বরী তখন খেতুকে একেবারে মারিয়া ফেলিল না, মৃতপ্রায় অজ্ঞান করিয়া রাখিল।

নাকেশ্বরী, মাসীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইল। নাকেশ্বরীর মাসীর বাড়ী অনেক দূর, সাত সমুদ্র তের নদী পার, সেই এক ঠেঙো মুল্লুকের ওধারে। সেখানে যাইতে, আবার মাসীকে লইয়া ফিরিয়া আসিতে, অনেক বিলম্ব হইল।

মাসী বুড়ো মানুষ। মাসীর দাঁত নাই। খেতুর কোমল মাংস

দেখিয়া মাসীর আর আহ্লাদের সীমা নাই। মাসীর মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল।

খেতুর গা টিপিয়া টুপিয়া মাসী বলিলেন,—"আহা! কি নরম মাংস! বুড়ো হইয়াছি, একঠেঙো মানুষের দড়িপানা শক্ত মাংস আর চিবাইতে পারি না। আজ দুঠেঙো মানুষের মাংস খাইয়া উদর পূর্ণ করিব। মুণ্ডটীর ঝোল হউক, পিঠের মাংস দাগা দাগা করিয়া কাটিয়া ভাজা হউক, আঙুলগুলির চড়চড়ি হউক, অন্যান্য মাংস অম্বল করিয়া রাঁধা থাকুক, দুই দিন ধরিয়া আহার করা যাইবে, গন্ধ হইয়া যাইবে না।"

মাসী-বোনঝিতে এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। হাতীর বৃংহতিধ্বনি, মশার গুন্ গুন্, মানুষের কণ্ঠস্বর, পর্ব্বতের বাহির হইতে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।

নাকেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"মাসী! সর্ব্বনাশ হইল! মুখের গ্রাস বুঝি কাড়িয়া লয়! ছুঁড়ী বুঝি ওঝা আনিয়াছে!"

মাসী বলিলেন,— চল চল চল! দ্বারের উপর দুইজনে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াই।"

অট্টালিকার দ্বারের উপর নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী পদ-প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল।

পর্ব্বতের ধারে সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মশা, কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মাছি তাড়াইতে

লাগিলেন। কখনও বা শুঁড়ে করিয়া ধুলারাশি লইয়া আপনার গায়ে পাউডার মাখিতে লাগিলেন। দোল খাইতে ইচ্ছা হইলে, কখনও বা মনের সাধে শরীর দোলাইতে লাগিলেন।

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইলেন। অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় দ্বারে নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসীর পদতল দিয়া সকলকে যাইতে হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, খেতুর নিকট সকলে গমন করিলেন। সকলে দেখিলেন যে, খেতু মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অজ্ঞান অচৈতন্য। শরীরে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। কঙ্কাবতী তাঁহার পদ-প্রান্তে পড়িয়া, পা। দুটী বুকে লইয়া, নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। খর্ব্বুর খেতুকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে খর্ব্বুর বলিলেন,—"কন্যা কঙ্কাবতী! তুমি কাঁদিও না। তোমার পতি এখনও জীবিত আছেন। সত্বর আরোগ্য লাভ করিবেন। আমি এই ক্ষণেই এ রোগের প্রতিকার করিতেছি।"

এই বলিয়া খর্ব্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, খেতুর শরীরে শত শত ফুৎকার বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নানা রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সংজ্ঞাশূন্য হইয়া খেতু যে ভাবে পড়িয়াছিলেন, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। তিল মাত্রও নড়িলেন চড়িলেন না।

খর্ব্বুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি হইল! আমার মন্ত্র তন্ত্র

এরূপ কখনও তো বিফল হয় না! রোগী পুনর্জ্জীবিত হউক না হউক, মন্ত্রের ফল অল্পাধিক অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজ যে আমার মন্ত্র-তন্ত্র শিকড়-মাকড় একেবারেই নিরর্থক হইতেছে, ইহার কারণ কি ?”

খর্ব্বুর সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ভাবিয়া কারণ কিছু স্থির করিতে পারেন না।

অবশেষে তিনি বলিলেন,—“মশা প্রভু! আসুন দেখি, সকলে পুনরায় বাহিরে যাই। বাহিরে গিয়া দেখি, ব্যাপার খানা কি ?”

অট্টালিকা হইতে সকলে পুনর্ব্বার বাহির হইলেন। কঙ্কাবতী একেবারে হতাশ হইযা পড়িলেন। কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, অভাগিনীর কপালে পতি যদি বাঁচিবেন, তবে এত কাণ্ড হবেই বা কেন ? তবে, এখন তিনি পতিদেহ পাইবেন, পতিপাদ-পদ্মে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, অসীম শোকসাগরে ভাসমান থাকিয়াও সে চিন্তাটী কথঞ্চিৎ তাঁহার শান্তির কারণ হইল।

একবার বাহিরে যাইয়া, সুড়ঙ্গের পথ দিয়া সকলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, আশ পাশ, অগ্র পশ্চাৎ, উর্দ্ধ নিম্ন, দশ দিক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে পরীক্ষা করিতে করিতে, খর্ব্বুর আসিতে লাগিলেন। অট্টালিকার নিকট আসিয়া, উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখেন যে, ভূতিনীদ্বয় পদ প্রসারণ করিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। খর্ব্বুর ঈষৎ হাসিলেন, আর মনে মনে করিলেন,—“বটে! তোমাদের চাতুরী তো কম নয়!”

এবার বাহির হইতে খর্ব্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্রের

প্রভাবে, ভূতিনীদ্বয় পদ উত্তোলন করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া খর্ব্বুর পুনরায় ঝাড়ান কাড়ান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মন্ত্রবলে নাকেশ্বরী আসিয়া খেতুর শরীরে আবির্ভূত হইল। খেতু বক্তা হইলেন, অর্থাৎ কি না খেতুর মুখ দিয়া ডাকিনী কথা কহিতে লাগিল। নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, নানারূপ মন্ত্র পড়িয়া খর্ব্বুর নাকেশ্বরীকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন। নাকেশ্বরী কিছুতেই ছাড়িবে না। নাকেশ্বরী বলিল যে,—"এ মনুষ্য ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আমা-রক্ষিত সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়াছে, সেজন্য আমি ইহাকে কখনই ছাড়িতে পারি না, আমি ইহাকে নিশ্চয় ভক্ষণ করিব।" খর্ব্বুর পুনরায় নানারূপ মন্ত্রাদি দ্বারা নাকেশ্বরীকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যাতনা ভোগে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে নাকেশ্বরী খেতুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু "যাই, যাই" বলে, তবু যায় না। "এই বার যাই, এই বার চলিলাম," বার বার এই কথা বলে, তবু কিন্তু যায় না। নাকেশ্বরীর শঠতা দেখিয়া খর্ব্বুর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। খর্ব্বুর বলিলেন,—"যাবে না? বটে! আচ্ছা দেখি, এইবার যাও কি না!" এই বলিয়া তিনি একটী কুষ্মাণ্ড আনয়ন করিলেন। মন্ত্রপূত করিয়া, তাহার উপর সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া, কুমড়াটীকে বলিদান দিবার উদ্যোগ করিলেন। খর্পরে কুমড়াটী রাখিয়া, খর্ব্বুর খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কোপ মারেন আর কি! এমন সময়

নাকেশ্বরী অতি কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! কোপ মারিবেন না, আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন না। আমি এখন সত্য সত্য সকল কথা বলিতেছি।"

খর্ব্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিবে বল? সত্য বল, কেন তুমি ছাড়িয়া যাইতেছ না? সত্য সত্য না বলিলে, এখনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"আমি ছাড়িয়া গেলে কোনও ফল হইবে না। রোগী এখনি মরিয়া যাইবে। রোগীর পরমায়ুটুকু লইয়া, কচুপাতে বাঁধিয়া, আমি তাল গাছের মাথায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, মাসী আসিলে পরমায়ুটুকু বাটিয়া, চাট্‌নী করিয়া দুই জনে খাইব। তা, পরমায়ু-সহিত কচুপাতটী বাতাসে তালগাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাতে পরমায়ুটুকু খাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর আমি পরমায়ু কোথায় পাইব, যে, রোগীকে আনিয়া দিব? সেই জন্য বলিতেছি, যে, আমি ছাড়িয়া যাইলেই রোগী মরিয়া যাইবে।"

খর্ব্বুর গুণিয়া গাঁথিয়া দেখিলেন যে নাকেশ্বরী যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য কথা, মিথ্যা নয়। খর্ব্বুর মনে মনে ভাবিলেন যে,—"এই বার প্রমাদ হইল! ইহার এখন উপায় কি করা যায়? পরমায়ু না থাকিলে, পরমায়ু তো আর কেহ দিতে পারে না?"

অনেক চিন্তা করিয়া, খর্ব্বুর নাকেশ্বরীকে আদেশ করিলেন,—"যে ক্ষুদ্র পিপীলিকারা ইঁহার পরমায়ু ভক্ষণ করিয়াছে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সে খুদে পিঁপ্‌ড়েরা এখন কোথায়?"

নাকেশ্বরী গিয়া, তালতলায়, পাথরের ফাটালে, মাটীর গর্ত্তে, কাঠের কোঁঠরে, সকল স্থানে সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথাও আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ডেও পিঁপ্ড়ে, কাঠ-পিঁপ্ড়ে, শুশ্‌শুড়ে-পিঁপ্ড়ে, টোপ-পিঁপ্ড়ে, যত প্রকার পিঁপ্ড়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সকলকেই নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরার মাসী জিজ্ঞাসা করে,—"হাঁগা! খুদে-পিঁপ্ড়েরা কোথায় গেল, তোমরা দেখিয়াছ?" খুদে-পিঁপ্ড়ের তত্ব কেহই বলিতে পারে না। বোন্‌ঝির বিপদে মাসীও ব্যথিত হইয়া চারি দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই বুড়ির হাঁপ লাগিল, চলিতে চলিতে নাকেশ্বরীর মাসীর পায়ে ব্যথা হইল। তখন নাকেশ্বরীর মাসী মনে করিল,—"ভাল দ্'ঠেঙো মানুষের মাংস খাইতে আসিয়াছিলাম বটে! এখন আমার প্রাণ নিয়ে টানা-টানি!"

অনুসন্ধান করিতে করিতে, অবশেষে কানা-পিঁপ্ড়ের সহিত নাকেশ্বরীর সাক্ষাৎ হইল। কানা-পিঁপ্ড়েকে, নাকেশ্বরী, খুদে-পিঁপ্ড়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কানা-পিঁপ্ড়ে বলিল,—"আমি খুদে-পিঁপ্ড়েদের কথা জানি। তালতলায়, কচুপাত হইতে মানুষের সুমিষ্ট পরমান্নটুকু চাটিয়া-চুটিয়া খাইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া, খুদে-পিঁপ্ড়েরা গৃহে গমন করিতেছিল। এমন সময় সাহেবের পোষাক পরা, একটী ব্যাঙ আসিয়া তাহাদিগকে কুপ্ কুপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল।"

অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিয়া, নাকেশ্বরী এই সংবাদটী খর্ব্বুরকে দিল। ভেকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত খর্ব্বুর পুনরায়

নাকেশ্বরীকে পাঠাইলেন। নাকেশ্বরী মনে করিল,—“ভাল কথা! আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, আবার সেই কাজে আমাকেই খাটাইবে।” কিন্তু নাকেশ্বরী করে কি? কথা না শুনিলেই খর্ব্বুর সেই কুমড়াটী বলিদান দিবেন। এ-দিকে তিনি কুমড়াটী কাটিবেন, আর ও-দিকে নাকেশ্বরীর গলাটী দুই খানা হইয়া যাইবে।

বনে বনে, পথে পথে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, খানায় ডোবায়, নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বর'র মাসী ভেকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কোথায়, কোন্ গর্ত্তের ভিতর ব্যাঙ খাইয়া দাইয়া বসিয়া আছেন, তাহার সন্ধান ভূতিনীরা কি করিয়া পাইবে? ব্যাঙের কোনও সন্ধান হইল না। নাকেশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া খর্ব্বুরকে বলিল,—“আমাকে মারুন্ আর কাটুন্, ব্যাঙের সন্ধান আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না।”

নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া, খর্ব্বুর পুনরায় ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে তিনি এক মুষ্টি সর্ষপ হাতে লইলেন। মন্ত্রপূত করিয়া সরিষা গুলিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পড়া সরিষারা নক্ষত্র বেগে পৃথিব'র চারিদিকে ছুটিল। দেশ বিদেশ, গ্রাম নগর, উপত্যকা অধিত্যকা, সাগর মহাসাগব, চারিদিকে খর্ব্বুরের সরিষা-পড়া ছুটিল। পর্ণপূর্ণ, পুবাতন, পঙ্কিল পুষ্করিণীর পার্শ্বে, সুশীতল গর্ত্তের ভিতর ব্যাঙ মহাশয় মনের সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সরিষাগণ সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইল। সূচের সূক্ষ্ম ধারে চর্ম্ম মাংস ভেদ করিয়া সরিষাগণ ব্যাঙের মস্তকে চাপিয়া বসিল। ভেকের মাথা হইতে সাহেবি টুপিটী

এ এই চেপ্টার কর্ম্ম !

খসিয়া পড়িল। যাতনায় ব্যাঙ মহাশয় ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরিষারা তাঁহাকে গর্ত্তের ভিতর হইতে বাহির করিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে অট্টালিকার দিকে লইয়া চলিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে সুড়ঙ্গের পথে প্রবিষ্ট করিল। অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া ব্যাঙ মহাশয় হস্ত দ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন।

মশা দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভেক মহাশয় অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া যেখানে কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর বসিয়াছিলেন, সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কঙ্কাবতী চিনিলেন যে, এ সেই ব্যাঙ! ব্যাঙ চিনিলেন যে, এ সেই কঙ্কাবতী!

ব্যাঙ বলিলেন,—"ওগো ফুট্‌ফুটে মেয়েটী! তোমার সহিত এত আলাপ পরিচয় করিলাম, আর তুমি আসিয়া সকলকে আমার আধুলিটীর সন্ধান বলিয়া দিলে গা! ছি! বাছা! তুমি এ ভাল কাজ কর নাই। ধনের গল্প গাঁ'ট-কাটাদের কাছে কি করিতে আছে? বিশেষতঃ ঐ চেপ্টা গাঁট-কাটার কাছে। আমার আধুলির যাহা কিছু বাকি আছে, সকলে ভাগ করিয়া লও, লইয়া আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও। চেপ্টা মহাশয়! আমি দেখিতেছি এ সরিষাগুলি আপনার চেলা। এখন কৃপা করিয়া সরিষা গুলিকে আমার মাথাটী ছাড়িয়া দিতে বলুন। ইহাদের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"তোমার আধুলিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। এ বালিকাটী তোমার পরিচিত। বালিকাটী কি ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। ঐ যে মৃতবৎ

যুবাটীকে দেখিতেছ, উনিই ইঁহার পতি। নাকেশ্বরী দ্বারা উনি আক্রান্ত হইয়াছেন। নাকেশ্বরী ওঁর পরমায়ু লইয়া তালবৃক্ষের মস্তকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাতাসে সেই পরমায়ুটুকু তলায় পড়িয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র পিপীলিকারা সেই পরমায়ু ভক্ষণ করে। তুমি সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে উদরের ভিতর হইতে সেই পিপীলিকা গুলিকে বাহির করিয়া দাও। পিপীলিকাদিগের উদর হইতে আমি পরমায়ূটুকু বাহির করিয়া কঙ্কাবতীর পতির প্রাণ রক্ষা করি। পিপীলিকা গুলিকে বাহির করিয়া দিলেই, সরিষাগণ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে।"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—"এই বালিকাটী আমার পরিচিত বটে, যাহাতে ইহার মঙ্গল হয় তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া ব্যাঙ গলায় অঙ্গুলি দিয়া উদ্গিরণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু বমন কিছুতেই হইল না। তাহার পর গলায় পালক দিয়া বমন করিতে চেষ্টা করিলেন, তবুও বমন হইল না। অবশেষে খর্ব্বুর তাঁহাকে নানাবিধ বমন-কারক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্যাঙের বমন আর কিছুতেই হইল না।

খর্ব্বুর ভাবিলেন,—"এ আবার এক নূতন বিপদ! ইহার উপায় কি করা যায়?"

খর্ব্বুর ব্যাঙের নাড়ী ধরিয়া উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন,—"এইবার চাঁদকে আমি পতনে পাইয়াছি।" চাঁদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চাঁদের মূল-শিকড় এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, সেবন করাইলে এখনি ভেকের বমন হইবে।

মশাকে সম্বোধন করিয়া থর্ব্বুর বলিলেন,—"মহাশয়! এ ব্যাঙের বমন হয়, এরূপ ঔষধ পৃথিবীতে নাই। জগতে ইহার কেবল এক মাত্র ঔষধ আছে। ঐ যে আকাশে চাঁদ দেখিতে পান, ঐ চাঁদের মূল-শিকড়ের ছাল এক তোলা, সাতটী মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে, তবেই ব্যাঙের বমন হইবে, নতুবা আর কিছুতে হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া মশা বিমর্শ হইয়া রহিলেন। কঙ্কাবতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মশা মহাশয়। থর্ব্বুর মহারাজ। এই হতভাগিনীর জন্য আপনারা অনেক পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু আপনারা কি করিবেন? এ হতভাগিনীর কপাল নিতান্তই পুড়িয়াছে। আকাশে গিয়া চাঁদের মূল-শিকড় কে কাটিয়া আনিতে পারে? চাঁদের মূল-শিকড়ও সংগ্রহ হইবে না, পতিও আমার প্রাণ পাইবেন না। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন, আমার জন্য বৃথা আর ক্লেশ পাইবেন না। আপনাদিগের অনুগ্রহে আমি যে আমার পতির মৃত-দেহটী পাইলাম, তাহাই যথেষ্ট। পতির পদ আশ্রয় করিয়া আমি এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করি। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন।'

মশা বলিলেন,—"আমি অনেক দূর উড়িতে পারি সত্য। কিন্তু চাঁদ পর্য্যন্ত যে উড়িয়া যাই, এরূপ শক্তি আমার নাই। সেজন্য, আমি দেখিতেছি যে, আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। আহা। রক্তবতী মা আমার পথ পানে চাহিয়া আছেন। রক্তবতীকে গিয়া কি বলিব?"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"আপনারা নিতান্ত হতাশ হইবেন না। একটী খোক্কোশের বাচ্ছার সন্ধান হয়? তাহা হইলে তাহার পিঠে চড়িয়া অনায়াসেই আকাশে উঠিতে পারা যায়। ধাড়ী খোক্কোশ পাইলে কাজ হইবে না, ধাড়ী খোক্কোশ বাগ মানিবে না। বাচ্ছা খোক্কোশ আবশ্যক।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"এক স্থানে খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, তাহার সন্ধান আমি জানি। কিন্তু খোক্কোশের বাচ্ছা তোমরা ধরিবে কি করিয়া? ধাড়ী খোক্কোশ যে তোমাদিগকে এক গালে খাইয়া ফেলিবে? আচ্ছা, যেন পাকে-প্রকারে তাহাকে ধরিলে। তাহার পিঠে চড়িয়া আকাশের উপর যায় কে? প্রাণটী হাতে করিয়া আকাশে যাইতে হইবে। আকাশে ভয়ানক সিপাহী আছে, আকাশের সে চৌকিদার। কর্ণে সে বধির। কানে ভাল শুনিতে পায় না বটে, কিন্তু অন্য দিকে সে বড়ই দুর্দ্দান্ত সিপাহী। আকাশের লোক তাহার ভয়ে সব জড়সড়। আকাশের চারি দিকে সে পাহারা দিয়া বেড়ায়, তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তাই ভাবিতেছি, চাঁদের মূল শিকড় কাটিয়া আনিতে আকাশে যায় কে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"সে জন্য আপনাদিগের কোনও চিন্তা নাই। যদি খোক্কোশের বাচ্ছা পাই, তাহা হইলে তাহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশে যাইব। আমার আর ভয় কিসের? যদি আকাশের সিপাহীর হাতে পড়ি, সে না হয় আমাকে মারিয়া ফেলিবে, আর আমার সে কি করিতে পারে? পতি

বিহনে আমি তো এ প্রাণ রাখিব না, এ তো আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা! তবে, প্রাণের ভয় আর আমি কিজন্য করিব?"

এখন খোকোশের বাচ্ছা ধরাই স্থির হইল! যে পাহাড়ের ধারে, যে গর্ত্তের ভিতর খোকোশের বাচ্ছা হইয়াছে, ব্যাঙ তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন। মশা বলিলেন,—"কৌশল করিয়া খোকো-শের বাচ্ছা ধরিতে হইবে।"

এইরূপ স্থির হইল যে, ব্যাঙ ও খর্ব্বুর অট্টালিকায় খেতুকে চৌকি দিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর মশা, কঙ্কাবতী ও হাতী-ঠাকুর-পো খোকোশের বাচ্ছা ধরিতে যাইবেন।

যাত্রা করিবার সময় কঙ্কাবতী, খেতুর পদধূলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন।

মশা, কঙ্কাবতীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন.—"কেমন কঙ্কাবতী! তুমি আকাশে উঠিতে পারিবে তো? তোমার ভয় তো করিবে না?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভয়? আমার আবার ভয় কিসের? যদি আকাশে একবার উঠিতে পারি, তাহা হইলে দেখি, কি করিয়া চাঁদ আপনার মূল-শিকড় রক্ষা করেন! আর দেখি, আকাশের সেই বধির সিপাহীর কত ঢাল-খাঁড়া আছে! পতিপরায়ণা সতীর পরাক্রম আজ আকাশের লোককে দেখাইব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নক্ষত্রদের বৌ

খোক্কোশের বাচ্ছা ধরিয়া আকাশে উঠিবার কথা, নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী বসিয়া বসিয়া শুনিল। তাহারা দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে,—"যদি এই কাজটী নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খর্ব্বুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ খাদ্যটীও আমাদের হাতছাড়া হইবে না।"

মাসী বলিল,—"বৃদ্ধ হইয়াছি! এখন পৃথিবীর অর্দ্ধেক দ্রব্যে অরুচি। এইরূপ কোমল রসাল মাংস খাইতে এখন সাধ হয়। যদি ভাগ্যক্রমে একটী মিলিল, তাও বুঝি যায়!"

নাকেশ্বরী বলিল,—"মাসী তুমি এক কর্ম্ম কর। তোমার ঝুড়িতে বসিয়া, তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ তুমি একেবারে চুণকাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চুণকাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায়। তুমি তোমার চশমা নাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। চুণকাম করিয়া দিলে, ছুঁড়ি আর আকাশের ভিতর যাইতে পথ পাইবে না, চাঁদও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মূল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।"

দুই জনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল।

আকাশে সব চূণ-কাম

ঝুড়ি হুহু শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেশ্বরীর মাসী চুণকাম করিয়া দিল।

অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময় মশা দেখিলেন যে, সেখানে একটী ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটী সঙ্গে লইলেন। বাহিরে আসিয়া কঙ্কাবতী ও মশা, হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যে বনে খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর খোক্কোশের গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিয়া মশা বলিলেন,—"কি হইল! আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ এখনও উঠিলেন না কেন? মেঘ করে নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল? আকাশ এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল কেন?"

ধাড়ী-খোক্কোশ আপনার বাচ্ছা চৌকি দিয়া গর্ত্তে বসিয়া আছে। একে রাত্রি, তা'তে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী খোক্কোশ কঙ্কাবতীর গন্ধ পাইল।

ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ধাড়ী খোক্কোশ বলিল,—"হাঁউ মাউ খাঁউরে, মনুষ্যের গন্ধ পাঁউরে! কেরে তোরা, এদিকে আসিস্?"

মশা চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কে?"

খোক্কোশ বলিল,—"আমি আবার কে! আমি খোক্কোশ!"

মশা বলিলেন,—"আমরা আবার কে! আমরা ঘোক্কোশ!"

এই উত্তর শুনিয়া খোক্কোশের ভয় হইল। খোক্কোশ বলিল,—"বাপরে! তবে তো তোরা কম নয়? ক, খ, গ, ঘ আমি খ-য়ে

তোরা ঘ-য়ে, আমার চেয়ে তোরা দুইপৈঠা উঁচু! আচ্ছা, কেমন তোরা ঘোক্কোশ, একবার কাস্ দেখি, শুনি?"

মশা তখন সেই ঢাকটী ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

সেই শব্দ শুনিয়া খোক্কোশ বলিল,—"ওরে বাপরে! তোদের কাসির কি শব্দ! শুনিলে ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোরা ঘোক্কোশ বটে!"

খোক্কোশ কিন্তু কিছু সন্দিগ্ধ-চিত্ত। এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা! তোরা কেমন ঘোক্কোশ, তোদের মাথায় এক গাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি?"

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছি গাছটী ফেলিয়া দিলেন। খোক্কোশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ দেখিয়া শেষে বলিল,—"ওরে বাপরে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যখন এত বড়, এত মোটা, তখন তোরা না জানি কত বড়, কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারা ভার!"

তবুও কিন্তু খোক্কোশের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া খোক্কোশ পুনরায় বলিল,—"আচ্ছা, তোরা যদি ঘোক্কোশ, তবে তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি?"

মশা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে নামো।"

তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন,—"হাতী ভায়া! এইবার!"

এই কথা বলিয়া মশা, হাতীটীকে ধরিয়া, খোক্কোশের গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। গর্ত্তে পড়িয়াই হাতী শুঁড় দিয়া খোক্কোশের

বাচ্ছাটীকে ধরিলেন। খোক্কোশের বাচ্ছা, "চ্যা চ্যা" শব্দে ডাকিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোল-পাড় করিয়া ফেলিল। শুঁড়-বিশিষ্ট পর্ব্বতাকার উকুন দেখিয়া, ত্রাসে খোক্কোশের প্রাণ উড়িয়া গেল। খোক্কোশ ভাবিল,—"তাদের মাথায় উকুন অসিয়া তো আমার বাচ্ছাটীকে ধরিল, এখন ঘোক্কোশেরা নিজে আসিয়া আমাকে না ধরে।" এই মনে করিয়া খোক্কোশ, বাচ্ছা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কঙ্কাবতী তখন সেই গর্ত্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি এখন ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। খোক্কোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিয়া উঠ। চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় তুমি এই খানে আসিবে। তোমার প্রতীক্ষায় এই খানে আমরা বসিয়া রহিলাম। তুমি আসিলে, আমরা খোক্কোশের বাচ্ছাটীকে ফিরাইয়া দিব। কারণ, এখনও এ স্তনপান করে, অতি শিশু; ইহাকে লইয়া আমরা কি করিব? যাই হউক, তুমি এখন আকাশের দুর্দ্দান্ত সিপাহির হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। শুনিয়াছি, সে অতি ভয়ঙ্কর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত সিপাহি! সাবধানে আকাশে উঠিবে।"

আকাশ পানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ উঠিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চাঁদও দেখিতে পাই না, নক্ষত্রও দেখিতে পাই না। অথচ মেঘ করে নাই। কালো

মেঘে না ঢাকিয়া, সমস্ত আকাশ বরং শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। ইহার অর্থ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? আকাশে উঠিলে হয় তো তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য্য উদ্ধার করিবে।"

কঙ্কাবতী খোক্কোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া, আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলেন। দ্রুতবেগে খোক্কোশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশে চুণ-কাম করা। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"এ কি প্রকার কথা! আকাশের উপর এরূপ চুণ-কাম করিয়া কে দিল?"

আকাশের উপর উঠিতে কঙ্কাবতী আর পথ পান্ না। যে দিকে যান্, সেই দিকেই দেখেন চুণ-কাম! আকাশের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না। সব চুণকাম! কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"ঘোর বিপদ! আকাশের উপর এখন উঠি কি করিয়া?"

হতাশ হইয়া, আকাশের চারি ধারে কঙ্কাবতী পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া, সহসা এক স্থানে একটী সামান্য ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রটী দিয়া নক্ষত্রদের বৌ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী সেই ছিদ্রটীর নিকট যাইলেন। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া নক্ষত্রদের বৌ একবার লুকাইল, পুনরায় আবার ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

খোক্কোশ-শাবক

এখনও চক্ষু ফুটে নাই ! নিতান্ত শিশু !

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো নক্ষত্রদের বৌ! তোমার কোনও ভয় নাই। আমিও মেয়ে মানুষ, আমাকে দেখিয়া আবার লজ্জা কেন, বাছা?"

নক্ষত্রদের বৌ উত্তর করিল,—"কে গা মেয়েটী তুমি? তোমার কথা গুলি বড় মিষ্ট। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছি, তুমি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি তুমি খুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক আমি বৌ মানুষ, সহসা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি গা? তাতে রাত্রি কাল! একটু আস্তে কথা কও, বাছা! আমার ছেলে পিলেরা সব শুয়েছে, এখনি জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে কাঁদিয়া জ্বালাতন করিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো! নক্ষত্রদের বৌ! আমার নাম কঙ্কাবতী! আমি পতিহারা সতী! আমি বড় অভাগিনী! আকাশের ভিতর যাইবার নিমিত্ত আমি পথ অন্বেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইয়াছে, বাছা? পথ কেন পাই না? একবার আকাশের ভিতর উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষা হয়। বাছা! তুমি যদি পথটী বলিয়া দাও, তো আমার বড় উপকার হয়।"

নক্ষত্রদের বৌ উত্তর করিল,—"পথ আর বাছা, তুমি কি করিয়া পাইবে? এই সন্ধ্যা বেলা এক বেটী ভূতিনী-বুড়ী আসিয়া আকাশের উপর সব চূণ-কাম করিয়া দিয়াছে। তা যাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে আকাশের খিড়কি দ্বারটী খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।"

এই কথা বলিয়া, নক্ষত্রদের বৌ চুপি চুপি আকাশের খিড়কি দ্বারটী খুলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর উঠিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:o:—

দুর্দ্দান্ত সিপাহি

আকাশের ভিতর গিয়া কঙ্কাবতী, খোক্কোশ-শাবককে একটী মেঘের ডালে বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর, পদব্রজে আকাশের মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে দেখিলেন, নানা বর্ণের নক্ষত্র সব ফুটিয়া রহিয়াছে। নক্ষত্র ফুটিয়া আকাশকে আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি দূরে চাঁদ, চাকার মত আকাশের উপর বসিয়া আছেন।

কঙ্কাবতী আকাশের ভিতর প্রবেশ করিলে চাঁদ সংবাদ পাই-লেন যে, তাঁহার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে। খন্তা কুড়ুল লইয়া এক মানবী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। এই দু:সংবাদ শুনিয়া চাঁদের মনে অতিশয় ত্রাস হইল। ভয়ে চাঁদ কাঁপিতে লাগিলেন।

চাঁদ মনে করিলেন,—"কেন যে মরিতে সুন্দর হইয়াছিলাম ? তাই তো আমার প্রতি সকলের আক্রোশ ! যদি সুন্দর না হইতাম, তাহা হইলে কেহ আর আমার মূল শিকড় কাটিতে আসিত না ! একে তো রাহুর জ্বালায় মরি, তাহার উপর আবার যদি মানুষের উপদ্রব হয়, তাহা হইলে আর কি করিয়া বাঁচি ! যদি আমার গলা থাকিত, তো আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম। তা, যে ছাই, এ পোড়া শরীর

কেবল চাকার মত! গলা নাই তা আমি কি করিব? দড়ি দিই কোথা?"

নানারূপ খেদ করিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া, চাঁদ আকাশের সিপাহিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আকাশের সিপাহি সকল দিকে বীর পুরুষ বটে, কেবল কর্ণে কিছু হীনবল। একটু কালা। অতিশয় চীৎকাব করিয়া কোনও কথা না বলিলে তিনি শুনিতে পান্ না।

সিপাহি আসিয়া উপস্থিত হইলে, অতি চীৎকার করিয়া চাঁদ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

চাঁদ তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার মূল শিকড কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহি ভাবিলেন যে, চাঁদ তাঁহাকে কালা মনে করিয়া এত হাঁ করিয়া কথা কহিতেছেন। সিপাহির তাই রাগ হইল।

সিপাহি বলিলেন,—"নাও! আর অত হাঁ করিতে হইবে না। শেষ কালে চিড় খাইয়া, চারি দিক ফাটিয়া, দুই খানা হইয়া যাবে?"

এইবার একটু হাঁ কম করিয়া, চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—"আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহী বলিলেন,—"অত আর চুপি চুপি কথা কহিতে হইবে না। কোথাউ ডাকাতি করিবে না কি? যে অত চুপি চুপি কথা! যদি কোথাউ ডাকাতি কর, তো আমায় কিন্তু ভাগ দিতে হইবে!"

চাঁদ ও দুর্দ্দান্ত সিপাহি

অত আর হাঁ করিতে হইবে না

চাঁদ ভাবিলেন,—"সিপাহি লোকের সহিত কথা কওয়া দায়। কথায় কথায় রাগিয়া উঠে।"

চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—"না, ডাকাতি করিবার কথা বলি নাই। আমি কোথাউ ডাকাতি করিতে যাইব না। আমি বলিতেছি, যে আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহি এতক্ষণে চাঁদের কথা শুনিতে পাইলেন।

সিপাহি বলিলেন,—"তোমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে? তা বেশ, কাটিয়া লইয়া যাইবে! তার আর কি?"

চাঁদ বলিলেন,—"তুমি আকাশের চৌকিদার, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না?"

সিপাহি উত্তর করিলেন,—"তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমার মূল শিকড়টী কাটা যায়? তখন?"

চাঁদ বলিলেন,—"যদি তুমি এরূপ সমূহ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা না করিবে, তবে তুমি আকাশের মাহিনা খাও কি জন্য?"

সিপাহি উত্তর করিলেন,—"রেখে দাও তোমার মাহিনা! না হয় কর্ম্ম ছাড়িয়া দিব? পৃথিবীতে গিয়া কনেষ্টেবিলি করিয়া খাইব। আমা হেন প্রসিদ্ধ দুর্দ্দান্ত সিপাহি পাইলে, সেখানে তাহারা লুফিয়া লইবে। সেখানে এমন মূল শিকড় কাটা-কাটি নাই। সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় বটে, তা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় আমি তফাৎ তফাৎ থাকিব। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব হইয়া যাইলে, দাঙ্গাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তখন আমি রাস্তার দু চারি জন ভাল

মানুষ ধরিয়া, কাছারিতে নিয়া হাজির করিব। তবে এখন আমি যাই। কারণ, মানুষটী যদি আসিয়া পড়ে? শেষে যদি আমাকে পর্য্যন্ত ধরিয়া টানাটানি করে?”

এই কথা বলিয়া, দুর্দ্দান্ত সিপাহি সেখান হইতে অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। নিরুপায় হইয়া, “যা থাকে কপালে”, এই মনে করিয়া, চাঁদ আকাশে গা ঢালিয়া দিলেন।

মেঘের ডালে খোক্কোশ বাঁধিয়া আকাশের মাঠ দিয়া, কঙ্কাবতী অতি দ্রুতবেগে চাঁদের দিকে ধাবমান হইলেন।

চারিদিকে জনরব উঠিল যে, আকাশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার, সকলের মূল শিকড় কাটিতে, পৃথিবী হইতে মনুষ্য আসিয়াছে। আকাশবাসীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল। নক্ষত্রগণের পলাইবার যো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন উপবনে, ক্ষেত্র উদ্যানে, যে যেখানে ফুটিয়াছিল, সে সেইখানে বসিয়া মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চাঁদের পলাইবার যো নাই, কারণ জগতে আলো না দিয়া পলাইলে জরিমানা হইবে, চাঁদ তাই বিরস-মনে ম্লান বদনে ধীরে ধীরে আকাশের পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কঙ্কাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাঁদ ভাবিলেন,—“এই বার তো দেখিতেছি, আমার মূল শিকড়টী কাটা যায়! এখন আমি শুদ্ধ না যাই, তবেই রক্ষা! এরে বিশ্বাস কি? যদি বলিয়া বসে যে,—‘বাঃ! দিব্য চাঁদটী, কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাই!’ তাহা হইলেই বা আমি কি করিতে

পারি ? কাজ নাই বাপু ! আমি চক্ষু বুজিয়া থাকি, নিশ্বাস বন্ধ করি, মড়ার মত কাঠ হইয়া থাকি। মানুষটা মনে করিবে যে, 'এ মরা চাঁদ! মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব ? আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া যাইবে না।"

বুদ্ধিমন্ত চাঁদ, এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাঁদকে বিবর্ণ, বিষণ্ণ, মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিয়া কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"যাঃ! চাঁদটী বা মরিয়া গেল ? মূল শিকড়টী কাটিয়া লইব, সেই ভয়ে চাঁদের বা প্রাণত্যাগ হইল ? আহা! কেমন সুন্দর চাঁদটী ছিল! কেমন চমৎকার জ্যোৎস্না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত! সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্যার রাত্রি থাকিবে। লোকে আমাকে কত গালি দিবে।"

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া, কঙ্কাবতী পুনরায় মনে মনে বলিলেন,—"না, চাঁদটী মরে নাই। বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে। তা ভালই হইয়াছে। কাটিতে কুটিতে হইলে, ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করেন, তার পর করাত দিয়া হাত পা কাটেন। ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনা-আপনি অজ্ঞান হইয়াছে। মূল শিকড় কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিন্তু শিকড়টী একেবারে দুইখণ্ড করিয়া কাটা হইবে না, তাহা হইলে চাঁদ মরিয়া যাইবে। আমার কেবল এক তোলা শিকড়ের ছালের প্রয়োজন, ততটুকু আমি কাটিয়া লই।"

এইরূপ ভাবিয়া, চারিদিক ঘুরিয়া, কঙ্কাবতী অবশেষে চাঁদের

মূল শিকড়টী দেখিতে পাইলেন।। ছুরি দিয়া উপর উপর মূল শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া তুলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের নিমিত্ত, চাঁদ অতি কষ্টে যাতনা সহ্য করিলেন। তার পর আর সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন,—"উঃ! লাগে যে!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভয় নাই! এই হইয়া গেল!"

তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী চাঁদের মূল শিকড় হইতে এক তোলা পরিমাণ ছাল তুলিয়া লইলেন।

তখন চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার শিকড় পুনরায় গজাইবে তো?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"গজাইবে বৈ কি! চিরকাল কি আর এমন থাকিবে! ইহার উপর একটু কাদা দিয়া দিও, মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়িয়া বিষাইয়া উঠিবে না।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি ঘা হয়?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেম,—"যদি ঘা হয়, তাহা হইলে ইহার উপর একটু লুচি-ভাজা ঘি দিও।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বুঝি মেয়ে-ডাক্তার? দাঁতের গোড়ার ঔষধ জান? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন্ কন্ করে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মেয়ে-ডাক্তার নই। তবে, এই বয়সে আমি অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, তাই দুটা একটা ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছি। তোমার দাঁতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের দাঁত কি চিরকাল সমান থাকে?

তুমি কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি? কবে সেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ। এখন আর ছেলে-চাঁদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন?"

চাঁদ বলিলেন,—"ছেলে চাঁদ হইতে চাই না! ঘরে আমার অনেক গুলি ছেলে-চাঁদ আছে। আশীর্বাদ কর, তাহারা বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকুক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে আকাশে কত চাঁদ হয়! আকাশের চারিদিকে তখন চাঁদ উঠিবে! এখনি আমার ছেলে মেয়ে গুলি বলে,—'বাবা! অমাবস্যার রাত্রিতে তুমি শ্রান্ত হইয়া পড়, সন্ধ্যা বেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তা যাই না? আমরা গিয়া আকাশেতে উঠি না?' আমি তাদের মানা করি। আকাশের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্য্যন্ত, পথটুকু তো আর কম নয়? তারা ছেলে মানুষ, অত পথ গড়াইতে পারিবে কেন?"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ছেলে মেয়ে গুলি কত বড় হইয়াছে?"

চাঁদ উত্তর করিলেন,—"বড় মেয়েটী একখানি কাঁশির মত হইয়াছে। কেমন চক্-চকে কাঁশি! তেঁতুল দিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁশির সেরূপ রং হয় না! মেজ ছেলেটী একখানি থত্তালের মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ে আছে। কোলের মেয়েটী একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাথুরে পোকার টিপ পরিতে, সেই অত বড় হইয়াছে। কিন্তু কালো হউক, মেয়েটীর শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর যখন

আকাশে কাল-চাঁদ উঠিবে, তখন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক সুন্দরী বটে! তাহার কালো কিরণে জগতে চক্-চকে অন্ধকার হইবে, সমুদয় জগৎ যেন বারনিশ চামড়ায় মুড়িয়া যাইবে। তা, যাই হউক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে? কিছু যে খাইতে পারি না! ডাঁটা চিবাইতে যে বড় লাগে। ভাল যদি কোনও ঔষধ থাকে, তো আমাকে দিয়া যাও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"চাঁদ! তুমি এক কাজ কর। আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইয়াছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন। পতি আমার কলিকাতায় থাকেন। কলিকাতায় দন্তকারেরা আছে। তোমার পোকা-ধরা পচা দাঁতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নূতন কৃত্রিম দন্ত পরাইয়া দিবে।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদের ভয় হইল। চাঁদ বলিলেন,— "আমার মূল শিকড়ে ব্যথা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে পারিব না, তত দূর আমি যাইতে পারিব না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমি তোমাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

চাঁদের প্রাণ উড়িয়া গেল। চাঁদ ভাবিলেন,—"যা ভয় করিয়াছিলাম তাই! কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম! চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই হইত।"

চাঁদ বলিলেন,—"আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইয়া গিয়াছে, আর ব্যথা নাই। সে জন্য তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আমি বড় ভারি, আমাকে তুমি লইয়া যাইতে পারিবে না।

এখন যাও, বাড়ী যাও। বিলম্ব করিলে তোমার বাড়ীর লোকে ভাবিবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"কি বলিলে? তুমি ভারি! বাপের বাড়ী থাকিতে, তোমার চেয়ে বড় বড় বগী-থাল আমি ঘাটে লইয়া মাজিতাম। এই দেখ, তোমাকে লইয়া যাইতে পারি কি না!"

এই কথা বলিয়া, কঙ্কাবতী আকাশের উপর আঁচলটী পাতিলেন। চাঁদটীকে ধরিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি! এমন সময় চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানা-পোনা লইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে খাইতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদনীর কান্নায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের ছানা-পোনার কান্নায় কঙ্কাবতীর কানে তালা লাগিল।

চাঁদনী কাঁদিতে লাগিলেন,—"ওগো আমি দুর্দ্দান্ত সিপাহির মুখে শুনিলাম যে, মানুষে তোমার মূল শিকড় কাটিবে। ওগো আমি সে পোড়ারমুখী মানুষীর কি বুকে ভাত রাঁধিয়াছি? যে, সে আমার সহিত এরূপ শত্রুতা সাধিবে! আমাকে যদি বিধবা হইতে হয়, তাহা হইলে তারও আমার মত হাত হইবে। সে বাপ ভাইয়ের মাথা খাইবে।"

চাঁদের ছানা-পোনা গুলি কঙ্কাবতীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি! বাবার মূল শিকড় কাটিও না, বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইও না।"

চাঁদের ছোট মেয়েটী, যেটী পাথুরে পোকার টিপের মত, সেই

মেয়েটী মাঝে মাঝে কাঁদে, মাঝে মাঝে রাগে, আর কঙ্কাবতীকে গালি দিয়া বলে,—"অভাগী, পোড়ারমুখী, শালা!" আবার সে কঙ্কাবতীর গায়ের চারিদিকে আঁচড়ায় কামড়ায়, আর চিমটি কাটে। তার চিমটির জালায় কঙ্কাবতী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো! ও চাঁদনী! তোমার মেয়ে সামলাও বাছা! তোমার এ ছোট মেয়েটী চিমটি কাটিয়া আমার গায়ের ছাল চামড়া তুলিয়া লইতেছে।"

চাঁদনী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, মেয়ে সামলাবো বৈ কি? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিবে, আর আমি মেয়ে সামলাবো! কেন, বাছা? তোমার আমি কি করিয়াছি, যে তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ করিবে? মূল শিকড়টী কাটিয়া তুমি আমার পতির প্রাণ বধ করিবে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"না গো না! আমি তোমার পতির প্রাণ বধ করি নাই। একটু খানি শিকড়ের আমার আবশ্যক ছিল, তা আমি উপর উপর চাঁচিয়া লইয়াছি। অধিক রক্তও পড়ে নাই, কিছুই হয় নাই। তুমি বরং চাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। তার পর, তোমার স্বামী বলিলেন যে, তাঁর দাঁত নড়িতেছে। তাই মনে করিলাম যে, কলিকাতায় লইয়া যাই, দাঁত ভাল করিয়া পুনরায় তোমার স্বামীকে আকাশে পাঠাইয়া দিব। তাতে আর কাজ নাই, বাছা, এখন তোমরা সব চুপ কর। আর তোমার এই মেয়েটীকে বল, আমায় যেন আর চিমটি না কাটে।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদনী আশ্বস্ত হইলেন। চাঁদের ছেলে পিলেদেরও কান্না থামিল।

চাঁদনী বলিলেন,—"তোমার যদি, বাছা, কায সারা হইয়া থাকে, তবে তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমার ভয়ে, আকাশ একেবারে লণ্ড ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। আকাশবাসীরা সব ঘরে খিল দিয়া বসিয়া আছে। সবাই সশঙ্কিত।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমার কাজ সারা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার কতকগুলি নক্ষত্র চাই। আমাদের সেখানে নক্ষত্র নাই। আহা! এখানে কেমন চারিদিকে সুন্দর সুন্দর সব নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে! আমি মনে করিয়াছি, কতকগুলি নক্ষত্র এখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইব। এখান হইতে অনেক দূরে আমার খোক্কোশ বাঁধা আছে। কি করিয়া নক্ষত্রগুলি তত দূর লইয়া যাই গা? একটী ঝাঁকা মুটে কোথায় পাই গা?"

চাঁদনী বলিলেন,—"আর বাছা! তোমার ভয়ে ঘর হইতে আজ কি আর লোক বাহির হইয়াছে, যে তুমি মুটে পাইবে? দোকানী পসারী সব দোকান বন্ধ করিয়াছে, আকাশের বাজার হাট আজ সব বন্ধ। পথে জনপ্রাণী নাই। আমিই কেবল প্রাণের দায়ে ঘর হইতে বাহির হইয়াছি।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মেঘের পাশে লুকাইয়া কে একটী লোক উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"ঐ লোকটীকে বলি, খোক্কোশের বাচ্ছার কাছ পর্য্যন্ত নক্ষত্রগুলি দিয়া আসে।" এইরূপ চিন্তা

করিয়া, কঙ্কাবতী তাহাকে ডাকিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো শুন! একটা কথা শুন!"

কঙ্কাবতী যে-ই এই কথা বলিয়াছেন, আর লোকটা ঊৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। কঙ্কাবতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। কঙ্কাবতী বলিতে লাগিলেন,—"ওগো! একটু দাঁড়াও! আমাব একটা কথা শুন। তোমার কোনও ভয় নাই!"

আর ভয় নাই! কঙ্কাবতী যতই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান্, আর লোকটা ততই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে। কঙ্কাবতী মনে করিলেন,—"লোকটা কি দৌড়িতেই পারে! বাতাসের মত যেন উড়িয়া যায়!"

কঙ্কাবতী তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না, কিন্তু দৈবক্রমে এক ঢিপি মেঘ তাহার পায়ে লাগিয়া সে হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়াও পুনরায় উঠিতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে না উঠিতে কঙ্কাবতী গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

কঙ্কাবতী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, তাহার গায়ে হাড় নাই, মাস নাই কিছুই নাই! দেহ তার অতি লঘু। দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা কঙ্কাবতী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চক্ষুর নিকট আনিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, কেবল দুই চারিটী তালপাতা দিয়া তাহার শরীর নিৰ্ম্মিত। তালপাতের হাত, তাল-পাতের পা, তালপাতের নাক মুখ। সেই তালপাতের উপর জামা-জোড়া পরা। তাহার শরীর দেখিয়া কঙ্কাবতী অতিশয় আশ্চৰ্য্য হইলেন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ?"

লোকটী উত্তর করিল,—"আমি আকাশের দুর্দ্দান্ত সিপাহি। আবার কে ? এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। আঙ্গুল দিয়া অমন করিয়া টিপিও না।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার শরীর কি তালপাতা দিয়া গড়া ?"

দুর্দ্দান্ত সিপাহি বলিলেন,—"তালপাতা দিয়া গড়া হবে না, তো কি দিয়া গড়া হবে ? ইঁট পাথর চূণ সুরকি দিয়া রেক্তার গাঁথুনি করিয়া আমার শরীর গড়া হবে না কি ? এত দেশ বেড়াইলে, এত কাণ্ড করিলে, আর তালপাতার সিপাহির নাম কখনও শুননি ? এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমাকে কে না জানে ? বীর-পুরুষ দেখিলেই লোকে আমার সহিত উপমা দেয়! এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। ভাল এক মূল-শিকড় কাটাকাটি হইয়াছে বটে!"

কঙ্কাবতী এখন বুঝিলেন যে, ছেলে-বেলা তিনি যে সেই তালপাতার সিপাহির কথা শুনিয়াছিলেন, তার বাস আকাশে, পৃথিবীতে নয়। আর সেই-ই আকাশের দুর্দ্দান্ত সিপাহি।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"দেখ দুর্দ্দান্ত সিপাহি! তোমাকে আমার একটী কাজ করিতে হইবে। তা না করিলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। এখান হইতে এক বোঝা নক্ষত্র আমি তুলিয়া লইয়া যাইব। কিছু দূর মোটটী তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।"

সিপাহি আর করেন কি? কাজেই সম্মত হইতে হইল। কঙ্কাবতীর আঁচলে আর কতটা নক্ষত্র ধরিবে? তাই কঙ্কাবতী ভাবিতে লাগিলেন—"কি দিয়া নক্ষত্রগুলি বাঁধিয়া লই?"

সিপাহি বলিলেন,—"অত আর ভাবনা-চিন্তা কেন? চল আমরা আকাশ-বুড়ির কাছে যাই। চরকা কাটিয়া সে কত কাপড় করিয়াছে! তাহার কাছ হইতে একখানি গামছা চাহিয়া লই!"

কঙ্কাবতী ও সিপাহি আকাশ-বুড়ির নিকট গিয়া একখানি গামছা চাহিলেন। অনেক বকিয়া-ঝকিয়া আকাশ-বুড়ি একখানি গামছা দিলেন। তখন কঙ্কাবতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তুলিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া, ফুটন্ত ফুটন্ত, আধ-কুঁড়ি আধ-ফুটন্ত, নানাবর্ণের নক্ষত্র তুলিলেন। সেই গুলি গামছায় বাঁধিয়া, মোটটী সিপাহির মাথায় দিলেন।

সিপাহি ভাবিলেন,—"এতকাল আকাশে চাকরি করিলাম, কিন্তু মুটেগিরি কখনও করিতে হয় নাই। ভাগ্যক্রমে আকাশের লোক সব আজ দ্বারে খিল দিয়া বসিয়া আছে। কেহ যদি আমার এ দুর্দ্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজ আমি অপমানে মরমে মরিয়া যাইতাম।"

মোটটী মাথায় করিয়া, সিপাহি আগে আগে যাইতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চৎ যাইতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে খোক্কোশের বাচ্ছার নিকট আসিয়া দুই জনে উপস্থিত হইলেন। সিপাহির মাথা হইতে নক্ষত্রের বোঝাটী লইয়া, তখন কঙ্কাবতী বলিলেন,—"এখন তুমি যাইতে পার, তোমাকে আর

আমার প্রয়োজন নাই।” এই কথা বলিতে না বলিতে, সিপাহি এমনি ছুট মারিলেন যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—“তালপাতার সিপাহি কি না! তাই এত দ্রুত-বেগে ছুটিতে পারে।”

মোটটী লইয়া কঙ্কাবতী খোক্কোশের বাচ্ছার পিঠে চড়িলেন। খোক্কোশের পিঠে চড়িয়া আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে পুনরায় অবতরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

সতী

যেখানে মশা ও হাতী কঙ্কাবতীর প্রতীক্ষায় অবস্থিতি কবিতে-ছিলেন, অবিলম্বে কঙ্কাবতী আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হই-লেন। শিকড লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া, মশা ও হাতীব আনন্দেব আর অবধি রহিল না। খোক্কোশেব বাচ্ছাটীকে পুন-রায তাহার গর্ত্তে ছাড়িয়া, মশা ও কঙ্কাবতী হস্তীব পৃষ্ঠে আবোহণ করিলেন, ও পর্ব্বত-অভ্যন্তর-স্থিত সেই অট্টালিকার দিকে যাত্রা করিলেন।

অট্টালিকায় উথস্থিত হইয়া কঙ্কাবতী চাঁদেব মূল-শিকড় টুকু খর্ব্বুরের হস্তে অর্পণ কবিলেন। খর্ব্বুর তাহার এক তোলা ওজন করিয়া, সাতটী গোলমরিচের সহিত অতি সাবধানে শিলে বাটিলেন। ঔষধটুকু বাটা হইলে, ব্যাঙকে তাহা সেবন করাইলেন। ঔষন সেবন করিয়া ব্যাঙের হুড় হুড় করিয়া বমন আরম্ভ হইল। পেটে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাঙ বলিলেন, —"ব্যাঙাচি অবস্থায়, জলে কিল্‌বিল্ কবিতে করিতে আমি যাহা কিছু খাইয়াছিলাম, তাহা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছে, উদরে আর আমার কিছুই নাই।"

বমনের সহিত সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকা গুলি বাহির হইয়া পড়িল,

খর্ব্বুর অতি যত্নে তাহাদিগকে বমনের ভিতর হইতে বাছিয়া লইলেন। তাহার পর, এক একটী পিপীলিকা লইয়া, তাহার উদর হইতে অতি সূক্ষ্ম সোন্না দ্বারা খেতুর পরমায়ু-টুকু বাহির করিতে লাগিলেন। এইরূপে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সমস্ত পিপীলিকা গুলি হইতে পরমায়ু বাহির করা হইলে, খর্ব্বুর বলিলেন,—"একি হইল? পরমায়ু তো অধিক বাহির হইল না। এ যৎসামান্য পরমায়ু-টুকু লইয়া কি হইবে? ইহাতে তো কোনও ফল হইবে না?"

খর্ব্বুর বিষণ্ণ-চিত্ত হইলেন, মশা হতাশ হইলেন, ব্যাঙের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কঙ্কাবতী নীরবে বসিয়া রহিলেন। অদৃশ্যভাবে অবস্থিত নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী পরিতোষ লাভ করিল।

যাহা হউক, সেই যৎসামান্য পরমায়ু-টুকুই লইয়া খর্ব্বুর খেতুর নাকে নাশ দিয়া দিলেন। খেতু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

খেতু বলিলেন,—"কি অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত হইয়াছিলাম! কঙ্কাবতী! তুমি আমাকে জাগাইতে পার নাই? দেখ দেখি কত বেলা হইয়া গিয়াছে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"সাধ্য থাকিলে আর জাগাইতাম না?"

খেতু তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কঙ্কাবতীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। খর্ব্বুর, মশা ও ব্যাঙ বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া আছেন।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আর এঁরা কারা?"

কঙ্কাবতী কোন উত্তর করিলেন না।

খেতু একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আমার সকল কথা এখন মনে পড়িতেছে। আমার মাথায় শিকড় ছিল না বলিয়া, আমাকে নাকেশ্বরী খাইয়াছিল। কঙ্কাবতী! তুমি বুঝি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে সুস্থ করিয়াছ? তবে আর কান্না কেন? আমি তো এখন ভাল আছি। কেবল আমার মাথা অল্প অল্প ব্যথা করিতেছে। আমি আর একবার শুই। কঙ্কাবতী! তুমি আমার মাথাটী একটু টিপিয়া দাও। আমার মাথা বড় বেদনা করিতেছে! অসহ্য বেদনা করিতেছে! প্রাণ বুঝি আমার বাহির হয়! ওগো! তোমরা সকলে আমার কঙ্কাবতীকে দেখিও! আমার কঙ্কাবতীকে তার মা'র কাছে দিয়া আসিও। হা ঈশ্বর!"

খেতুর মৃত্যু হইল!

ঘাড় হেঁট করিয়া সকলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। সকলের চক্ষু দিয়া জল-ধারা পড়িতে লাগিল। কেবল কঙ্কাবতী স্থির ধীর প্রশান্ত!

অনেক ক্ষণ পরে খর্ব্বুর বলিলেন,—"এই বার সব ফুরাইল। আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। এখন আর কোনও উপায় নাই। তালগাছ হইতে পড়িবার সময় পরমায়ু অধি-কাংশ ভাগ বাতাসে উড়িয়া গিয়াছিল, কেবল অতি যৎসামান্য ভাগ পিপীলিকাতে খাইয়াছিল। সে পরমায়ু-টুকুতে মনুষ্য আর কতক্ষণ বাঁচিতে পারে?"

এই কথা বলিয়া খর্ব্বুর কাঁদিতে লাগিলেন, মশা কাঁদিলেন, ব্যাঙ রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন, বাহিরে হাতী শুঁড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কেবল কঙ্কাবতী নীরব, কঙ্কাবতীর কান্না নাই।

অবশেষে মশা বলিলেন,—"মা, উঠ। বিলাপে আর কোনও ফল নাই। তোমার পতির এক্ষণে আমরা যথাবিধি সৎকার করি। তাহার পর তুমি আমার সহিত রক্তবতীর নিকট যাইবে। রক্তবতীকে দেখিলে তোমার মন অনেক শান্ত হইবে।"

মশা, খর্ব্বুর ও ব্যাঙ কঙ্কাবতীকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন।

খর্ব্বুর বলিলেন,—"সংসার অনিত্য। জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই। কখন কে আছে, কখন কে নাই। উঠ, মা, উঠ। তোমার পতির যথাবিধি সৎকার হইলে, কিছুদিন তুমি রক্ত-বতীর নিকট গিয়া থাক। তাহার পর তোমার মা'র নিকট আমি গিয়া রাখিয়া আসিব।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মহাশয়গণ! আপনারা আমার অনেক উপকার করিলেন। আমার জন্য আপনারা বহুতর পরিশ্রম করিলেন। আপনাদিগের পরিশ্রম যে সফল হইল না, সে কেবল আমার অদৃষ্টের দোষ। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। আপনারা যখন এত পরিশ্রম করিলেন, তখন এক্ষণে আমার আর একটী যৎসামান্য উপকার করুন। সেইটী করিয়া আপনারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করুন। পতি-পদে আমি আমার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এই যে আমার শরীর দেখিতেছেন, এ প্রাণ-

হীন জড়-দেহ। এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড়-দেহ ভস্ম করিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপনারা সেই সমস্ত উপকরণের আয়োজন করিয়া দিন।"

মশা বলিলেন,—"ছি মা! ও কথা কি মুখে আনিতে আছে? পতিহারা হইয়া শত শত সতী এ পৃথিবীতে জীবিত থাকে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করে।"

খর্ব্বুর ও ব্যাঙ সকলেই কঙ্কাবতীকে সেইরূপ নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

নাকেশ্বরী বলিল,—"মাসী!"

মাসী বলিল,—"উঁ!"

নাকেশ্বরী বলিল,—"মানুষটাকে সৎকার করিবে যে! তাহা হইলে আর আমরা কি ছাই খাইব?"

মাসী বলিল,—"হুঁ!"

নাকেশ্বরী বলিল,—"এই ছুঁড়ির জন্যই যত বিপত্তি। এখন ছুঁড়িও যাতে মরে, এস তাই করি।"

এই কথা বলিয়া নাকেশ্বরী, খর্ব্বুর প্রভৃতির নিকট আসিয়া আবির্ভূত হইল।

নাকেশ্বরী বলিল,—"তোমরা কি পরামর্শ করিতেছ? কঙ্কাবতীকে দেশে লইয়া যাইবে? লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু এ ধর্ম্ম-ভূমি ভারতভূমির নিয়ম তোমরা জান না। লোকের এখানে ধর্ম্মগত প্রাণ। শোকেই হউক আর তাপেই হউক, সহসা যদি কেহ মুখে একবার বলিয়া ফেলে যে,

'আমি পতির সঙ্গে যাইব,' তাহা হইলে তাহাকে যাইতেই হইবে, সতী হইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, সকল কুল ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। সে কলঙ্কিনী একেবারেই পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার-ব্যবহার করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন। তাই বলিতেছি, তোমরা ইঁহাকে ঘরে লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু শুন মশা মহাশয়! শুন থর্ব্বুর মহারাজ! আমি এ কথা তোমাদিগের আত্মীয়-স্বজনকে বলিয়া দিব। তোমাদিগের আত্মীয়-স্বজনেরা কিছু তোমাদিগের মত নাস্তিক নন। তাঁরা নিশ্চয় ইহার যথাশাস্ত্র বিচার করিবেন। তখন দেখিব, পুত্রকন্যার বিবাহ দাও কোথায়?"

নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া মশার ভয় হইল। আজ বাদে কা'ল তাঁকে রক্তবতীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র না মিলিলে তাঁকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। মশা তাই থর্ব্বুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য সত্য কি ভারতের এই নিয়ম?"

থর্ব্বুর উত্তর করিলেন,—"পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, সত্য। কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"উঠিয়া গেছে সত্য। কিন্তু আজ কাল শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান? পূর্ব্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচলিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা ক্ষিপ্ত-প্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত

আজ কালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্মের আমরা সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করিয়া থাকি।"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"আমার যাই থাকুক কপালে, আমি কঙ্কাবতীর সহিত আচার-ব্যবহার করিব। তাহাতে আমাকে পতিত হইতে হয় সেও স্বীকার। আত্মীয়-স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, তাহাতে আমি ভয় করিব না। তা বলিয়া, অনাথিনী বালিকাটী যে অসহনীয় শোকে ক্ষিপ্ত-প্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

মশা বলিলেন,—"আমারও ঐ মত। ভীরু কাপুরুষের মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি কঙ্কাবতীকে ঘরে লইয়া যাইব।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"আমারও ঐ মত। কাপুরুষ হয়, মানুষেরা হউক। আমি হইব না।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"ধর্ম্মের তোমরা কিছুই জান না। ঘোর অধর্ম্মে যে তোমরা পতিত হইবে, সে জ্ঞান তোমাদের নাই। ইনি যদি সতী না হন, তাহা হইলে ইঁহাকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবুও ইনি ঘরে যাইতে পাইবেন না। মুর্দ্দাফরাশে ইঁহাকে লইয়া যাইবে, মুর্দ্দাফরাশের রমণী হইয়া ইঁহাকে চিরকাল থাকিতে হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"এই কথা লইয়া আপনারা বৃথা তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। আমি নিশ্চয় সতী হইব। আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া

থাকিতে আর আপনারা আমাকে অনুরোধ করিবেন না, যেহেতু আপনাদিগের কথা আমি রক্ষা করিতে পারিব না। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, সতী হইতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেই সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিন্। আমার আর একটী কথা আছে। আমাদিগের গ্রামের নিকট যে ঘাট আছে, সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চলুন। যে স্থানে আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর চিতা হইয়াছিল, সেই স্থানে চিতা করিয়া আমি আমার পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিব।"

কঙ্কাবতীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, অতি দুঃখের সহিত, অগত্যা এ কার্য্যে সকলকে সম্মত হইতে হইল।

মশা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! যদি তুমি নিতান্তই এই দুষ্কর কার্য্য করিবে, তবে আমি আমার বাটীতে সংবাদ দিই। আমার স্ত্রীগণ ও রক্তবতী আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"আমিও তবে আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিই। আমার আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে লইয়া তিনিও আসুন। সহমরণের উপকরণ আনয়ন করুন, ও নাপিত, পুরোহিত, ঢাকি-ঢুলির নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিন্।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"আমিও আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট সমাচার পাঠাই।"

বাহিরে হাতী বলিলেন,—"আমিও আমার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে ডাকিতে পাঠাই।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"মাসী! তবে আমরা আর বাকি থাকি

কেন? তুমি তোমার ঝুড়িতে গিয়া চড়। পৃথিবীর যত ভূতিনী প্রেতিনীদিগকে সহমরণ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ কর। আজ কাল সহমরণ কিছু আর প্রতিদিন হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, সকল ভূতিনী-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া পরম পরিতোষ উপভোগ করিবে।"

এইরূপে সকলেই আপনার আপনার আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর, খেতু ও কঙ্কাবতীকে লইয়া, সকলে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাত্রি এক প্রহরের সময়, সকলে কুসুমঘাটীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতী যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে চিতা সুসজ্জিত হইল।

এই সময় রক্তবতী ও রক্তবতীর মাতাগণ সেই শ্মশান-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহমরণের সমুদয় উপকরণ লইয়া নাপিত পুরোহিত, ঢাকি ঢুলি সঙ্গে করিয়া, খর্ব্বুরের সপ্ত হস্ত পরিমিত স্ত্রী, ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আপন আপন বালক-বালিকাগণকে লইয়া সেই থানে আসিলেন। ব্যাঙ ও হস্তীর আত্মীয়বর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাদিক্ হইতে অসংখ্য ভূতিনী-প্রেতিনীগণও আগমন করিল। সেই শ্মশান-ঘাটে সে রাত্রিতে, মনুষ্য ও ভূত ভূতিনী ভিন্ন, অপরাপর নানা প্রকার জীবজন্তুর সমাগম হইল। সে রাত্রিতে কুসুমঘাটীর শ্মশান-ঘাট জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

রক্তবতী কঙ্কাবতীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল! তুমি কোথায় যাও? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? আমি কখনই তোমাকে যাইতে দিব না।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না। সতী হইয়া পতি-সঙ্গে আমি স্বর্গে চলিলাম। সে কার্য্যে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কি করিব, পচাজল! মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম। এ পৃথিবীতে সুখ হইল না। পতির সহিত এখন স্বর্গে যাই। আশীর্ব্বাদ করি, রাজপুত্র মশা তোমার বর হউক। পতি লইয়া তুমি সুখে ঘরকন্না কর। আমার মত হতভাগিনী যেন শত্রুও না হয়।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী, মশা-কন্যাকে নক্ষত্রের পুঁটলিটী বাহির করিয়া দিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল! এই নক্ষত্রগুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথ। এক ছড়া তুমি লও, আর দুই ছড়া আমার জন্য রাখ, আমার প্রয়োজন আছে।"

সকলে তখন খেতুকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত-পিণ্ডাদি যথাবিধি প্রদত্ত হইল। নাপিত আসিয়া কঙ্কাবতীর নখ গুলি কাটিয়া দিল। তাহার পর কঙ্কাবতী শরীর হইতে সমুদয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের চুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ভাঙ্গা চুড়িগুলি লোকে হুড়া-হুড়ি কাড়া-কাড়ি করিয়া কুড়াইতে লাগিল। কেননা, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে, এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে, ভূত-প্রেতিনী ছাড়িয়া যায়।

কঙ্কাবতী হাতের নো খুলিয়া স্নান করিয়া আসিলেন।

খর্ব্বুর-পত্নী তখন তাঁহাকে রক্তবর্ণের চেলির কাপড় পরাইয়া দিলেন। রাঙা-সূতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিলেন। চুলের উপর থরে থরে চিরুণি সাজাইয়া দিলেন। কপাল জুড়িয়া সিন্দুর ঢালিয়া দিলেন।

এইরূপ বেশ-ভূষা হইলে, কঙ্কাবতী আচমন করিয়া, তিল জল কুশ হস্তে, পূর্ব্বমুখে বসিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া এইরূপ সঙ্কল্প করাইলেন ;—

"অদ্য ভাদ্র মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, তৃতীয়া তিথিতে, ভরদ্বাজ গোত্রের আমি শ্রীমতী কঙ্কাবতী দেবী,—বশিষ্ঠকে লইয়া অরুন্ধতী যেরূপ স্বর্গে মহামান্য হইয়াছিলেন,—আমিও যেন সেইরূপ, মানুষের শরীরে যত লোম আছে, তত বৎসর স্বর্গে পতিকে লইয়া সুখে থাকিতে পারি। আমার পিতৃ-মাতৃ ও শ্বশুর-কুল যেন পবিত্র হয়। যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত যেন অপ্সরাগণ, আমাদিগের স্তব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন সুখে থাকি। ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কৃতঘ্নতা জন্য যদি পতির পাপ হইয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন। এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছি।"

এইরূপে পুরোহিত কঙ্কাবতীকে সঙ্কল্প করাইলেন। তাহার পর সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া দিক্‌পালগণকে সাক্ষী করিলেন। সে মন্ত্রের অর্থ এই ;—

"অষ্ট-লোক-পাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম্ম, তোমরা

সকলে সাক্ষী থাক, আমি জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেছি।”

লোকপালদিগকে সাক্ষী মানা হইলে, কঙ্কাবতী আঁচলে খই, খণ্ডের পরিবর্ত্তে বাতাসা, ও কড়ি লইয়া, সাত বার চিতাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর সেই খই কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। বালক-বালিকাগণ হুড়াহুড়ি করিয়া খই কড়ি কুড়াইতে লাগিল। কেননা, এই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হয় না।

উপস্থিত রমণীদিগের মধ্যে একজন সতীর নিকট হইতে তাঁহার কপালের একটু সিন্দূর চাহিয়া লইলেন। সেই রমণীর পুত্রবধূ নিতান্ত শিশু, এখনও পতিভক্তি তাহার মনে উদয় হয় নাই। তাহার কপালে এই সিন্দূর পরাইয়া দিলে সে অবিলম্বে পতি-পরায়ণা হইবে।

চিতা প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কঙ্কাবতীকে ঋঙ্মন্ত্র পড়াইলেন। শেষে কঙ্কাবতী, রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষত্রের মালা দুই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করিয়া এক ছড়া মালা খেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি পরিলেন। তাহার পর, চিতার উপর, স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুন দিয়া, বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শরের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা, চারিদিক হইতে সকলে ঝুপ ঝাপ

করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন। বাদ্যকরদিগের ঢাক ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আকাশ-প্রমাণ হইয়া অগ্নিশিখা উঠিল।

কঙ্কাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন! অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তিদায়িনী-নিদ্রা!!

* * *

* * *

* * *

পরিশেষ

—:০:—
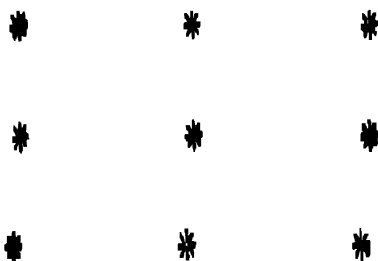
অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তি-দায়িনী নিদ্রা!

বৈদ্য বলিলেন,—"এই যে নিদ্রাটী দেখিতেছেন, ইহা সুনিদ্রা। বিকারের ঘোর নহে। বিকার কাটিয়া গিয়াছে। নাড়ি পরিষ্কার হইয়াছে। এক্ষণে বাড়ীতে যেন শব্দ হয় না। নিদ্রাটী যেন ভঙ্গ হয় না।"

বৈদ্য প্রস্থান করিলেন। অঘোর অচৈতন্য হইয়া রোগী নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে সকলেই চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। বাড়ীতে পিপীলিকার পদশব্দটী পর্য্যন্ত নাই।

মাতা কাছে বসিয়া রহিলেন। এক এক বার কেবল কন্যার নাসিকার নিকট হাত রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন, রীতিমত নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না!

আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, মা আজ বাইশ দিন কন্যার নিকট এইরূপে বসিয়া আছেন। প্রাণসম কন্যাকে লইয়া যমের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছেন। প্রবল বিকারের উত্তেজনায় কন্যা যখন উঠিয়া বসেন, মা তখন আস্তে আস্তে পুনরায় তাঁহাকে শয়ন করান। বিকারের প্রলাপে কন্যা যখন চীৎকার করিয়া উঠেন, মা তখন তাঁকে চুপ করিতে বলেন। সুধাময় মার বাক্য শুনিয়া বিকারের আগুনও কিছু ক্ষণের নিমিত্ত নির্ব্বাণ হয়।

কন্যা নিদ্রিত। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। বহুদিন অনাহারে, প্রবল দুরন্ত জ্বরে, ঘোরতর বিকারে, দেহ এখন তাঁর শীর্ণ, মুখ

এখন মলিন। তবুও তাঁর মধুর রূপ দেখিলে সংসার সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। অনিমিষ নয়নে মা সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি অবলোকন করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল! বেলা হইল। তবুও রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। মা কাছে বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে ভগিনী আসিয়া মার কাছে বসিলেন।

রোগীর ওষ্ঠদ্বয় একবার ঈষৎ নড়িল। অপরিস্ফুট স্বরে কি বলিলেন। শুনিবার নিমিত্ত ভগিনী মস্তক অবনত করিলেন। শুনিতে পাইলেন না, বুঝিতে পারিলেন না!

আবার ওষ্ঠ নড়িল, রোগী আবার কি বলিলেন। মা এইবার সে কথা বুঝিতে পারিলেন।

মা বলিলেন,—"খেতু খেতু করিয়াই বাছা আমার সারা হইল। আজ কয় দিন মুখে কেবল ঐ নাম। এখন যদি চারি হাত এক করিতে পারি, তবেই মনের কালি যায়।"

মার সুমধুর কণ্ঠ-স্বর কন্যার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া, ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। বিস্মিত-বদনে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন,—"বিকার সম্পূর্ণরূপ এখনও কাটে নাই। চক্ষুতে এখনও সুদৃষ্টি হয় নাই। আজ উনিশ দিন মা আমার কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।

ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি আমাকে চিনিতে পার?"

কঙ্কাবতী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"পারি। তুমি বড় দিদি !"

ভগ্নী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে বল দেখি ?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা।"

তনু রায় ঘরের ভিতর আসিলেন। তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! আজ কেমন আছ মা ?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভাল আছি, বাবা।"

তনু রায় একটু কাছে বসিলেন। স্নেহের সহিত কন্যার গায়ে মাথায় একটু হাত বুলাইলেন। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"মা ভগ্নী, পিতা, সকলেই দেখিতেছি আমার সহিত স্বর্গে আসিয়াছেন। পৃথিবীতে পিতার স্নেহ কখনও পাই নাই। আজ স্বর্গে আসিয়া পাইলাম। পৃথিবীতে আমাদের যেরূপ বাড়ী, আমার যেরূপ ঘর ছিল, স্বর্গেও দেখিতেছি সেইরূপ। কিন্তু যাঁহার সহিত সহমরণ যাইলাম, তিনি কোথায় ?"

অনেকক্ষণ কঙ্কাবতী তাঁর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তিনি আসিলেন না।

অবশেষে কঙ্কাবতী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তিনি কোথায় ?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কে !"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"সেই যিনি বাঘ হইয়াছিলেন।"

মা বলিলেন,—"এখনও ঘোর বিকার রহিয়াছে, এখনও প্রলাপ রহিয়াছে।"

মা'র কথা শুনিয়া কঙ্কাবতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। শরীর তাহার নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অল্প অল্প করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কথা সব স্মরণ-পথে আসিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! আমার কি অতিশয় পীড়া হইয়াছিল?"

মা বলিলেন,—"হাঁ বাছা! আজ বাইশ দিন তুমি শয্যাগত। তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে সে আশা ছিল না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা! আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটী আমার মনে এরূপ গাঁথা রহিয়াছে, যে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে! এখন আমার মনে নানা কথা আসিতেছে। তাহার ভিতর আবার কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী স্বপ্ন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই মা তোমাকে গুটীকত কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা মা! জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, সে কথা সত্য?"

মা বলিলেন,—"সে কথা সত্য। তাই লইয়াই তো আমাদের যত বিপদ!"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! বরফ লইয়া কি দলাদলি হইয়াছিল, সে কথা কি সত্য?"

মা উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা। সে কথাও সত্য। সেই কথা লইয়া পাড়ার লোকে খেতুর মাকে কত অপমান করিয়াছিল।"

মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অন্ধকূপের
ভিতর বসিয়াছিল

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি এখন কোথায় মা ?"

মা বলিলেন,—"তিনি আসেন এই। সমস্ত দিন এই খানেই থাকেন। আমার চেয়েও তিনি তোমাকে ভালবাসেন। তাঁর হাতে তোমাকে একবার সঁপিয়া দিতে পারিলেই, এখন আমার সকল দুঃখ যায়। কর্ত্তার মত হইয়াছে, সকলের মত হইয়াছে, এখন তুমি ভাল হইলেই হয়।"

কঙ্কাবতী বুঝিলেন যে, তবে খেতুর মা'র মৃত্যু হয় নাই, সে কথাটী স্বপ্ন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দলাদলির পর আমার জ্বর হয়, না মা ?"

মা বলিলেন,—"এই সময় তোমার জ্বর হয়। তুমি একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়। তোমার ঘোরতর জ্বর বিকার হয়। আজ বাইশ দিন।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তাহার পর, মা, আমি নদীর ঘাটে গিয়া এক খানি নৌকার উপর চড়ি, না মা ?"

মা বলিলেন,—"বালাই ! তুমি নৌকায় চড়িবে কেন মা ? সেই অবধি তুমি শয্যাগত।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা ! কত যে কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা আর তোমায় কি বলিব ! সে সব কথা মনে হইলে, হাসিও পায়, কান্নাও পায়। স্বপ্নে দেখলাম কি মা, যে গায়ের জ্বালায় আমি নদীর ঘাটে গিয়া জল মাখিতে লাগিলাম। তাহার পর এক খানি নৌকাতে চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইলাম। নৌকাখানি

আমার ডুবিয়া গেল। মাছেরা আমাকে তাদের রাণী করিল। তাহার পর কিছু দিন গোয়ালিনী মাসীর বাড়ীতে রহিলাম। সেখান হইতে শশ্মান-ঘাটে যাইলাম। তাহার পর পুনরায় বাড়ী আসিলাম। এক বৎসর পরে আমাদের বাটীতে একটী বাঘ আসিল। সেই বাঘের সহিত আমি বনে যাইলাম। তার পর ভূতিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। তার পর মা আকাশে উঠিলাম। কত কি করিলাম, কত কি দেখিলাম। স্বপ্নটী যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ মা! সে দলাদলির কি হইল?"

মা উত্তর করিলেন,—"সে দলাদলি সব মিটিয়া গিয়াছে। যখন তোমার সমূহ পীড়া, যখন তুমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছ, আজ আট নয় দিনের কথা আমি বলিতেছি, সেই সময় জনার্দ্দন চৌধুরীর একটী পৌত্রেব হঠাৎ মৃত্যু হইল। জনার্দ্দন চৌধুরী সেই পৌত্রটীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই সময় গোবর্দ্ধন শিরোমণিরও শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল। আর আমাদের বাটীতে তো তোমাকে লইয়া সমূহ বিপদ। জনার্দ্দন চৌধুরীর সুমতি হইল। তিনি রামহরিকে আনিতে পাঠাইলেন। রামহরি সপরিবারে কলিকাতা হইতে দেশে আসিলেন। রামহরির সহিত জনার্দ্দন চৌধুরী অনেকক্ষণ পরামর্শ করিলেন। তাহার পর রামহরি নিরঞ্জনকে ডাকিয়া আনিলেন। রামহরি, নিরঞ্জন, আমাদের কর্ত্তাটী ও খেতু সকলে মিলিয়া জনার্দ্দন চৌধুরীর বাটীতে যাইলেন। জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—

'আমি পাগল হইয়াছিলাম যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নিরঞ্জনকে আমি দেশ-ত্যাগী করিয়াছি, খেতু বালক, তাহার প্রতি আমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। সেই অবধি নানাদিকে আমাদের অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকের টাকা আত্মসাৎ করিয়া যাঁড়েশ্বর কয়েদ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন শিরোমণি পক্ষাঘাত রোগে মরণাপন্ন হইয়া আছেন। বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এই দারুণ শোক পাইতে হইল। এব কন্যাটীরও রক্ষা পাওয়া ভার।' এই কথা বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার ভূমি ফিরাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন এখন আপনার বাটীতে বাস করিতেছেন। খেতুকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া জনার্দ্দন চৌধুরী সান্ত্বনা করিলেন। আমাদেব কর্ত্তাটীও আর সে মানুষ নাই। এক্ষণে তাঁহার মনে স্নেহ-মায়া, দয়া-ধর্ম্ম হইয়াছে। বিপদে পড়িলে লোকের এইরূপ সুমতি হয়। তোমার দাদাও এখন আর সেরূপ নাই। মাকে যেরূপ আস্থা ভক্তি করিতে হয়, সুপুত্রের মত তোমাব দাদাও এক্ষণে আমাকে আস্থা ভক্তি করে। তোমার পীড়ার সময় তোমাব দাদা অতিশয় কাতর হইয়াছিল। তুমি ভাল হইলে খেতুর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এবার আর একথার অন্যথা হইবে না। তোমার পীড়ার সময় খেতু, খেতুর মা, রামহরি, সীতা প্রভৃতি সকলেই প্রাণ-পণে পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে সকল কথা শুনিলে, এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। এখনও তুমি অতিশয় দুর্ব্বল। পুনরায় অসুখ হইতে পারে।"

কঙ্কাবতী অনেক দিন দুর্ব্বল রহিলেন। ভাল হইয়া সারিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আসিয়া সর্ব্বদা বসিতেন। স্বপ্ন-কথা তিনি সীতার নিকট সমুদয় গল্প করিলেন। সীতা মাকে বলিলেন। বৌ-দিদি খেতুকে বলিলেন। এইরূপে কঙ্কাবতীর আশ্চর্য্য স্বপ্ন-কথা পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই শুনিলেন। স্বপ্ন-কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া কঙ্কাবতীর উপর সীতার বড় অভিমান হইল।

সীতা বলিলেন,—"সমুদয় নক্ষত্র গুলি, তুমি নিজে পরিলে, আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জন্য একটীও রাখিলে না। আমাকে তুমি ভালবাস না, তুমি তোমার পচাজলকে ভালবাস। আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।"

কঙ্কাবতী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য-লাভ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় সবল হইলেন। পীড়া হইতে উঠিয়া তিনি খেতুর সম্মুখে একটু আধটু বাহির হইতেন। একদিন খেতু কঙ্কাবতীদের বাটীতে গিয়াছিলেন। সেই খানে একটী মশা উড়িতেছিল। খেতু সেই মশাটীকে ধরিয়া কঙ্কাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ দেখি, কঙ্কাবতী! এই মশাটী তো তোমার 'পচাজল' নয়? আহা! রক্তবতী আজ অনেক দিন তাহার পচাজলকে দেখিতে পায় নাই। তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই সে হয় তো তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছে।"

লজ্জায় কঙ্কাবতী গিয়া ঘরে লুকাইলেন। সেই অবধি আর খেতুর সম্মুখে বাহির হইতেন না।

নিরঞ্জন এক দিন খেতুকে বলিলেন,—"খেতু! কঙ্কাবতীর অদ্ভুত স্বপ্ন-কথা আমি শুনিয়াছি। কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! কিন্তু

স্বপ্ন বা বিকারের প্রলাপ বলিয়া তুমি উপহাস করিও না। স্বপ্ন,—কি নয়? তাহাই বুঝিতে পারি না। এই আমাদের জীবন, আমাদের আশা ভরসা, সুখ দুঃখ, সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অপূর্ব্ব মায়া কিছুই বুঝিতে পারি না। সামান্য একটী পদার্থের কথাই আমরা ভালরূপ অবগত নহি। এই দেখ, আমার হাতে এখন যে পুস্তকখানি রহিয়াছে, প্রকৃত ইহা কি, তাহার কিছুই জানি না। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল কতকগুলি গুণ অনুভব হয়। চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থূলতা ও বর্ণ আছে, ত্বকের দ্বারা জানিতে পারি যে ইহার কাঠিন্য আছে, নাসিকা দ্বারা ইহার ঘ্রাণ ও জিহ্বার দ্বারা ইহার স্বাদ অনুভব করি। প্রকৃত পুস্তক খানি আমরা দেখিতে পাই না, যাহাকে পুস্তকের গুণ বলি তাহাই আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সে গুণগুলি পুস্তকের, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের? আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি এখন যে ভাবে গঠিত, সেই ভাবে আমরা গুণাদি অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয় সমুদয় অন্যরূপে গঠিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ আবার অন্য রূপ ধারণ করিত। এই পুস্তকের পত্রগুলি এখন শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। যদি পাণ্ডু রোগে আক্রান্ত হইয়া, কিঞ্চিৎমাত্র আমার চক্ষুর গঠন পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এই পুস্তক খানিই আবার আমার চক্ষে পীতবর্ণ দেখাইবে। তাই দেখ, প্রথম তো পুস্তকখানি দেখিতে পাই না, কতকগুলি গুণ কেবল অনুভব করি। আবার

বলিতে গেলে, সেই গুণগুলি পুস্তকের নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের। তবে পুস্তক রহিল কোথা? কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া, স্বপ্ন-সৃজিত কাল্পনিক জীবের ন্যায় আমরা সকলেই এই সংসারে যেন বিচরণ করিতেছি। সে জন্য কঙ্কাবতীর স্বপ্নকে আমরা উপহাস করিব কেন? সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়-কল্পিত, কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগৎও সেইরূপ কঙ্কাবতীর সুষুপ্ত ইন্দ্রিয় কল্পিত। দুই জগতে বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ নাই। কঙ্কাবতী যাহা দেখিয়াছে, যাহা শুনিয়াছে, যাহা কখনও চিন্তা করিয়াছে, সেই সমুদয় লইয়া একটী স্বপ্নজগৎ নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বপ্নের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানেই কঙ্কাবতী বর্ত্তমান। কঙ্কাবতী কি দেখিতেছে, কি শুনিতেছে, কি বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, তাহা ছাড়া স্বপ্নে আর কিছুই নাই। কঙ্কাবতীর যেরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব, স্থানে স্থানে সেইরূপ ভ্রমও দেখিতে পাই। হাতীদিগের মত মশাদিগের নাক পরিবর্দ্ধিত হইয়া শুঁড় হয় না, মশাদিগের দুই চুল বাড়িয়া শুঁড় হয়। আবার অন্য স্থানে, যেমন আকাশে, কল্পনাদেবীও কঙ্কাবতীব সহিত কিছু ক্রীড়া করিয়াছেন। যাহা হউক, স্বপ্নটী অদ্ভুত বলিয়া মানিতে হইবে। আমি আশ্চর্য হই, কঙ্কাবতী সেই মশাদিগের সংস্কৃত বচনটী কি করিয়া রচনা করিল?”

খেতু হাসিয়া বলিলেন,—“একবার পরিহাস-ছলে আমি ঐ বচনটী রচনা করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা। একখানি কাগজে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে কাগজ-

খানি ফেলিয়া দিই। কঙ্কাবতী বোধ হয় সেই কাগজখানি দেখিয়া থাকিবে।"

কঙ্কাবতী উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিলে, শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, খেতু ও কঙ্কাবতীর শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। ঘোরতর দুঃখের পর এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, সে জন্য সপ্তগ্রাম সমাজের লোক সকলেই আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ জনার্দ্দন চৌধুরী পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়স ও কফের ধাতু, কিন্তু সে জন্য তিনি কিছু মাত্র উপেক্ষা করেন নাই। বিবাহের দিন সমস্ত রাত্রি তিনি তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন।

চুপি চুপি তিনি কলিকাতা হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফ আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়, পরিহাস-ছলে সকলকে তিনি বলিলেন,—"বর যে একেলা 'বরথ' খাইয়া শরীর সুশীতল করিবে তাহা হইবে না, আমরাও আমাদের শরীর যৎসামান্য স্নিগ্ধ করিব।"

দেশের লোক, যাঁহারা কখনও বরফ দেখেন নাই, আজ বরফ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। আগ্রহের সাহিত সকলেই সুস্নিগ্ধ বরফ-জল পান করিলেন। বাড়ীতে দেখাইবার জন্য অনেকেই অল্প স্বল্প কাঁচা বরফ লইয়া যাইলেন।

শূদ্র ভোজনের সময়, গদাধর ঘোষ তিন লোটা বরফ-জল পান করিলেন। আর প্রায় এক সের সেই করাতের মত কর্ত্তনশীল "বরথ" দন্ত দ্বারা চিবাইয়া খাইলেন।

কঙ্কাবতীর মা যখন কঙ্কাবতীকে খেতুর মা'র হাতে সঁপিয়া দিয়া

বলিলেন,—"দিদি! এই নাও তোমার কঙ্কাবতী নাও", তখন দুই জনের আহ্লাদ রাখিতে পৃথিবীতে কি আর স্থান হইল? মনের আনন্দে তখন খেতুর মা কি পুত্র পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে লন্ নাই? বরণের সময় লজ্জায় খেতু কি ঘাড় হেঁট করিয়া ছিলেন না? কলা-বৌয়ের মত কঙ্কাবতীর কি তখন এক হাত ঘোমটা ছিল না? তা দেখিয়া পাড়ার একটী শিশু-ছেলে কি সেই ঘোমটার ভিতর মুখ দিয়া 'টুঃ' দেয় নাই? এসব কথার আর উত্তর দিবার আবশ্যক নাই।

যে সময় বরণ হইতেছিল, সেই সময় রামহরির স্ত্রী, খেতুর বৌ-দিদি, কি করিয়াছিলেন, তা জানেন? অতি উত্তম করিয়া খেতুর কানটী তিনি মলিয়া দিয়াছিলেন!

কান-মলা খাইয়া খেতু কি বলিলেন, তা জানেন? খেতু বলিলেন, —"যাও, বৌ-দিদি, ছি!"

পাড়ার স্ত্রীগণ তখন কি করিলেন, তা শুনিয়াছেন? কমলের স্ত্রী ঠান-দিদি বলিলেন,—"শালা 'বরথ' খায়! ওলো, ও সীতার মা! শালার কান দুইটা একেবারে ছিঁড়িয়া দে!"

তাহার পর কি হইল? তাহার পর খেতুর অনেক টাকা হইল। সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। খেতুর অনেক গুলি ছেলে-পিলে হইল। তনু রায় তাহাদিগের সহিত খেলা করিতে ভাল বাসিতেন। পাড়ার বালক-বালিকারা তাঁর দৌহিত্রদিগকে মারিলে, তাহাদের ঠাকুর-মার সহিত তনু রায় হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ঝগড়া করিতেন।

তাহার পর? বার বার "তাহার পর, তাহার পর" করিলে চলিবে না। দেখিতে দেখিতে পুস্তক খানি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই মূল্য দেয় কে? তাহার ঠিক নাই। কাজেই তাড়া-তাড়ি শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

তাহার পর কি হইল? তাহার পর আমার গল্পটী ফুরাইল, নোটে গাছটীর কপালে যাহা লেখা ছিল, তাহাই ঘটিল। সেই ঘটনা লইয়া কত অভিযোগ কত অনুযোগ উপস্থিত হইল।

সম্পূর্ণ